সম্পাদক শ্রীসুশীল রায় বর্ষ ২৩ সংখ্যা ২ কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩

স্পেন্সারের
আইসক্রীম
সোডা
সর্ব্বত্র সব সময়ে
সকলের একান্ত প্রিয় পানীয়
স্পেন্সার এরিয়েটেড ওয়াটার ফ্যাক্টরী
প্রাইভেট লিঃ
৮৭, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড,
কলিকাতা-১৪।
ফোন : ২৪-৩২২৬, ২৪-৩২২৭
Spencer
ICECREAM SODA

products serve
transport, industry and
projects in every
corner of India
DUNLOP LEADS THE WAY
DC-539A

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৩ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩ · ১৮৮৮ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

মৈত্রী

শিল্পী নন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৩ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩ · ১৮৮৮ শক

চিঠিপত্র দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ওঁ

সাদর সম্ভাষণমেতৎ

দীর্ঘকাল হইল ত্রিপুরায় পত্র লিখিয়াও এ পর্য্যন্ত যখন কোন উত্তর পাওয়া গেলনা তখন সেখানকার আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার বোধ হয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের নিকট চাঁদা করিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি? বিষয় কর্ম্মোপলক্ষ্যে আমাকে প্রায় সর্ব্বদাই মফস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়— এবং বিচিত্র কর্ম্মের দায়ে আমার উদ্বেগের বোঝা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে— নতুবা আমি কিছুকাল কলিকাতায় স্থির নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারিলে ইতস্ততঃ চেষ্টা করিতে পারিতাম।

"পুত্রযজ্ঞ" গল্পটি সম্পূর্ণ আমার নহে। ইহা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সমরেন্দ্রের রচনা, তবে উহাতে আমারো কিছু হাত আছে। "শিক্ষাপ্রণালী" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লেখা। "ঢাকা" লিখিয়াছেন "সিরাজদ্দৌলা"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ভারতী যাহাতে আপনাদের সমালোচনার যোগ্য হয় তৎসম্বন্ধে আমার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না— কেবল আশঙ্কা এই যে, নানা কাজের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পাছে সম্পাদকের মনের মত আদর্শ রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া পড়ে। ইতি ১০ই আষাঢ় ১৩০৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

সহৃদয়েষু

ক্ষণিকা পাইয়া আপনি যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহা গোলেমালে দীর্ঘকাল পরে আমার হস্তগত হইল।

আপনার সমালোচনাটি কবির পক্ষে যে কত উপাদেয় হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। অসুস্থ শরীরেও যে এই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন সেজন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিবেন। কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম— যখন আপনার খবর পাইলাম তখন আর সাক্ষাৎ করিবার সময় ছিলনা। আশা করি আপনার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার বন্দোবস্ত হইয়া গেছে।

শিলাইদহে আপনার সাক্ষাতের প্রত্যাশা করিতেছি। আশা করি শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে দেখা পাইব। ইতি ৩০শে ভাদ্র ১৩০৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আমার মুস্কিল হইয়াছে এই যে, চৈত্রের পর্য্যন্ত চোখের বালি লেখা ছিল তাহার পরে আর আলস্যের ভিড়ে এবং নানা অকাজের তাড়নায় লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। আর বিলম্ব করিতে সাহস হয় না। আজই লিখিতে বসিয়াছিলাম— ঠিক দুটি লাইন যখন লিখিয়াছি এমন সময় আপনার চিঠি পাইলাম। কিন্তু আপনার কথা আমার স্মরণ নাই এমন মনে করিবেন না। গতকল্য অপরাহ্ণে আপনার বইখানি পাঠিকা সম্প্রদায়ের লুব্ধ হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আমার টেবিলের উপর রাখিয়াছি— সেখান হইতে সে আমার প্রতি মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা কটাক্ষপাত করিতেছে— কিন্তু অসমাপ্ত কর্ত্তব্যের অঙ্কুশাঘাতে আমার লেখনীকে অন্য পথে ছুটিতে হইতেছে। একটু অপেক্ষা করুন। গল্পটিকে কিছুদূর অগ্রসর করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে আপনাকে লইয়া পড়িব ইহাতে সংশয় করিবেন না।

তর্কবিতর্কের আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হইবেননা। সাহিত্য ক্ষেত্রে নামিয়া কোন প্রকার কুশের কাঁটা পায়ে ফোটে নাই এমন সৌভাগ্যবান্ কে আছে? শত্রুরা নিন্দাবাক্যে হাসেন এবং বন্ধুরা ক্ষুব্ধ হন কিন্তু কুয়াশা দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায় কাহারো মনেও থাকেনা। পাছে কলহের দুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চাপিয়া বসে সেইজন্য শরৎ শাস্ত্রীর লেখা আমি পড়িই নাই। তাহা ছাড়া আমি জানি হীরেন্দ্রবাবু যখন গাণ্ডীব ধরিয়াছেন তখন পরাজয়ের আশঙ্কামাত্র নাই। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে বসিয়া হীরেন্দ্রবাবুর প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ধাবিত হইতেছে। তিনি যেরূপ অকাট্য যুক্তি ও অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত বাংলা ব্যাকরণের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন আমি সেরূপ কখনই পারিব না এই জন্য তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমি নেপথ্যে সরিয়া আসিয়া অতি উত্তম কাজ করিয়াছি। দীর্ঘকাল আমি জনকোলাহলের মাঝখানে যাপন করিয়াছি— যুদ্ধের সংবাদে আমাকে আর প্রলুব্ধ করিবেন না— এখন আমার ছুটি মঞ্জুর করিয়া দিন।

আপনার শরীর কেমন আছে? একবার এদিকে বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া যান না। ইতি ১৬ই ফাল্গুন ১৩০৮

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

সাদর সম্ভাষণমেতৎ

আগামী ১লা বৈশাখে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে নববর্ষের উৎসব হইবে— আপনার ছেলেটিকে লইয়া যদি সংক্রান্তি অথবা তাহার পূর্ব্বদিনে আসেন এবং উৎসবে যোগদান করেন ত আনন্দিত হইব। ছেলে লওয়া সম্বন্ধে আমাদের নিয়ম এই যে, দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছেলেদের আমরা বিদ্যালয়ে লই না। কারণ ছোট ছেলেদের সহিত বড় ছেলেদের মিশিতে দেওয়া নিরাপদ নহে। আপনার ছেলেটির বয়স যদি অধিক না হয় তবে তাহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। আপনি এখানে আসিয়া কিছুকাল থাকিয়া যান। আপনার শরীর ভাল হইবে— কাজ করিতে পারিবেন। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রণালীও দেখিয়া লইতে পারিবেন— আমাকে তাগিদ দিয়া সমালোচনা লিখাইয়া লইবারও অবসর পাইবেন। অতএব এমন সুবিধা ছাড়িবেন না। শৈলেশের দল বোধ হয় আসিতে পারে— আপনি তাহাকে পাণ্ডা স্বরূপে বরণ করিয়া লইবেন। পাথেয়ের ভার সম্পূর্ণ আমার উপর দিবেন— আহূতের পাথেয় আহ্বান-কর্ত্তার দেয় ইহাই আমাদের দেশের সনাতন প্রথা— অতএব এ সম্বন্ধে আপনি যদি বিলাতী কায়দার অনুসরণ করেন তবে দুঃখিত হইব। রিক্ত হস্তে আসিবেন। কেবল যদি লেখাপড়া করিতে চান তবে আপনার অর্দ্ধসমাপ্ত ও সদ্য আরব্ধ প্রবন্ধগুলি সঙ্গে করিয়া আনিবেন। অবকাশের সময় আপনার বইখানি আপনার সঙ্গে বসিয়া পড়িবার ইচ্ছা করি— তাহা হইলে আলোচনার অনেক খোরাক পাওয়া যাইবে। শিলাইদহে আসিবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন বোলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলে আপনাকে সেই সত্য হইতে মুক্তি দিব— অতএব ইহকাল পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনি আর কালবিলম্ব করিবেন না। ইতি ২৬শে চৈত্র ১৩০৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার শরীরটা ভাল নাই। আপনার চোখের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলাম। একান্তমনে কামনা করি রোগ এবং চিকিৎসকের হাত হইতে চোখ দুটিকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

আপনার ছেলেটির জন্য যেমন করিয়া হউক জায়গা রাখিব আপনি ভাবিবেন না। সংখ্যা পূর্ণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে— তাহা হইলেও আপনার পুত্রের স্থান হইবে।

বিদ্যালয়ের কাজে চলিলাম— অতএব সংক্ষেপে সারিতে হইল। ইতি শুক্রবার। [১৩০৯]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

প্রিয়বরেষু

“উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে” ইত্যাদি শ্লোক মনে আছে? সজ্জনের বাক্য লঙ্ঘন হয় নাই— সূর্য্যও পূর্ব্বদিকে উঠিতেছে আপনার সমালোচনাও শেষ করিয়াছি, মস্ত হইয়াছে— বঙ্গদর্শনের এক ফর্ম্মারও অধিক হইবে। এটা আলোচনা সমিতিতে পড়িবার ইচ্ছা করিতেছি ইহাতে আলোচনা· যোগ্য অনেক কথার অবতারণ করিয়াছি।

ছেলেটিকে আমার সঙ্গেই পাঠাইবেন— তাড়া নাই। কিন্তু তাই বলিয়া চোখ দুটি সারাইতে বিলম্ব করিবেন না। আমি নানা শাস্ত্র হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে চক্ষু অত্যন্ত যত্নের সামগ্রী। একটা পরামর্শ দিই— অন্ততঃ কিছুদিন পরীক্ষা করিয়া দেখুন। একজন ভাল হোমিয়োপ্যাথ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান। বাছিয়া বাছিয়া হাতুড়ে ডাক্তার বাহির করিবেননা। যদি সম্পূর্ণ নির্জ্জন ঘরে কিছুদিন চোখ বুজিয়া থাকিতে চান তবে এখানে আসিবেন— আপনাকে অন্ধকারায় বন্দী করিয়া রাখিয়া দিব।

আজ এই পর্য্যন্ত ১২ই জ্যৈঃ ১৩০৯।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আপনার চোখের অবস্থা শুনিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। একান্ত মনে কামনা করিতেছি আপনার চক্ষু দুটি নিরাময় হউক্।

আমি আগামী শুক্রবারে কলিকাতায় যাইব। এগারই মাঘের কাজ সারিয়া আবার ফিরিব— সেই সময়েই হয় ত আপনার ও কবিরাজ মহাশয়ের এখানে আসা সুবিধাকর হইবে। গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অনেকদিন হইতে আশা করিতেছি এখানে আপনি সপরিবারে আসিবেন, দেখিতে দেখিতে শীতকাল বিদায়োন্মুখ হইয়া আসিল— গ্রীষ্ম পড়িলে এস্থান আপনাদের সুখকর বোধ হইবেনা হয় ত বেশিদিন থাকিতে পারিবেননা। অরুণ বেশ ভালই আছে— তাহার জন্য চিন্তিত হইবেন না। শীঘ্র সাক্ষাৎ হইলে সকল কথা বিস্তারিত আলোচনা হইবে। রথী ও সন্তোষ জগদানন্দ এবং মনোরঞ্জনবাবুকে লইয়া কৃষ্ণনগরে Test Examination দিতে গেছেন। তাঁহারাও সম্ভবত বৃহস্পতি কিম্বা শুক্রবারে ফিরিবেন। ইতি ২৯শে পৌষ ১৩০৯।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

ওঁ

হাজারীবাগ

বন্ধুবরেষু

পত্রে আপনার চোখের কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি। আশা করি আপনার দর্শন শক্তির কোন স্থায়ী ব্যাঘাত হইবেনা।

আমি এখানে আসিয়া রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। এখন এখানে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে একে একে আমাদের সকলকেই শয্যাশায়ী করিয়াছে। ঐ রোগটার দোষ এই যে উহার লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষা উত্তর কাণ্ডই বেশি নিদারুণ। কাশি দুর্ব্বলতা অরুচি মন্দাগ্নি, প্রভৃতি উপসর্গ কিছুতেই দখল ছাড়িতে চায় না।

বিদ্যালয়ে ফিরিবার জন্য আমার চিত্ত উৎসুক হইয়াছে— আধি ব্যাধির হাত হইতে কোনমতে একটুখানি ছুটি পাইলেই আমি আমার বালখিল্যগুলির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইব। সেখানে ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য একজন ইংরাজ শিক্ষক রাখিয়াছি কিন্তু তাহার কাজ দেখিয়া আসিতে পারি নাই সেজন্য মন উদ্বিগ্ন আছে। শীঘ্র সেখানে একটি কারখানা খুলিবার সংকল্প আছে সেজন্যও আমার উপস্থিতি আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া, আমার কর্ত্তব্যকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমি সমস্ত ভারই নির্ব্বিচারে বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। তিনি ক্রমশই ইহাকে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন তাহা প্রত্যহ উপলব্ধি করিতেছি।

কলিকাতায় প্লেগের যেরূপ উপদ্রব তাহাতে গ্রীষ্মের অবকাশে শ্রীমান অরুণকে সেখানে পাঠানো কোনমতেই সঙ্গত হইবেনা। যদি আপত্তি না করেন, ছুটির সময় তাহাকে আশ্রমে রাখিয়াই তাহার পুরাতন পাঠ অভ্যাস করাইয়া লইব। সে সময় যদি কোন সুযোগ করিতে পারি তবে আপনাদিগকেও আনাইয়া লইবার চেষ্টা করিব। আমি সম্ভবত আর দিন পনেরোর মধ্যে বোলপুরে যাইব— কোন বাধা মানিবনা। ছুটির পূর্ব্বে আমি না গেলে নয়।

যতদিন বাঁচিয়া আছি আপনারা আমাকে আপনাদেরই কাজে এবং আপনাদেরই নিকটে পাইবেন; বাল্যকালে স্কুল পালাইয়াছি— প্রৌঢ় বয়সে আমার বিদ্যালয় হইতে পলাতক হইবনা।

সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আর আমার চিন্তা ও চেষ্টাকে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে দিবনা। কর্ত্তব্য সঙ্কোচ না করিলে কর্ত্তব্য পালন করা যায়না কেবল বৃথা ভ্রাম্যমাণ হইতে হয়। নিষ্কৃতি প্রার্থনা করিয়া হীরেন্দ্রবাবু ও যতীন্দ্রবাবুকে পত্র লিখিয়াছি। Easterএর ছুটির সময় হীরেন্দ্রবাবু বোলপুরে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি থাকি বা না থাকি তিনি গেলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব একথা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানাইবেন এবং আপনিও তাঁহার সাথী হইবার চেষ্টা করিবেন। আপনাদের নিরাময় সংবাদ দিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিবেন। ইতি ১৯শে চৈত্র ১৩০৯।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

শ্রীশবাবু আসিয়াছিলেন। নহিলে এতদিনে আপনার প্রশ্নের উত্তর পৌঁছিত। যাহা হউক আপনি আসিয়া পড়ুন— দ্বিধামাত্র করিবেন না। দুর্য্যোগ চলিতেছে। সঙ্গে সূর্য্যালোক আনিবার চেষ্টা করিবেন। ইতি ১৯শে আশ্বিন ১৩১০।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু

তাই করিবেন— আমার মন্তব্য হইতে কোন স্থান যদি উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করেন তাহাতে আমার আপত্তি থাকিতে পারেনা। একটু নিশ্চিন্ত না হইলে ভূমিকা লেখায় হাত দিতে পারিতেছিনা। বিদ্যালয়টি ছুটির পরে অধ্যাপকে ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া হঠাৎ কোটালের বানের মত আমার ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে— উক্ত ঘাড় অপটু আছে বলিয়া তাহার প্রতি লেশমাত্র অনুকম্পা করে নাই— আমিও হার মানিতে চাইনা— কাজেই আমাকে বুক ফুলাইয়া তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে।

আপনি যে পঞ্চাননবাবুর কথা বলিয়াছিলেন তাঁহাকে কি অল্প বেতনে বিদ্যালয়ে আকর্ষণ করা সম্ভবপর হইবে? তাঁহাকে পাইলে বিশেষ সুবিধা হয়। বিদ্যালয়ের আয়ব্যয় লইয়া হাবুডুবু খাইতেছি। অম্বুবাহ মেঘের জন্য চাতকের ন্যায় শুষ্ককণ্ঠ বিদ্যালয় আর কয়েকজন বেতনবর্ষী ছাত্রের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

আপনার মাথার অসুখ ভাল করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিবেন না।

বড় ব্যস্ত আছি। ইতি ২রা কার্ত্তিক ১৩১০।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

শীতের জন্য চিন্তা করিবেন না। অরুণকে গরম রাখিব। ইতিমধ্যে সংস্কৃত পড়াইবার লোক পাওয়া গেছে অতএব পঞ্চাননবাবু নারাজ হওয়ায় সুবিধাই বিবেচনা করিতেছি— তিনি এখানকার যোগ্যলোক হইলে ঈশ্বর তাঁহাকে মিলাইয়া দিতেন। বোটে গিয়া আপনার ভূমিকা লিখিব। অগ্রহায়ণের আরম্ভেই বোটে যাইবার সংকল্প আছে। তাহার পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে দেখা হইবে। শৈলেশের গতিক কি

রকম বুঝিতেছেন ? স্বষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগরণ এই তিন অবস্থার মধ্যে সে কোন্ অবস্থায় আছে ? ছাপাখানার করাল কবলের ভিতর হইতে গ্রন্থাবলী ত সাড়া দিতেছে না— হতভাগ্যের কথা মনে করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়— আজকাল হতাশ হইয়া মনে না করিবারই চেষ্টা করি। ইতি ২৪শে কার্ত্তিক [১৩১০]।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১২

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

শরীর অপটু। মনও বিদ্যালয়ের অর্থচিন্তায় উৎকণ্ঠিত। রামায়ণের ভূমিকা যথেষ্ট মনোযোগের সহিত লিখিতে পারি নাই। সে ক্ষমতা এখন নাই। কবে হইবে অপেক্ষা করিয়া থাকিলে আপনার ক্ষতি হইবে। অতএব অসময়ের এই সামান্য উপহারটুকু লইয়া আমাকে স্মরণে রাখিবেন। প্রাপ্তি সংবাদটুকু দিবেন। ইতি ২০শে পৌষ [১৩১০]।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

প্রিয়বরেষু

অরুণ যখন ছুটির পরে বিদ্যালয়ে আসিয়াছিল তাহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম। সেই অবধি তাহার চিকিৎসা ও পথ্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইয়াছিল। এখন সে অনেক সুস্থ হইয়াছে। তাহার মাথা ঘোরা সারিয়া গেছে— তাহার গায়ের পাঁচড়া প্রভৃতি শুকাইতেছে এবং সে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রফুল্লতার সহিত অধ্যয়নে ও খেলায় মন দিতে পারিতেছে। তাহার জন্য আপনি লেশমাত্র চিন্তিত হইবেন না।

পত্রে আপনার অর্থের অভাব ও শরীর মনের অবসাদের কথা পড়িয়া কষ্ট বোধ করিলাম। ঈশ্বর আপনার এ দুর্য্যোগ দূর করুন।

মোহিতবাবু আসিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ইতি ৬ই ফাল্গুন ১৩১০

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

ওঁ

শিলাইদহ

প্রীতিভাজনেষু

আমার শরীর সুস্থ নহে। এখানকার আর সমস্ত খবর ভাল। অরুণ পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ কিন্তু নীরোগ নহে— তাহার জন্য আমার উদ্বেগ দূর হয়না— এবারে ছুটির সময় তাহাকে আমার কাছেই রাখিব।

"আমার জীবন" পুস্তকখানি উপাদেয়। শরীর তাজা থাকিলে সমালোচনা করিতাম। সমালোচনার ভার আপনিই গ্রহণ করিবেন। এরূপ গ্রন্থ গোপনে থাকিবার কোন কারণ দেখিনা।

বঙ্গদর্শন ত পাই নাই— আপনি কি সম্পাদকীয় নেপথ্যগৃহেই নৌকাডুবি পড়িয়া লইয়াছেন ?

মোহিতবাবু বি,এ, পরীক্ষার কাগজ সংগ্রহের জন্য দিনদুয়েকের মত কলিকাতায় গিয়াছেন— বৃহস্পতিবারে ফিরিবার কথা। ইতি ৯ই চৈত্র ১৩১০

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

ওঁ

প্রিয়বরেষু

মোহিতবাবু হয় ত সোমবারে আসিবেন। তাঁহার ওখানে গিয়া খবর লইবেন। একসঙ্গে আসিলেই সুবিধা হয়— কারণ এখান হইতে কুষ্টিয়ায় বন্দোবস্ত করা কিঞ্চিৎ চেষ্টাসাধ্য— মোহিতবাবুর জন্য ব্যবস্থা করিতেই হইবে— একসঙ্গে আসিলে আমাদের পক্ষে সুতরাং আপনাদের পক্ষে সুবিধা হইবে। নদীর জল কমিয়া যাওয়ায় ষ্টীমার একবার বই চলে না। সুতরাং ষ্টীমার খোয়াইলে, হয় সমস্ত দিনরাত্রি কুষ্টিয়ায় যাপন করিতে হয়, নতুবা নৌকাযোগে আসিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। নৌকাপথে অন্তত ৬।৭ ঘণ্টা লাগিতে পারে। এই সমস্ত বিবেচ্য।

অরুণকে যদি হোমিয়োপ্যাথি দেখাইতে পারিতেন ভাল করিতেন।

ছাত্রগুলিকে লইয়া নূতন ব্যবস্থা করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি শুক্রবার, [চৈত্র ১৩১০]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

ওঁ

১১ই বৈশাখ, ১৩১১

প্রিয় সম্ভাষণমেতৎ

শৈলেশ বলে তাহার liability প্রায় ১২।১৩ হাজার হইবে। Assets অন্তত হাজার পনেরো টাকার আছে। যে দেনার সুদ খাটিতেছে অর্থাৎ যাহা আশু পরিশোধ করা কর্তব্য তাহার পরিমাণ ৬।৬॥ হাজার। বাকি টাকা ক্রমশঃ শুধিলে চলিবে ইত্যাদি।

বঙ্গদর্শন সমিতির কথা বলিয়াছি। যতীও উপস্থিত ছিলেন। আগামী রবিবারেই প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিবেন— আপনি সেক্রেটারি।

মহারাজ আজ লিখিয়াছেন—"বঙ্গদর্শন ও বোলপুর বিদ্যালয়ের জন্য কতক সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। বর্তমান বৈশাখ হইতে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ··৫০ টাকা আপনার কর্ম্মচারীর নামে মানি অর্ডার করা হইবে"।

অতএব নিশ্চিন্ত হইবেন।

শৈলেশের নিকট হইতে কাগজপত্র সমস্ত লইবেন— যতী আপাকে Review of Reviews পত্রিকা দিবে— আরো দুই একটা ইংরাজি মাসিকের জোগাড় করিতে পারিলে ইংরাজি বাংলা সাহিত্যে মিলাইয়া আপনার সাহিত্য প্রসঙ্গকে উপাদেয় করিতে পারিবেন।

এখনি mail ধরিতে যাইতে হইবে। অতএব বিদায়ের নমস্কার। অরুণকে সুস্থ রাখিবেন ও পড়ায় প্রবৃত্ত রাখিবেন। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

ওঁ

মজঃফরপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

শৈলেশকে অবশ্য হিসাব দেখাইতে হইবে। ব্যবসায়ের দস্তুর না মানিলে চলিবে কেন? আমি তাহার যে কয়টি দেনার কথা জানি তাহা এই:— মহিম ২॥০ হাজার, আর একব্যক্তি ২ হাজার, আমি ১ হাজার— এই সাড়ে পাঁচ হাজার তা ছাড়া উহাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে দেনা করিয়াছে তাহা আমি জানি— নিজের সম্বলও কিছু দিয়াছে তথাপি আমার বিশ্বাস ১০ হাজার টাকার উপরে দেনা হইবার কথা নহে। যাহা হউক্ দেনার হিসাব দূরে রাখিয়া দেখা যাইতে পারে assets কত আছে। তাহা এবং চল্‌তি কারবারের goodwill লইয়া তাহাকে কত দেওয়া যাইতে পারে ইহাই বিবেচ্য। অবশ্য নগেন্দ্রবাবু যদি এই কারবার গ্রহণ করেন তবে এই কোম্পানির সহিত আমার সম্বন্ধ পুর্ব্ববৎ থাকিবে— আমার সমস্ত গ্রন্থ ইঁহাদেরই হাতে রাখিব এবং সুবিধামত terms এই রাখিব। আপনি বোধহয় জানেন আমার সমস্ত গ্রন্থের স্বত্ব আমি বোলপুর বিদ্যালয়কে দিয়াছি— অথচ অর্থাভাবে আমি ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া ফিরিতেছি— কাজের লোকের হাতে পড়িলে এ দুর্দ্দশা হইত না এই জন্য এবং দুর্ভাগা শৈলেশের আসন্ন দুর্গতি স্মরণ করিয়া আমি কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

এখানে আমার শরীর ভালই আছে— ইতিমধ্যে আর জ্বর আসে নাই। চুপচাপ করিয়া কেদারা হেলান্ দিয়া পড়িয়া আছি— অল্প-স্বল্প লিখিতেছি, যথাসাধ্য খাইতেছি— ইহাতে জ্বর আসিবার কথা নয়।

আমি "বঙ্গবিভাগ" লইয়া বঙ্গদর্শনে একটা সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিয়াছি। আপনি "সাহিত্যপ্রসঙ্গ" লিখিবেন। পথের মধ্যে এক খণ্ড "হিন্দুস্থান রিভিয়ু" কিনিয়াছিলাম সেটা আপনাকে পাঠাইয়া দিব— তাহাতে সামাজিক প্রবন্ধ লইয়া আলোচ্য বিষয় আছে।

আপনার গল্পটি কি করিলেন? আপনাকে কিছুদিন কাছে পাইলে আপনাকে দিয়া আমি গল্প লিখাইয়া লইতে পারিতাম— Collaborationএ দুইজনে মিলিয়া গল্প লেখাও মন্দ নয়, ফ্রান্সে খুব চলিত আছে— একবার এই প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে। অরুণ ভাল আছে ত? তাহাকে পড়াশুনায় নিযুক্ত রাখিবেন। ইতি ১৬ই বৈঃ ১৩১১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

ওঁ

মজঃফরপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

নগেন্দ্রবাবুর পত্রের উত্তর দিয়াছি দেখিয়া থাকিবেন। সমস্ত হিসাবপত্র দেখিয়া একটা সঙ্গত দর স্থির করাই business like হইবে। এই মজুমদার লাইব্রেরির জাল ছিন্ন করিতে পারিলে আমি কতকটা সুস্থ হইতে পারিব। আপনি আমার এই যে উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কৃতকার্য্য হউন্ বা না হউন্ আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন।

আপনাকে Hindustan Review পাঠাইয়া দিলাম। যতীকে লিখিয়া দিলাম আপনাকে Review of Reviews খানা নিয়মমত পাঠাইয়া দিতে। যদি Spectator কাগজ খানা জোগাড় করিতে পারা যায় তাহা হইতে লেখ্য বিষয় অনেক পাওয়া যায়।

আমি য়ুনিভার্সিটি বিল লইয়া আষাঢ়ের সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিয়াছি এবং আষাঢ়ের নৌকাডুবিও আজ শেষ করা গেল।

শৈলেশ Renal Colic লইয়া ভুগিতেছে— বোধহয় সেই জন্য সমিতির কার্য্য বিবরণ পাঠাইতে পারে নাই— যদিও, আমার বিশ্বাস এই Colic ধরিবার পূর্ব্বেই সে পাঠাইতে পারিত কিন্তু শৈলেশকে ত চেনেন। সে পিতৃদত্ত নাম সার্থক করিয়াছে— শৈলেশের মতই সে অচল।

বঙ্গদর্শনের বৈশাখ সংখ্যা পড়িয়া এখানকার পাঠকগণ বিস্তর ধিক্কার দিয়াছে— আপনারা যদি পারেন বঙ্গদর্শনের এই ম্লানিমা দূর করিয়া দিবেন— আমার আর সাধ্য নাই।

আপনার গল্পের বই পাইবার জন্য উৎসুক রহিলাম। ইতি ২১ বৈশাখ ১৩১১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

ওঁ

মজঃফরপুর

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

মধ্যে কাশী ভ্রমণ করিতে গিয়া ভাল করি নাই— শরীরটা আবার কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবু কলম ছাড়ি নাই একটু আধটু লেখা চলিতেছে— আষাঢ় মাসের নৌকাডুবি এবং সাময়িক প্রসঙ্গ

পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছি। আজ প্রার্থনা বলিয়া একটা প্রবন্ধ পাঠানো গেল। ইহাতে আষাঢ় মাসের খোরাক চলিবে।

আপনিও আষাঢ়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ত? যতী লিখিয়াছে আপনাকে Review of Reviews দিয়াছে। Academy Spectator প্রভৃতি সাপ্তাহিক কাগজে অনেক আলোচ্য বিষয় থাকে। হেমবাবু (হেম মল্লিক) Academy প্রভৃতি অনেকগুলি কাগজ লইয়া থাকেন [য]দি যথাসময়ে ফেরং দিবার আশা [দি]য়া এই কাগজগুলি আপনি দেখিয়া লইবার বন্দোবস্ত করেন [ত] কেমন হয়?

সমিতির অধিবেশনটা নিয়মমত চালাইবেন।

নগেনবাবুর সঙ্গে বাঁকিপুর ষ্টেশনে চকিতের মত আমার দেখা হইয়াছিল। যদি তিনি হিসাব দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে— আমি আপনার পত্র পাইলে শৈলেশকে হিসাব দেখাইতে লিখিব।

ত্রিপুরা হইতে নিয়মমত টাকা আসা দেখিতেছি সন্দেহস্থল। একবার মহিম ঠাকুরকে আপনি দুঃখ নিবেদন করিবেন। যদি দুই চারিদিনের মধ্যে আসিয়া থাকে জোড়াসাঁকোয় খবর লইয়া জানিবেন। আমাদের কর্ম্মচারী যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামে আসিবার কথা। গগনদের বলিলে তাঁহারা যদুকে ডাকাইয়া খবর লইতে পারিবেন।

অরুণকে মোহিতবাবুর কাছে রাখিয়া দিন না— তাহার পড়াশুনাও হইবে— শারীরিক অযত্নও হইবেনা। ইতি ২৯শে বৈঃ ১৩১১।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

ওঁ

[বোলপুর]

প্রীতিসম্ভাষণমেতৎ

বিদ্যালয়ের কাজে আকণ্ঠ নিমগ্ন আছি। পলায়ন ব্যতীত উপায় দেখিনা— অতএব কাল সোমবারে কন্যাগৃহে দৌড়িব। নিয়মাবলী মহারাজকুমারকে পাঠান গেল। এখানে আসিয়া সতীশের "গুরুদক্ষিণা" গ্রন্থের একটা সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইয়াচি—আর কিছু লিখিবার সময় পাই নাই।

অরুণ ভাল আছে— ওজনে বাড়িতেছে। সাহিত্য প্রসঙ্গের কথা ভাবিতেছেন ত? ইতি রবিবার

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ

"তিন বন্ধু" সম্বন্ধে আপনাকে যিনি যতই উৎসাহিত করুন আপনার এই বর্ত্তমান পত্রলেখক বন্ধুটি সায় দিতে পারিতেছেন না— আর একখানা ভাল বই আপনাকে লিখিতে হইবে— আপনার ছেলেবেলার কথা, গ্রামের কথা, ঘরের কথা লইয়া একখানা খুবই সত্যকার বই লিখিবেন—তাহা হইলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। [আষাঢ় ১৩১১] শ্রী

২১

ওঁ

শুক্রবার

প্রিয়বরেষু

বুধবার ত কাটিয়া গেল। আছেন কেমন? আমার শরীর অসুস্থ। আগামী রবিবারে সকালে গিরিধি রওনা হইব।

শমী মীরাকে পড়ান ও শেলাই শেখানোর জন্য মেম ঠিক করিতে পারিলেন? যদি স্থির হইয়া থাকে জোড়াসাঁকোয় সত্যকে জানাইবেন।

এখানে "গগনে গরজে মেঘ
ঘন বরষা।"

অরুণ বেশ ভাল আছে। এরূপ সুস্থ তাহাকে অনেক কাল দেখি নাই। ভারতী বা বঙ্গদর্শনের জন্য লেখা আমার পক্ষে সম্প্রতি অসাধ্য হইয়াছে। [২৮ শ্রাবণ ১৩১১] শ্রীরবীন্দ্র

২২

ওঁ

প্রিয়বরেষু

সম্ভবত আপনি আজ বোলপুরে রওনা হবেন না— না হলেই ভাল, কারণ জুরির আকর্ষণে কাল রবিবারে আমাকে কলকাতায় যেতেই হচ্চে। যদি এ পত্র সেখানে পান অপরাহ্ণে দেখা করবেন। ইতি শনিবার [২৯শে শ্রাবণ ১৩১১]।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩

ওঁ

প্রিয়বরেষু

অরুণ আমার সঙ্গে নিরাপদে এসে পৌচেছে। কলকাতার চেয়ে এ জায়গা ঠাণ্ডা— অরুণের সঙ্গে গরম কাপড় দিয়েছেন ত?

সম্প্রতি বিদ্যালয়ে আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেক বেশি শিক্ষক সঞ্চিত হয়েছে। অতএব এখন আপনি এখানে আসবার জন্যে প্রস্তুত হবেন না। আমি একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে পরে আপনাকে জানাব।

বঙ্গবাবু তাঁর দুটি ছেলেকে এনেছেন। তিনি নিজে কাল কলকাতায় যাবেন। ইতি বুধবার। [১ অগ্রহায়ণ ১৩১১]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

ওঁ

প্রিয়বরেষু

দুই একদিনের মধ্যেই যাইতেছি। ইতি ১৬ই বৈশাখ ১৩১২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫

ওঁ বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আর কাজের কথা তুলিবেন না— আমার এখন ছুটি। প্রবন্ধ লিখিবার কথা আমার মনেও নাই— দেশ যে আমার কোনো কথার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে এমন আমার ধারণা হইতেছেনা। এখানে খোলা মাঠের বিপুল রৌদ্রের মধ্যে মনটাকে একেবারে মুক্তি দিয়া চুপ করিয়া তপ্ত হাওয়ায় পড়িয়া আছি। কখনো বা নিতান্ত আলস্য ভরে অর্ধশয়ান অবস্থায় দুটো একটা বাজে কবিতা লিখিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি [মহা]শয় আমি আমার অন্তরের অন্তরে জাতীয়তা স্বদেশিতা প্রভৃতি কথার· ·হইতে মুক্ত। যখনি অবকাশ পাই তখনি নিজের এই পরিচয় আমার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু বলিয়াছি নিশ্চয়ই তাহা অনেক মিথ্যায় বিজড়িত— তাহার মধ্যে শেখা বুলির ভাগই বিস্তর। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো স্বাধীনতা নাই— আমরা নূতন বন্ধনকেই মুক্তি বলিয়া ভ্রম করি। আমি এ সমস্ত জঞ্জালের মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে চাইনা— আগে বেশ একটু নিরালায় ভাল করিয়া নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লই— আগে নির্ম্মল অন্তঃকরণে সমস্ত জিনিসটাকে তলাইয়া দেখি— তার পরে যদি কথা বলার আবশ্যক থাকে ত কথা বলিব। আমি এখন লোকলোচনের অন্তরালে থাকিতে ইচ্ছা করি— আমার আর যশোমানে কাজ নাই। ভিড়ের মধ্যেই যদি দিন কাটাই তবে ঘরের কাজ কখন করিব? অতএব এবারে আমি সরিয়া পড়িলাম। মহিমকে আজই একটা তাগিদ পত্র পাঠাইব। আপনি আমার বৎসর ফল গণনার জন্য ব্যস্ত হইবেন না।

পরীক্ষার কাজ শেষ হইয়া গেলে একবার না হয় বোলপুরে বেড়াইয়া যাইবেন। জায়গাটা দার্জ্জিলিং নয় সে কথা সত্য কিন্তু আমি দেখিয়াছি মানুষ গরম গরম বলিতে বলিতে অত্যুক্তি দ্বারা নিজেকে অধীর করিয়া তুলে। বোলপুরের গরম আমার কাছে একদিনও অসহ্য বোধ হয় নাই।

আশা করি আপনাদের সমস্ত মঙ্গল। ইতি ৯ই বৈশাখ ১৩১৩

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

ওঁ

প্রিয়বরেষু

ক্লাসের ক্ষতি হইবে শুনিয়া অধ্যাপকদের এবং অরুণের অমতে অরুণকে পাঠাইতে দ্বিধা করিতেছিলাম— লোকেরও অভাব— কাহার সঙ্গে পাঠাই? আপনি আসিয়া যদি লইয়া যান তবে অল্পকালের জন্য তাহাকে ছুটি দেওয়া যায়।

বঙ্গভাষার অনতিবৃহৎ ইতিহাস যদি লেখেন তবে নিশ্চয় তাহা পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত হইবে। আমার বিশ্বাস জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ এ গ্রন্থ ছাপিবার খরচ দিতে কার্পণ্য করিবেন না। গ্রন্থ প্রকাশের কোনো ফণ্ড যে সঞ্চিত হইয়াছিল বা হওয়া সম্ভব এমন ত আমার মনে হয় না।

নৌকাডুবিকে নানা স্থানে খর্ব্ব করিয়া তাহাকে বেশ একটু আঁটসাঁট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এরূপ স্থলে তাহার অনেক সুরচিত সুপাঠ্য অংশও নিশ্চয়ই বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু বাগান সাজাইতে হইলে আবশ্যক মত অনেক ভাল গাছও ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়— এ সকল কাজ নিপুণভাবে করিতে হইলে নিষ্ঠুর ভাবেই করিতে হয়। নিজের লেখার সম্বন্ধে সুবিচার করা শক্ত— তাহার কারণ, অন্ধ মমত্ব বাধা দেয়— কিন্তু ছাঁটিবার বেলায় সেই মমত্ব অতি ছেদনের হাত হইতে রক্ষা করে। আমি যদি লেখক না হইয়া সমালোচক হইতাম হয়ত আরো অনেক বেশি কাটিতাম।

এখানে আসিয়া শরীরটা কলিকাতার চেয়ে অনেক ভাল আছে।

আপনাদের খবর ভাল ত? ইতি ১লা আষাঢ় ১৩১৩

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭

ওঁ

শিলাইদহ

প্রিয়বরেষু

এইমাত্র আপনার বেহুলা ও ফুল্লরা পড়িয়া শেষ করিলাম।

আমি মনসার ভাসান পূর্ব্বে পড়ি নাই। সুতরাং আপনার বেহুলার সঙ্গে প্রচলিত গল্পের তুলনা করিতে আমি অক্ষম। কিন্তু তুলনা নাই হইল আপনার বইখানি পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। আমাদের দেশের বালক বালিকাদের পড়িবার উপযুক্ত করিয়া পুরাণ কথা রচনা করিবার জন্য আমি অনেকদিন হইতে অনেককে [উৎসা]হ দিয়াছি। সেই উৎসাহের······পরলোকগত সতীশের "গুরু দক্ষিণা" বইখানি রচিত হইয়াছে। সেই বইখানি আমার বিশেষ প্রিয়, আপনিও সেখানি পড়িয়া দেখিবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শৈলেশ এই গ্রন্থ প্রকাশ করাতে এটা যেন জগদ্দল পাথর চাপা পড়িয়াছে।

ফুল্লরা বইখানাকে যথোচিত বড় করিয়া তুলিবার জন্য আপনি অনেকটা বাহুল্য টানাবোনা করিয়াছেন। খুব শাদাসিধা না হইলে এ রকম গল্পের রস রক্ষা হয় না। একপ্রকার আত্মবিস্মৃত গ্রাম্য ভাবই ইহার···· ·আপনি যেন সভ্যতার খাতিরে···

চিঠির বাকি অংশ লুপ্ত

২৮

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আপনি নানা কাজে ব্যস্ত আছেন তবু আপনাকে আর একবার বিরক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আপনার প্রতি বোলপুর বিদ্যালয়ের কোনো দাবী নাই এমন কথা বলা চলেনা— সেই জন্যই এই বিদ্যালয় যদি কোনো বিষয়ে বঞ্চিত হইতে পারে— এমন আশঙ্কা ঘটে তবে তাহা দূর করিবার জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়া নিষ্ফল হইবনা এরূপ আশা করিতে পারি। দুই সহস্র খণ্ড চারিত্রপূজা গ্রন্থ দুইবারকার বি এ পরীক্ষার্থী এবং অন্যান্য পাঠকদের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া যদি আপনার নিকট সম্ভবপর বোধ হয় এবং যদি দেখেন যে এখনো অনেক বই ভট্টাচার্য্যদের দোকানে বাকি আছে তবে আমাদের বঞ্চিত বিদ্যালয়ের দিকে তাকাইয়া সামান্য কিছুও যদি চেষ্টা করেন তবে আমি তৃপ্তিলাভ করিব। আপনি এমন কথা মনেও করিবেন না যে অরুণকে আমি কিছুদিন বিদ্যালয়ে রাখিয়া পড়াইয়াছিলাম বলিয়া আপনার প্রতি উৎপাত করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। অরুণ বিদ্যালয়ের প্রতি তাহার অন্তরের শ্রদ্ধাদ্বারা আমাদের গুরুদক্ষিণা পরিশোধ করিয়াছে তাহার চেয়ে অধিক আমরা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু আপনি নাকি ভট্টাচার্য্যদিগকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলিয়া আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন এই কারণে এই ঘটনায় আপনার কিছু দায়িত্ব আছেই। আমি সেইটুকুর প্রতি নির্ভর করিব। যদি প্রমাণ হয় যে ভট্টাচার্য্যরা আমাদের সম্বন্ধে ঠিক সাধুব্যবহার করেন নাই তবে আপনাকে কদাচ দোষী করিব এমন মনে করিবেন না— আমি আপনাকে কোনো প্রকারে অন্যায় দোষ বা দুঃখ দিতে ইচ্ছা করিনা। কেবল আপনার সহায়তা প্রার্থনা করি মাত্র। এবং আপনিও বই কাটতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিরূপ অনুমান করেন তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আপনি আমার চেয়ে বোঝেন ভাল— এ সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে— সেই জন্যই আপনার শরণাগত হইয়াছি ইহাতে আমার প্রতি বিরক্তিবোধ করিবেন না। ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আপনার প্রেরিত চেকটি অনাবৃষ্টির কালে মেঘোদয়ের মত দেখা দিয়েছে— ওকে শীঘ্র ভাঙিয়ে নিয়ে বর্ষণে পরিণত করবার ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি এই দুঃখ স্বীকার করে আমাদের কতটা দুঃখ লাঘব করেছেন তা জান্‌লে আপনি পুণ্যকর্ম্মসাধনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন।

আমার পিতা সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন সে সংবাদ আপনার কাছে এই প্রথম পাওয়া গেল।

এই বইখানি সন্ধান করতে হবে। আপনি গগনদেরও একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। আমার পিতার সমস্ত রচনা ছাপাবার যে প্রস্তাব করেচেন সেটা আলোচনা করে দেখব। এবার কলকাতায় গিয়ে সে সম্বন্ধে সন্ধান করা যাবে।

আশু মুখুজ্জে মশায়কে প্রাচীন বাংলা গদ্যপ্রকাশ সম্বন্ধে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখে পাঠাব।

আপনার নূতন রচনাটির জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে আছি। আপনি Y, M, C, A,তে কি এরই কোনো অধ্যায় সম্প্রতি পাঠ করেচেন?

অরুণকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কাল আপনার ওখানে নিমন্ত্রণে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু নানা স্থান ঘুরিয়া কোনোমতেই সময় পাইলাম না— শরীরও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১১ই মাঘের পূর্বে সময়মাত্রই ছিলনা— এখন এত অল্প সময় বাকী যে ইহার মধ্যে বিবাহের আয়োজন ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। সশরীরে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতে পারিলামনা বলিয়া অপরাধ [গ্রহণ] করিবেন না— আপনিও সম্ভবত সশরীরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু অরুণের ত কোনো বাধা নাই। বিবাহ ১৪ই মাঘে রাত্রি ৯টার সময়। বউ ভাত ১৭ই মাঘ রবিবারে মধ্যাহ্ণে।

এখন আপনার শরীর ত ভাল আছে?

[১৩১৬]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

508 W. High Street
Urbana, Illinois
১৯ পৌষ ১৩১৯

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠিখানি পাইয়া খুসী হইলাম কিন্তু শরীর ভাল নাই জানিয়া ভাল লাগিল না।

সতীর তর্জ্জমার প্রুফ পাঠাইলেন লিখিয়াছেন, কিন্তু পাই নাই, বোধ হয় ভুলিয়াছেন। Paul Carus যে ধরণের বহি বাহির করেন তাহাতে মনে হয়না তিনি সতীর ইংরেজি অনুবাদ ছাপিতে প্রস্তুত হইবেন। আমার মনে হয় ইংলণ্ডে আপনার লেখা ছাপিবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ, সেখানে আপনার ইংরেজি গ্রন্থটি প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। যে কেহ পড়িয়াছে সকলেই বিশেষভাবে

দীনেশচন্দ্র সেন

১৮৬৬ ১৯৩০

প্রশংসা করিয়াছে। অথচ ছাপা কদর্য্য এবং ছাপার ভুল অপর্য্যাপ্ত। যাহাই হউক্ সেখানে যখন আপনার আসন প্রস্তুত হইয়াছে তখন এ দেশের দিকে না তাকাইয়া সেই দিকেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইবে। আমার বোধহয় Everyman's Library Series এর মধ্যে যদি আপনার বই চালাইতে পারেন তবে খ্যাতি অর্থ দুইই জুটিতে পারে। তাহা[দের কাছে manuscript] পাঠাইয়া দিবেন। Ernest Rhys ঐ Series এর Editor। আমাদের কালীমোহনের সঙ্গে তাঁহার খুব ভাব হইয়াছে।

ম্যাকমিলানেরা আমার লেখাগুলি ছাপাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। তাহার লেখাপড়া চলিতেছে। কথার কবিতা আমি এখানে বসিয়া নিজেই অনেকগুলা করিয়া ফেলিয়াছি। আমি দেখিলাম, নিজে না করিলে কোনমতেই সুবিধা হয় না। কারণ, বাংলার ভাষা ও ছন্দের সঙ্গীত ইংরেজিতে যখন আনা সম্ভব নয় তখন কেবল ভাবমাত্রটিকে অত্যন্ত সরল ইংরেজিতে তর্জ্জমা করিলে তবে তাহার ভিতরকার সৌন্দর্য্যটুকু ফুটিয়া উঠে। এই কাজটি আমার দ্বারা সহজেই হয়— কারণ সরল ইংরেজি ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছু হওয়া সম্ভব নহে, তার পরে নিজের ভাবটুকু অন্তত নিজে যথাসম্ভব বুঝি। সেদিকে ভুল হওয়ার আশঙ্কা নাই। ভাষাটাকে অত্যন্ত না জানার একটু সুবিধা আছে। অল্প জমি একজোড়া গোরু জুতিয়াও খুব ভাল রকম চাষ দেওয়া যায়— তেমনি নিজের সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে যেটুকু পারা যায় সেইটুকুর মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া বারবার করিয়া সেটাকে মাজাঘষা সহজ। যাহা ক্ষমতায় কুলায় না তাহা ছাড়িয়া দিই, যেখানে বাধা পাই সেখানে ঘুরিয়া যাই— নিজের জিনিষ বলিয়াই সেটা করা সম্ভব। এমন করিয়াও যে চলনসই কিছু খাড়া করিতে পারিব তাহা মনেও করি নাই— যাহা হউক চলিয়া ত গেছে। এখন লজ্জা ভাঙিয়াছে, সাহস বাড়িয়াছে। তাই অনুবাদ জমিয়া উঠিতেছে। আজ এইমাত্র শারদোৎসব শেষ করিলাম— বোধ হইতেছে এটাও চলিবে। যাহাই হউক্ ভাল করিয়া পারি আর না পারি নিজের কবিতা নিজে তর্জ্জমা করা ছাড়া উপায় নাই।

আপনার সেই Selection ছাপা কতদূর হইল জানিবার জন্য উৎসুক আছি।

অরুণকে এবং বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এইমাত্র সতী পাইলাম। যদি বাহুল্য অংশ ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া মাজাঘষা করা যায় তবে এ জিনিষ চলিতে পারিবে। মুস্কিল এই এদেশের লোকের সময় এত অল্প যে এরূপ কাজে কাহারো রীতিমত সাহায্য পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। যদি কোনো প্রকাশক ইহা গ্রহণ করে তবে তাহারা সম্ভবত কাহাকেও দিয়া ইহার ব্যবস্থা করিতে পারে। আজ রোটেনস্টাইনকে লিখিয়া দিলাম যদি তিনি Wisdom of the East অথবা Everyman's Library ওয়ালাদের দ্বারা আপনার এ বই মঞ্জুর করাইয়া লইতে পারেন। আগামী বসন্তে ইংলণ্ডে গিয়া আমি চেষ্টা দেখিব। আমেরিকার লোকেরা আমাদের দেশের মত—ইহারা ইংরেজ সমালোচকদের মুখ তাকাইয়া থাকে, ভালমন্দ নিজেরা বিচার করিতে সাহস করেনা— অতএব সেখান হইতে আদর না পাইলে এখানে প্রকাশক পাওয়া কঠিন।

৩২

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

আপনার পন্থা অনুসরণের চেষ্টায় আছি। কিছুদিন হইতে মস্তিষ্ক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে। বিশ্রাম করিতে না পারিলে একদা ক্ষতিপূরণ একেবারেই অসম্ভব হইবে। তাই সকলপ্রকার অনুরোধ এবং আমন্ত্রণ দূরে রাখিতে হইয়াছে।

ক্ষিতিমোহনবাবু কয়েকদিনের ছুটি লইয়া রাজসাহিতে তাঁহার শ্বশুরালয়ে গিয়াছেন বোধহয় আর ৩।৪ দিন মধ্যেই ফিরিবেন তখন আপনার প্রশ্নের উত্তর মেলা সহজ হইবে।

এখানে ব্যবস্থাবিভাগের কাজ এখন ত খালি নাই।

চিঠি সংক্ষেপে সারিতে হইল। ইতি ২৭ ফাল্গুন ১৩২০।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আজ আপনার পত্রখানি পাইয়া আমার মনের একটি ভার নামিয়া গেল। আমার প্রতি আপনার চিত্ত প্রতিকূল এতদিন এই কথাই মনে জানিতাম। এরূপ বিশ্বাস কেবল হয় পীড়াজনক তাহা নহে ইহা অনিষ্টজনক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সম্বন্ধ বিকার হইতে আপনি মুক্তিলাভের যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে আমাকেও মুক্তি দিয়াছেন— সেজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম। আপনার সহিত পরিচয়ের আরম্ভ হইতেই আমি সর্ব্বপ্রযত্নে আপনার সহিত সৌহৃদ্য স্থাপনেরই চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কেমন করিয়া যে বিপরীত ফল ঘটিয়াছিল তাহা আমার দুর্গ্রহই জানে— আমি এই জানি আমি কখনই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনার ক্ষতি বা বিরুদ্ধতা করি নাই। কিন্তু এ সকল কথা বিচার করিবার আর প্রয়োজন নাই। জীবনের অনেক গ্লানি একে একে মুছিবার আছে, অথচ সময় আছে অল্প— এই যে একটা দাগ মন হইতে মিটিল সে বড় কম কথা নহে।

কয়েকদিন হইল আপনার নূতন বইখানি পাইয়াছি। কিছুকাল হইতে এখানকার ছাত্রদের জন্য পাঠ্য রচনায় আমাকে এমন অধিকার করিয়াছে যে সমস্ত দিনে স্নানাহারের সময় ছাড়া সমস্ত সময়ই এই কাজে খাটাইতে হইয়াছে। লেখাপড়া সব বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে আপনার বইখানি এখানকার লাইব্রেরিতে চালান হইয়া হাতে হাতে ফিরিতেছে এইবার তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া পড়িব এবং কেমন লাগিল আপনাকে লিখিব।

এবারে কলিকাতায় গিয়া আপনার সঙ্গে এবং আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এম, এ পরীক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আপনি শরীরে মনে স্বাস্থ্য ও শান্তিলাভ করুন অন্তরের সহিত এই কামনা করি। ইতি ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

ভবদীয়

৩৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

নন্দলাল এখনো কলকাতায়। ফিরে এলে বৃহৎবঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ নিশ্চয় করব।

শরীর যে ক্ষণভঙ্গুর আমার দেহ প্রতিদিন তার নিঃসংশয় প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হচ্চে। এতদিন মন তাকে বহন করে জীবনযাত্রায় সারথ্য করছিল, কিন্তু বাহন এখন পিছনের দিকে ঘন ঘন লাথি ছুঁড়তে সুরু করেছে— পিঁজরাপোলের অভিমুখে তাঁর সমস্ত ঝোঁক, বোঝা যাচ্চে লাগামটা ফেলে দিয়ে স্বেচ্ছায় যদি না নেমে পড়ি তাহোলে ঝাঁকানি দিয়ে নামিয়ে ফেলবে হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে। এ অবস্থায় আমার কাছে যদি কিছু প্রত্যাশা করো তা হোলে তা পূরণের চেষ্টায় আমার নিঃস্বতা প্রকাশ পাবে। পূর্ব্বকালের তহবিলের মাপে এখনকার দাবী অসঙ্গত হবে। ইতি ২৭।২।৩৬

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫

ওঁ

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন
কল্যাণ নিলয়েষু

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবেন। বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী; কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা পল্লী হৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বত উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রসসৃষ্টি আর কখনো হয়নি। এই আবিষ্কৃতির জন্যে আপনি ধন্য। ইতি বিজয়াদশমী ১৩৪৬।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রসংখ্যা

১ পুত্রযজ্ঞ : গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত।

২ "ক্ষণিকা পাইয়া আপনি যে পত্রখানি লিখিয়াছেন" : দ্র° দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্র ৫ পৃ ১১৯।
"আপনার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার" : দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণ প্রসঙ্গে ; এই সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯০১ সালে।

৩ পত্রে যে 'বইখানি'র উল্লেখ আছে তাহা সম্ভবত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দ্বিতীয় সংস্করণ।
হীরেন্দ্রবাবু : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

৪ "আপনার ছেলেটিকে" : অরুণ—দীনেশচন্দ্রের মধ্যম পুত্র। ইঁহার প্রসঙ্গ নিম্নলিখিত পত্রগুলিতে আছে। ৫, ৬, ৭, ৮, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০।
শৈলেশ : শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৬ পত্রে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনার কথা বলা হইয়াছে। সমালোচনাটি বঙ্গদর্শনের শ্রাবণ ১৩০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত। 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত।

৭ রথী : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সন্তোষ : সন্তোষচন্দ্র মজুমদার
জগদানন্দ : জগদানন্দ রায়, আশ্রমবিদ্যালয়ের শিক্ষক
মনোরঞ্জন : মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক

৮ যতীন্দ্রবাবু : যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৯ শ্রীশবাবু : শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

১১ পত্রে রামায়ণী কথার ভূমিকার কথা বলা হইয়াছে। এই বইখানিরই ভূমিকার কথা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পত্রেও উল্লেখিত। ভূমিকাটি 'রামায়ণ' শীর্ষক প্রবন্ধ রূপে প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে সংকলিত।

১৩ মোহিতবাবু : মোহিতচন্দ্র সেন

১৪ "আমার জীবন" : রাসসুন্দরী দাসী -লিখিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত ভূমিকা, দীনেশচন্দ্র সেন -কর্তৃক গ্রন্থপরিচয় লিখিত।

১৮ পত্রে যে গল্পের বইয়ের কথা বলা হইয়াছে তাহা সম্ভবত 'তিন বন্ধু' (প্রকাশ ১৫ জুলাই ১৯০৪)।

১৯ গগন : শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০ সতীশ : সতীশচন্দ্র রায় (১২৮৮-১৩১০) ইনি "বি. এ. পরীক্ষার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছেন তখন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহার পরিচয় ঘটে এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ সাংসারিক উন্নতির আশা জলাঞ্জলি দিয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জীবন উৎসর্গ করেন।"
'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থের সমালোচনা : বঙ্গদর্শন ১৩১১ শ্রাবণ
তিন বন্ধু : দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত উপন্যাস।
"একখানা খুবই সত্যকার বই লিখিবেন" : সম্ভবত কবির এই প্রেরণার ফলেই পরবর্তী কালে 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' (১৩২৯) রচিত হয়।

২১ শমী : কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্র
মীরা : কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরা বা অতসী।

২৩ বঙ্গবাবু : বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য

২৭ বেহুলা ও ফুল্লরা : দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত গ্রন্থদ্বয়
গুরুদক্ষিণা : সতীশচন্দ্র রায় -রচিত

২৯ আশু মুখুজ্জে : সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৩০ রথীন্দ্রনাথের বিবাহ ১৪ মাঘ ১৩১৬

৩১ সতী : দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত গ্রন্থ। ইহার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে।
কালীমোহন : কালীমোহন ঘোষ

৩২ ক্ষিতিমোহনবাবু : ক্ষিতিমোহন সেন

৩৩ নূতন বইখানি : 'নীলমাণিক', প্রকাশ ভাদ্র ১৩২৫। দ্র° দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্র ৭, পৃ ১২১।

৩৪ নন্দলাল : নন্দলাল বসু
বৃহৎ বঙ্গ : দীনেশচন্দ্র সেন -রচিত গ্রন্থ। দ্র° দীনেশচন্দ্র সেন -লিখিত পত্র ৯, পৃ ১২২।

৩৫ ময়মনসিংহ গীতিকা : দীনেশচন্দ্র সেন -"কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত।"

পত্রাবলী রবীন্দ্রনাথকে লিখিত

দীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীহরি শরণং

১

৮।১।৯৬

কুমিল্লা

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

বহুদিনের ইচ্ছা ছিল, আপনার নিকট একখানা পত্র লিখি ; যেদিন "সাধনা আর বাহির হইবে না" এই দুঃখকর সংবাদ পড়িলাম, সেই দিন পত্র লিখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু লিখি নাই ; মনের নিভৃতে যে পূজা দিবার প্রবৃত্তি হয়, সাধক তাহা গোপন করেন, আমিও আপনার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির কথা লিখিতে কুন্ঠিত ছিলাম। কিন্তু সাধনার লোপে মনে যে একটী অভাব হইয়াছে, তাহা পূরণ হইতেছে না, বাড়ীর চিঠির আশায় যেরূপ প্রীতিকম্পিত উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে ডাকঘরের প্রতি চাহিয়া থাকিতাম, সাধনার জন্যও কতকটা সেই ভাবের আগ্রহ জন্মিয়াছিল। শুনিয়াছি সারসপক্ষীর মৃত্যুকালের সংগীতটিই মধুরতম হয় সাধনারও শেষ "বিদ্যাসাগর"-কথা বড়ই মিষ্ট হইয়াছিল ; উন্নত চরিত্রকে উন্নত মনে ধারণা করিবার শক্তি বাঙ্গলা সমালোচনায় সেই প্রথম পড়িয়াছিলাম ; আলো ও ছায়ার যথাযথ সম্পাতে উজ্জ্বল করিয়া বিশাল শাল্মলীতরুর ন্যায় ছবিখানিকে ফুলপল্লবের ফ্রেমে বাঁধিয়া দেখাইবার পরিণত কৌশল, সেই প্রবন্ধে ঠিক চিত্রকরের তুলির যোগ্যই হইয়াছিল।

পূর্ণ লীলা দেখাইতে দেখাইতে সাধনার অবসান হইল ; ক্রমে মন্দীভূত তেজে যাহা নিবিয়া যায়, তাহার শেষ দেখিতে মন অলক্ষিত ভাবে প্রস্তুত হয় ; সাধনার শেষ দেখিতে আমরা সেরূপ প্রস্তুত হইতে পারি নাই। 'সাধনা' গিয়াছে, সাধনার লেখক বর্তমান, ঈশ্বর তাহার আয়ু যশঃ লেখনী অক্ষয় করুন।

শ্রদ্ধা ও বিনয়াবনত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ঠিকানা—হেডমাস্টার, ভিক্টোরিয়া স্কুল, কুমিল্লা

২

শ্রীযুক্ত তারাকুমার রায়ের বাসা

১৪ই ডিসেম্বর ১৮৯৯

[ফরিদপুর]

শ্রদ্ধাভাজনেষু

আপনার কণিকা নামক সুন্দর নীতিকাব্য উপহার পাইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছি। পুস্তকের অপূর্ব কবিত্ব হইতে কবির স্বহস্ত লিখিত প্রীতিসূচক ছত্রটি পর্য্যন্ত সকলই আমার চক্ষে সম্মানযোগ্য। এই কাব্য প্রকৃত ধনবানের হস্তের দান,—কণিকা হইলেও বিশেষ মূল্যবান ; গল্পের পরিচ্ছদে নীতিকথা এরূপ

মনোজ্ঞভাবে এদেশে আর গ্রন্থিত হয় নাই ; ছোট ছোট সন্দর্ভগুলি ছোট ছোট বনফুলের ন্যায় এক এক প্রকার রূপ ও সুরভির পরিচয় দিতেছে, প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর এবং পাঠকহৃদয়ে এক একটি সমগ্র ভাবের চিত্র মুদ্রণ করিতে সক্ষম ; এই নীতিকথা প্রসঙ্গে আমাদের অধঃপতিত জাতি সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তার উদয় হইয়াছে ; অনেকগুলি গল্পে কবির স্বজাতির উন্নতি নির্দ্দেশক সহানুভূতি কাতর উপদেশ অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই মহামূল্য উপহার দ্বারা সম্মানিত করার জন্য আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

ভবদীয় গুণানুরক্ত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

৩

ফরিদপুর
শ্রীযুক্ত তারাকুমার রায়ের বাসা
৯ই মাঘ, ১৩০৬।

শ্রদ্ধাভাজনেষু

আপনার নব কাব্যখানি কল্য পাইয়া সাগ্রহে আদ্যন্ত পড়িয়াছি ; এই সুন্দর উপহার প্রাপ্তির সঙ্গে আমার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া কণিকার "উদারচরিতানাম্" কবিতার "সূর্য্য উঠি বলে তারে, ভাল আছ ভাই" প্রভৃতি ছত্র মনে পড়িল।

"কথা" কাব্যের মধ্যে যে নৈতিক মাধুর্য্য আছে, তাহাতে কবির কাব্যকলার শ্রেষ্ঠ পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে। কোশল রাজের শত্রু শিবিরে মহান আত্মসমর্পণ, একটি পূজার প্রদীপের ন্যায় শ্রীমতী দাসীর বৌদ্ধস্তূপ মূলে জীবন নির্ব্বাণ, বিগত সৌন্দর্য্য অনাথিনীর গৃহে উপগুপ্তের অপরূপ প্রতিশ্রুতি পালন, প্রজা দুঃখকাতর রাজার অভিনব প্রণালীর দণ্ড দ্বারা মহিষীকে দুঃখীর দুঃখ বুঝাইবার চেষ্টা, ভক্ত কবীরের পাপী রমণী ও তাহার চক্রান্তজনিত লোক-নিগ্রহকে প্রকৃত মাহাত্ম্য দ্বারা পরাজয় করা প্রভৃতি ভাবের সমস্ত গল্পই নৈতিক জগতের সুন্দর ও অদ্ভুত কথা। নির্ম্মম স্বার্থান্ধ সংসারে এই সন্দর্ভগুলি আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় আশ্চর্য্য, অথচ উহা বাস্তব জগতেরই কথা, কল্পনা নহে ; গল্পগুলির অনুষ্ঠান জীবন্ত মাহাত্ম্য মনুষ্যত্বের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিতেছে। অনেকগুলি গল্পই কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িতে হইয়াছে, এই অশ্রুতে ক্ষণেকের তরে যেন মনের সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গিয়াছে ও কামনাহীন সততার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি। আমার দুঃখ-ক্লিষ্ট জীবনে এরূপ সুখপ্রাপ্তি বড় বিরল। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব উপাখ্যানগুলি প্রাচীন ভাষায় নানারূপ অলৌকিক ঘটনা ও আবর্জ্জনায় জড়িত ও তাহা সাধারণ পাঠকের অনধিগম্য, আপনি সেগুলি নূতন কবিত্ব মন্ত্রপূতঃ করিয়া সরল বাঙ্গলা পদ্যে করুণ রসের উৎস সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি আমাদের বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত হইতে দেখিলে সুখী হইব, কিন্তু ইহার উন্নত ও নির্ম্মল নৈতিকতত্ত্ব বালকগণের অভিভাবকগণের পাঠের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। আপনার অনুপমেয় শব্দলালিত্য, শিল্পীর ন্যায় গল্পের চারুগ্রন্থন, ও উৎকৃষ্ট কবিত্ব এই কাব্যের সর্ব্বত্র সুলভ, তাহা সমালোচকগণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবেন ; কিন্তু সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের উর্দ্ধে এক মহানৈতিক ব্রত উদ্‌যাপন চেষ্টায়ই বোধ হয় কবির জীবনেরও প্রকৃত সফলতা ; সেই নীতি সূত্রগুলি সরস কবিত্ব কৌশলে "কণিকা"য় প্রদর্শিত

হইয়াছে এবং তাহাদের অনুষ্ঠান ও দৃষ্টান্ত এই নূতন কাব্যখানিতে সঙ্কলিত হইল। এই পুস্তকের নাম কবি বিনয়সহকারে "কথা" রাখিয়াছেন, পাঠকগণ ইহা "কথামৃত" বলিয়া বুঝিতেছেন। বসন্তের প্রাক্কালে এই নির্ম্মল অধ্যাত্মরাজ্যের নূতন রাগিণী বাঙ্গলা কাব্যের সচরাচর লব্ধ স্বরের এক গ্রাম ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, এই কাব্যখানি দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের স্থান এক শ্রেণী উর্দ্ধে উন্নীত হইল, সন্দেহ নাই।

আপনার সদয় ও বহুমূল্য উপহারের জন্ম আমার সসম্মান কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

বিনীত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

৪

ফরিদপুর

তারাকুমার রায়ের বাসা

২৯শে মার্চ্চ, ১৯০০

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

'কাহিনী' সাগ্রহে আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি; "কুন্তী-সংবাদ" ও "নরকবাস" দুইটি কবিতা করুণার প্রস্রবণ, উহাদের মর্ম্মান্তিক ছন্দ মনকে একান্ত দ্রব করিয়া ফেলে, এত অশ্রু উপহার আমি জীবনে অল্প কাব্যের উদ্দেশেই দিয়াছি। 'গান্ধারীর আবেদনে' দুর্য্যোধনের চিন্তাশীল দর্পকথায় রাজনীতির বিশ্লেষণ-কৌশল উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; কবি এই কবিতায় রাজদ্রোহ নিবারক বিধি প্রভৃতি বর্ত্তমান প্রসঙ্গের প্রতি আভাসে কটাক্ষ করিয়া মহাভারতীয় বীর চরিত্রের স্বরূপ বজায় রাখিয়াছেন এবং গান্ধারী চরিত্রে মাতৃস্নেহের উর্দ্ধে রমণী হৃদয়ের উদারতা প্রদর্শন করিয়া উহা মহামহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন।

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' আমি ইতিপূর্ব্বেই অনেকবার পড়িয়াছিলাম। উহা অনেকদিন যাবৎ আমার ক্লান্তিকর অবসরের সঙ্গী, ইহাতে রাণী কল্যাণীর চরিত্রের নৈতিক মাধুরীতে মন পবিত্র হইয়া যায়; যাঁহারা ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী মূর্ত্তির অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন সেই পৌরাণিক হিন্দুগণও দয়ার এমন একখানি মানসী মূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারেন নাই। ক্ষুদ্র কবিতাব্যাপী এক অনুপম শুভ্রহস্তের অভ্রালোকে এই দেব প্রতিমা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন; সরলতাময়ী কল্যাণী কুটিলতাকে কুৎসিত প্রতিপন্ন করিয়া, অভিসন্ধিকে ঔদার্য্যগুণে ব্যর্থ করিয়া নিন্দা ও যশঃ উভয়কে নির্ম্মল দেব হাস্যে উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর কল্যাণ ব্রত অব্যাহত রাখিয়াছেন। যে দাতার গৃহ বিচার-আলয়ের ন্যায় সঙ্কীর্ণ, "ফাঁকি দিয়া তারা ঘোচায় অভাব, আমি দিই, সেটা আমার স্বভাব।" এই উদারনীতি-উজ্জ্বলিত কল্যাণীর গৃহের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না, সে যেন কাচ, এ যেন কাঞ্চন। অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পড়িয়া সেই "ক্ষীরো" একরূপই আছে পরিচারিকা অবস্থায় তাহার ইচ্ছা প্রতিরুদ্ধ হইত, রাণী হইয়া তাহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রলয়ংকরী হইয়াছিল। প্রভুত্বের স্বপ্নভঙ্গে সে নিজের পরিচয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল এবং রাণী কল্যাণীর পদধূলি লইয়া নিজের অবনতি স্বীকার করিল, তাঁহার চরিত্র যেরূপ কৌশলে রক্ষিত হইয়াছে, এরূপ নিপুণ প্রণালী আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর খণ্ডকাব্যখানি পাঠ করিয়া কেবল 'কি সুন্দর'! 'কি সুন্দর'! বলিয়া হর্ষের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

আমার একটি দুঃখের কথা আছে, আপনাকে দেখি নাই; শিলাইদহ যাইবার পথ অসুবিধাজনক না হইলে ৫।৭ দিনের জন্য আপনার ওখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, আমার শরীর কাতর কিন্তু গাড়ীতে এখন বোধ হয় কতকটা দূর যাইতে পারিব, আপনার সুবিধানুসারে ও শরীর কতক পরিমাণে ভাল থাকিলে আপনার চিরানুরক্ত ভক্ত তাহার কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে। শিলাইদহ, ষ্টেশন হইতে কতদূর?

অনুগত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

২৮ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২৬শে আগষ্ট ১৯০০

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

বহুদিন হয় মহাশয়ের অপূর্ব্ব গীতিকাব্য ক্ষণিকা উপহার পাইয়া সম্মানিত হইয়াছি কিন্তু নিতান্ত পীড়িত থাকায় এ পর্য্যন্ত ক্ষণিকার দৈব প্রতিভাশালী কবির প্রতি চিত্তের ঐকান্তিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার আনন্দ লাভ করিতে পারি নাই। আমার স্নায়ব দুর্ব্বলতা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে একখানি সামান্য পত্র লিখিলেও অবসন্ন হইয়া পড়ি।

ক্ষণিকা সামাজিক হিসাবে একটুকু উচ্ছৃঙ্খল এবং বোধ হয় তজ্জন্যই উহা বিশেষরূপ উপাদেয় হইয়াছে। আমাদের মায়াবাদী সমাজ, রূপ মিথ্যা, জীবন মিথ্যা, যৌবন মিথ্যা প্রভৃতি সংস্কারাধীন হইয়া বাগ্দেবীর প্রবেশ একরূপ রোধ করিয়া রাখিয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে স্থানে সংসারের সকলই মিথ্যা, সেখানে কবি কোন্ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবেন! আপনার দৈব কবিত্ব পৃথিবীর প্রতি সৌন্দর্য্যটুকুর আস্বাদ অঙ্গীকার করিয়া এই তত্ত্বকণ্টকসংকুল সংসারকে ক্ষণেকের জন্য আবাস যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। কবির সুখের হাস্যে আমাদের 'নশ্বর' 'অসার' সংসার মুখরিত হইয়া নবশ্রী লাভ করিয়াছে এবং মায়াবাদ যেন আপনা হইতে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। কবির উচ্ছৃঙ্খলতায় নব জীবনের আনন্দ সূচিত হইয়াছে এবং উষর দুঃখময় ক্ষেত্রে গঙ্গাধারার ন্যায় একটি পুণ্য প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়াছে। কবি অশ্লেষাতে যাত্রা করিয়া অসময়ে অপথে চলিয়াছেন, শপথ করিয়া বিপথ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, মাতাল হইয়া গান গাহিয়াছেন, শুষ্ক ঋষির চিত্তে ও জ্যামিতির সূত্রে সত্যের আলয় নির্দ্দেশ করিয়া "মিথ্যা যদি মধুর রূপে, আসত কাছে চুপে চুপে, তাহা হ'লে কাহার হত ক্ষতি। স্বপ্ন যদি ধরত সে মুরতি।" বলিয়া কল্পনার সৌন্দর্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, পুষ্প পল্লব শোভিত, আলোক চূর্ণ বিক্ষেপে উজ্জ্বল বনের সৌন্দর্য্য সম্যক রূপে উপলব্ধি করিয়া যৌবনের জন্য বানপ্রস্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কবি কলঙ্ক ও নিন্দাপঙ্কে তিলক টানিয়া হাসিতে হাসিতে প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, গীতিগুলির সর্ব্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা ও সৌন্দর্য্য। এই অসংযতবাক্ অথচ সুন্দর কবিকে সামাজিকগণ কি বলিবেন? ইঁহার রমণীয়তা প্রতিরোধ করিবার উপায় নাই। ইনি হাসিয়া গাহিয়া চিত্ত অধিকার করিবেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রাচীন পুঁথি ছিঁড়িয়া তাঁহাদের টিকি ধরিয়া টানা হেঁচড়া করিবেন, ইঁহাকে কে কি বলিবে? ইনি অতৃপ্তির চক্ষু তৃপ্তির ফুলশর দ্বারা বিঁধাইয়া শিক্ষা দিয়াছেন অতীত ও ভবিষ্যত হইতে বর্ত্তমানই শ্রেষ্ঠ। এই মুহূর্ত্তের শ্রেষ্ঠত্বের বিজ্ঞাপনী লইয়া ক্ষণিকা

আমাদের নিকট আসিয়াছে। কিন্তু ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক, প্রকৃত সৌন্দর্যের প্রতি কটাক্ষক্ষেপী আপাতচপল কবি মধ্যে মধ্যে যে সুগভীর রাগিণী জাগাইয়াছেন, তাহা ক্ষণিকায় ক্ষণ স্বপ্নকে গূঢ় তত্ত্ব সমাবেশে মহান করিয়া তুলিয়াছে। "অন্তরতম" শীর্ষক কবিতার গুরুত্ব অনেক বিপুলকায় কাব্যও বহন করে না।

আমার শরীর অসুস্থ। লিখিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। হৃদয়ের আনন্দ কিছুই ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইলাম না।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র পুনর্মুদ্রণের জন্য কলিকাতা আসিয়াছি। আশা করি মহাশয় কুশলে আছেন,— আমার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন।

বিনীত নিবেদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

৬

২রা আশ্বিন, ১৩০৭
২৮নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

মহাশয়ের কৃপালিপি খানি পাইয়া প্রীত ও সম্মানিত হইয়াছি। এখানে আসা অবধি আমার শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষণিকার ক্ষণজন্মা কবি যে আমার প্রীতিজ্ঞাপক পত্রখানির আদর করিয়াছেন, ইহা আমার বিশেষ আহ্লাদের বিষয়।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ সম্বন্ধে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। যিনি পুস্তক খানির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অনেকদূর অগ্রসর হইয়া শেষে ছাড়িয়া দিলেন, সুতরাং এখন আমার জনৈক বিশ্বাসযোগ্য প্রকাশক খুঁজিতে হইতেছে।

মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ আমার হৃদয়পোষিত চিরদিনের কামনা পরিতৃপ্তি স্বরূপ হইবে। শিলাইদহ যাইবার চেষ্টা করিয়া নানা কারণে বিফলকাম হইয়াছি। ফরিদপুর হইতে আসিবার সময় রেলে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পরিবারবর্গের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলাম, এ অবস্থায় রেলপথে ভ্রমণ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। মহাশয় যখন কলিকাতায় পুনরায় আসিবেন, তখন দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে আমি মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া সাক্ষাৎ করিব। শৈশবকাল হইতে মহাশয় আমার হৃদয়ের প্রীতি ও ভক্তির অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছেন, মহাশয়ের দর্শন লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

মহাশয়ের ভক্তদীন
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

৭

ভক্তিভাজনেষু,

আমার এখন হিসাব-নিকাশের সময় আসিয়াছে। আপনার কাছে আজ উপস্থিত হওয়ার তাহাও অন্যতর কারণ।

পারিবারিক কথা লইয়া যদি কোন সময়ে আমার সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটিয়া থাকে, অবশ্যই এতদিনে সে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। বিশেষ যেদিন আপনি লিখিয়াছেন "যে কেহ মোরে দিয়েছে দুঃখ, চিনিয়েছে পথ

তাঁর তাহারে নমি আমি” সে দিনই আপনার শত্রুরা আপনার নিকট হার মানিয়াছে এবং নিতান্ত ছোট হইয়া গিয়াছে। আমি কোন সময়ে যদি আপনার মনে কষ্ট দিয়া থাকি, তজ্জন্য অনুতপ্ত আছি। তবে আমি যদি কিছু বলিয়া থাকি, তাহা ইচ্ছাকৃত নহে, সাময়িক উত্তেজনার ফলে, এবং আমি কখনও আপনার নিন্দকের দলে মিশি নাই। যাহা হউক আমি আপনাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনরায় নিবেদন করিতেছি যে আমার ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

আমার ‘নীলমাণিক’ নামক একখানা ছোট বই কয়েকদিন হয় আপনার নিকট পাঠান হইয়াছে। এই বইখানি সম্ভবতঃ আপনার ভাল লাগে নাই। কিন্তু আমি আপনার নিকট শিক্ষার্থী এবং চিরদিনই উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করি। আপনি যদি ঐ সম্বন্ধে কিছু লিখেন, তবে তাহার কোন অংশ পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিব না, এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি। আমি মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিব এবং শোধরাইবার চেষ্টা করিব।

আপনি বাংলায় এম, এ পরীক্ষার সম্বন্ধে “মডার্ণ রিভিউ”তে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহা আমরা পড়িয়াছি এবং আশুবাবু অতি আগ্রহের সহিত তাহা পড়িয়াছেন। তিনি বলেন ভাষার মুখে প্রাচীন আবর্জ্জনা ফেলিয়া তিনি তাহার প্রবাহ রোধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এ সম্বন্ধে আপনার মত উপদেষ্টা কেহ নাই। আপনি এম-এ পরীক্ষার বোর্ডে যদি থাকিতে সম্মত হন, তবে আপনার ইচ্ছানুযায়ী অনেক কাজ হইবে। আশুবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তিনি ইউনিভার্সিটির কমিশনের কার্য্যে সারাদিন এত ব্যাপৃত যে বোলপুরে যাইতে পারিতেছেন না। আপনি এখানে আসিলে খবর পাইলে দেখা করিতে চেষ্টা পাইবেন।

সূচনায় হিসাব নিকাশের কথা লিখিয়াছি, ইহা কথার কথা নহে। আমি ৩½ মাস যাবত ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছি, রোজ সন্ধ্যার পরে জ্বর হয় এবং সারারাত্রি প্রবল জ্বর অনুভব করি। আত্মীয় ও ডাক্তাররা ভয় পাইয়াছেন, কারণ এখন আমার বয়স ৫০এর উপরে। কিন্তু সংসারের হিসাব নিকাশ লইয়া চিরকালই গোল করিয়া মরিব, আমার স্রষ্টার এ উদ্দেশ্য নহে, বোধ হয়।

আমার শরীর দিনের বেলায় কখনও কখনও ভাল থাকিলে গাড়ীতে কতকটা যাইতে পারি, কিন্তু সে শক্তিও বোধ হয় বেশী দিন থাকিবে না। আপনি এখানে আসিলে একবার আমাকে দেখিতে আসিবেন, তাহা হইলেই দেখিতে পাইব। আপনার পায়ের ধূলা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে পড়িয়াছে, এই ভরসায় এই অনুরোধ করিলাম।

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে আমি যাহা করিয়াছি, তাহা যদি ছেঁড়া কাগজের দামেই বিকায়, তজ্জন্য আমার কোন দুঃখ নাই, কারণ এখন আমার নিকট প্রতিষ্ঠা ও অপ্রতিষ্ঠা দুইই সমান। আমি কলিকাতায় যে ঠিকানায় আছি তাহা নীচে দিলাম।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন। [অগ্রহায়ণ ১৩২৫]

৪৭।১এ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট
বাগবাজার

প্রণত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

৪৯।১এ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট
শ্রীহরি
বাগবাজার, কলিকাতা
৬।১২।১৮

ভক্তিভাজনেষু

আজ আপনার পত্রখানি পড়িয়া কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিয়াছে। আপনি দুর্দ্দিনে আমার অনেক উপকার করিয়াছেন, আপনার কথায় গগনবাবু আমাকে বাড়ী তৈরী করিবার খরচের অনেকাংশ বহন করিয়াছিলেন, আপনার কথায় আমার ত্রিপুরার বৃত্তি হইয়াছে, আমার আর্থিক কষ্টের সময় আপনি চিঠি পত্র দিয়া নানাভাবে আমার উপকার করিয়াছেন ;···

আমি যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য আপনার নিকট আমার ক্ষমা প্রার্থনা করিবার দিন আসিয়াছে। পৃথিবীতে আসিয়া যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া চিনিলাম, যাঁহার কথায় ও ব্যবহারে আদর্শ পুরুষের অনেক গুণ দেখিলাম, তাঁহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা না দেখাইতে পারিলে আমার অসহণীয় ক্ষুদ্রত্ব আমার নিজকে পীড়ন করিবে। আজ যুক্তকরে আপনাকে নমস্কার জানাইতেছি।

আশুবাবু বাঙ্গলাভাষাকে কিরূপে ইউনিভার্সিটিতে চালাইতে হইবে, তাহার উপদেশ আপনার নিকট চান। তিনি যাঁহাদিগকে কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে করেন, তাহাদিগের উপর সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করেন ; আপনার মতন এই বিষয়ে কে তাঁহাকে উপদেশ দিতে পারিবে ? তিনি সশ্রদ্ধ ভাবে আপনার প্রত্যেক পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"নীলমাণিক" সাতদিনে লিখিত হইয়াছে, উহা আপনার পড়িবার যোগ্য হয় নাই ; পুরাতন জিনিষের উপর আমার একটা ঝোঁক আছে, সে ঝোঁকটা বোধহয় রোগে পরিণত হইয়াছে। আপনার বিচার প্রতিকূল হইলেও অবনত মস্তকে মানিয়া লইব।

আমার দুই দিন জ্বর হয় নাই, এজন্য এই চিঠি নিজ হাতে লিখিতে পারিলাম। আপনার ক্ষমার মোহরাঙ্কিত পত্রখানি পাইয়া কত সুখী হইয়াছি, তাহা আর কি লিখিব উহা দুর্ল্লভবস্তুর মত রাখিয়া দিলাম।

চিরাশ্রিত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীহরি

৩০।৩।৩৬

ভক্তিভাজনেষু,

নন্দলালবাবুর সঙ্গে আপনার জন্য এক সেট "বৃহৎ বঙ্গ" (দুইখণ্ড) পাঠাইয়াছিলাম, তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসে তাহা দাখিল করার দরকার হইয়াছে।

এই পুস্তক দশ বার বৎসর খাটিয়া লিখিয়াছি, সুতরাং আপনার মত ব্যক্তির নিকট তাহার একটা সমালোচনা চাহিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম, যদি আপনার স্বাস্থ্য ও অনবকাশ বশত আপনি তাহা না লিখিতে পারেন, তবে ক্ষুদ্র একটি মন্তব্যের সহজ সৌজন্য হইতে কেন বঞ্চিত হইব, তাহা বুঝিতে পারি না, এই

পুস্তকের অনেক স্থলে আপনার কথা বহু সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছি। যিনি সমস্ত জগৎ কর্তৃক অভিনন্দিত, আমার মত ব্যক্তির সেইরূপ লেখা তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন। আমি যাহা চাহিয়াছি তাহা দাবী নহে, অনুগ্রহ, সুতরাং অনুগ্রহ-প্রার্থীর কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবার অধিকার নাই।

বিনীত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

১০

শ্রীহরি শরণং

Phone South 1123,
"Rupeswar House"
Behala, P. O.
Calcutta
১৭।১০।৩৯

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

পূজার সংখ্যা বাতায়নে আপনি অতি অল্প কয়েকটি ছত্রে মৈমনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেরূপ সমালোচনা আপনি ভিন্ন অন্য কেহ করিতে পারিতেন বলিয়া আমার মনে হয় না, আপনার অন্তর্দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ ও সত্যাশ্রিত, যে তাহাতে যে কোন বিষয়ের জটিলতা ভেদ করিয়া তাহার স্বরূপ উজ্জ্বল করিয়া দেখায়। আপনি বৃদ্ধ, কিন্তু মনের জগতে আপনার চিরযৌবন; তাহা বয়স এবং শারীরিক দৌর্বল্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। আপনার মন্তব্য ক্ষুদ্র একটি মণির ন্যায় বহুমূল্য ও উজ্জ্বল। আপনি আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করুন।

বহুদিন পরে আপনাকে চিঠি লিখিলাম, আমি আপনার অপেক্ষা ৫।৬ বৎসরের ছোট, তথাপি আপনার মত স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারি নাই। অনেক সময় বিছানায় মৃতের মত পড়িয়া থাকি এবং বিগত জীবনের সেই অধ্যায়টি বিশেষ করিয়া স্মরণ করি যখন আপনার দুর্লভ সঙ্গ ও সৌহার্দ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। আপনার স্মৃতিতে যদি সেই অধ্যায়ে কোন দাগ কাটিয়া থাকে, তবে হয়ত বুঝিবেন, আপনার প্রীতি ও সহৃদয়তা বঞ্চিত হইয়া আমি কতটা রিক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

চিরানুরক্ত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীহরি

7, Biswakosh Lane,
Baghbazar,
Calcutta

ভক্তিভাজনেষু,

অরুণ বলিতেছে, আপনি পরীক্ষকের কাজ গ্রহণ করিবেন না, এইরূপ চিঠি লিখিয়া পাঠাইবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রশ্ন একজনে করেন, আর একজনে দেখিয়া দেন, ইহাই সাধারণ রীতি। সে অনুসারে আপনার কাজ আপনি করিয়াছেন, প্রত্যেকটি প্রশ্ন দেখিয়া দিয়াছেন। এবং আপনার অনুমোদন লইয়া আমি আশুবাবুকে বলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং ব্যাপারটা একবারে সমাধা হইয়া

গিয়াছে। এখন যদি অন্যরূপ করেন, তবে কর্তৃপক্ষ মনে করিবেন, আমি আপনার কোনরূপ বিরক্তির কারণ দিয়াছি— উহা আমার পক্ষে বড়ই খারাপ হইবে। আশুবাবু আমাকে গালমন্দ দিবেন, যেহেতু সব হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমি তাঁহাকে জানাইয়াছি। যে প্রশ্নটি বাদ দিতে বলিয়াছিলেন, তাহা বাদ দিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ যদি এখন আপনি অস্বীকার করেন, তবে আর একজন যোগ্য পরীক্ষককে নিযুক্ত করিতে হয়, কারণ প্রত্যেক Paperএ তুইজন করিয়া পরীক্ষক থাকেন। আপনি না করিলে আর একজন হইবেন। আমার আবার তাঁহার কাছে যাইয়া প্রশ্ন দেখাইয়া অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। আমি অতিশয় অসুস্থ, আমার কাজ তাহা হইলে আরও বাড়িয়া যাইবে ও বড় ঝঞ্ঝাটে পড়িব। মহাশয় দয়া করিয়া যাহা অনুমোদন করিয়া দিয়াছেন, তাহা বহাল রাখিবেন। বরং কাগজ দেখা সম্বন্ধে অসুবিধা বোধ করিলে সেই কাজ অস্বীকার করিয়া চিঠি দিতে পারেন। যাহা শেষ করিয়া দিয়াছেন এবং আমি তদনুসারে জানাইয়াছি, তাহা বহাল রাখিতে আজ্ঞা করিবেন। আমি বড়ই অসুস্থ, তাহা না হইলে প্রণতিপূর্বক এই নিবেদন জানাইতে নিজেই যাইতাম আমার অসুস্থ অবস্থায় আমার তুঃখের মাত্রা বাড়াইবেন না। আমার প্রণাম জানিবেন।

প্রণত

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

পত্রসংখ্যা

১ "বিদ্যাসাগর" কথা : 'বিদ্যাসাগর চরিত', সাধনা ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

২ কণিকা : প্রথম প্রকাশ ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬ [১৮৯৯]

৩ কথা : প্রথম প্রকাশ ১ মাঘ ১৩০৬ [১৯০০]

৪ কাহিনী : প্রথম প্রকাশ ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬ [১৯০০]
'কুন্তী-সংবাদ' : কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

৫ ক্ষণিকা : প্রথম প্রকাশ ২৬ জুলাই [১৯০০]

৬ "মহাশয়ের কৃপালিপিখানি পাইয়া প্রীত ও সম্মানিত হইয়াছি।" দ্র° রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র ২, পৃ ৯৫

৭ নীলমাণিক : প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩২৫। দ্র° রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র ৩৩, পৃ ১১২

৮ গগনবাবু : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯ নন্দলালবাবু : নন্দলাল বসু। দ্র° রবীন্দ্রনাথ -লিখিত পত্র ৩৪, পৃ ১১৩

দীনেশচন্দ্র ও ইতিহাস-চর্চার প্রথম যুগ

ভবতোষ দত্ত

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামে সুপরিচিত বইখানা প্রকাশিত হলে সকলেই খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯০১) সমালোচনা-উপলক্ষে লিখেছিলেন—

"এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড়ো একটা ব্যাপার আছে তাহা আমরা জানিতাম না; তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয়স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম।"

বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম ইতিহাসখানা রচিত হওয়ার আগে এই বিষয় নিয়ে যে সব কাজ হয়েছে অথবা বই লেখা হয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করলে দীনেশচন্দ্রের অসীম কৃতিত্ব যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াস কি ভাবে দীনেশচন্দ্রের উদ্যমে সংহত রূপ লাভ করেছিল। ইংরেজ শাসনকালীন বাংলা সাহিত্যের তথ্যগত ইতিহাস রচনা কঠিন ছিল না। যাঁরা এই ইতিহাসের বিষয় তাঁরা অনেকেই জীবিত ছিলেন, ছাপাখানার কল্যাণে তাঁদের বই প্রচলিত ছিল। কিন্তু কঠিন ছিল মধ্য ও প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা, যার প্রায় সব উপকরণই ছিল পুথিতে বদ্ধ। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনে এবং শিক্ষাবিস্তারের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় মধ্যযুগের বাংলা পুথি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কয়েকজন কবির নাম ছাড়া আর কারো নামই প্রায় এ যুগের শিক্ষিত বাঙালির জানা রইল না। ১৯০১এ অক্ষয়চন্দ্র সরকার ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের গোড়ার দিকের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন—।

"ত্রিশ সালে অর্থাৎ এখন হইতে আশী বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা লেখার চর্চা ছিল, গুরু মহাশয়ের পাঠশালে ব্যবসাদারের খাতায় আর আত্মীয় স্বজনকে 'বন্ধুবান্ধবকেও নয়' পত্র লেখায়; পড়ার চর্চা যথেষ্ট ছিল। কেবল পাঠশালে বলিয়া নয়, সকলেই রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিত। বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে বসিয়া, মুদি মুদিখানার পাটে বসিয়া, পুরোহিত ঠাকুর শিবের মন্দিরের ধারিতে বসিয়া, মোসাহেব মুকুয্যে মহাশয় বড় মানুষের বৈঠকখানায় বসিয়া অবাধে দশ বারোজন শ্রোতৃমণ্ডলির মধ্যে, কৃত্তিবাস, কাশীদাস পাঠ করিতেন। গোস্বামী ঠাকুর বিষ্ণুমন্দিরের দাওয়ায় বাবাজী ঠাকুর আকড়ায় আঙ্গিনার বৃক্ষতলে, বৈষ্ণব গৃহস্বামী পূজার দরদালানে, সেইরূপ শ্রোতৃমণ্ডলি মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেন। এতদ্ভিন্ন কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রামেশ্বরের শিবায়ন, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থ এইরূপই নিয়ত পঠিত হইত।"[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এগুলিই ছিল প্রচলিত সাহিত্য। পাদ্রী ওয়ার্ড লিখেছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ অনেকেই দেশীয় ভাষায় রচিত রামায়ণ মহাভারত বিদ্যাসুন্দর এবং চণ্ডীর পুথি

---

১ 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০১) গ্রন্থে পিতাপুত্র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রাখে। কোনো কোনো বাড়িতে মনসাগীত ধর্মগীত শিবগীত ষষ্ঠীগীত পঞ্চানন গীত এসবও থাকে। বৈরাগী এবং অন্যান্য সাধারণ জনসম্প্রদায়ের মধ্যে ছোটো ছোটো কাহিনী চলিত আছে যেগুলি ইংরেজি ভাষার উপকথা বা গাথার চেয়ে বিশেষ উন্নত নয়। এই সব অকিঞ্চিৎকর বিষয়গুলির উপজীব্য নানা পৌরাণিক কাহিনী সাধু সন্ন্যাসীর অলৌকিক কীর্তি অথবা দেবতার মাহাত্ম্য -বর্ণনা। কখনও কখনও নীতিমূলক গল্পও পাওয়া যায়, তবে অধিকাংশই কৃষ্ণলীলা বিষয়ের গল্প।[২]

তারপর মুদ্রিত গ্রন্থের প্রচারের ফলে এবং ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে রচিত বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক প্রবর্তনে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্য শিক্ষিত সমাজের অন্তরালে চলে যেতে থাকে। দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচনার পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যতটুকু আলোচিত হয়েছিল, তাতে কোথাও এইসব সুপরিচিত গ্রন্থ ছাড়া অন্যগুলির উল্লেখ দেখি নি। এই অপরিচয়ের অন্তরাল থেকে দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা দেশের মধ্যে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে দুরপনেয় ব্যবধানের সৃষ্টি করেছিল। দীনেশচন্দ্রের প্রয়াস ছিল দুয়ের মধ্যে নতুন করে যোগ স্থাপন করা। এ চিন্তা উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ মনীষীরা করে গিয়েছেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকার 'পত্রসূচনা'য়, 'লোকশিক্ষা' প্রভৃতি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্যার অবতারণা করেছিলেন দীনেশচন্দ্র বাংলার নিজস্ব অন্তরলোকের সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয় শিক্ষিত সমাজের কাছে তুলে ধরে সেই সমস্যার একটা মীমাংসার পথ প্রদর্শন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে' (১৩১১) বলেছিলেন—

"পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে প্রাচীন নবীন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ নীচ, ছাত্র ও সংসারীর মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছিল এখন তাহার উল্টা কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এখন আবার আমরা নিজেদের ঐক্যসূত্র সন্ধান করিয়া পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছি। মধ্যকালের এই বিচ্ছিন্নতাই পরিণামের মিলনকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"এই মিলনের আকর্ষণেই আজ বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্য আমাদের ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও আপন করিয়াছে।"

মনে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের এই মহৎ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করছেন দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের বিস্তৃত সমালোচনা লেখার পরে। এই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেন—

"আমরা ইতিহাস পড়ি— কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না।"

---

২ *History, Literature, Manners etc. of the Hindoos* **(1820) Part III, p. 502** দ্রষ্টব্য

এই কথাগুলি পড়লে মনে হয়, এ যেন দীনেশচন্দ্রের উদ্যমেরই তাৎপর্য-বিশ্লেষণ। বস্তুত দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে তথ্য সংকলন মাত্র নয়, এর পটভূমিতে ছিল দেশ এবং জাতির প্রতি গভীর মমতাবোধ, একটি গঠনাত্মক দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ যখন স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন, দেশ এবং জাতি সম্বন্ধে এমনি একটি মমতা এবং আদর্শই ছিল তার মূলে। তুলনা হিসাবে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' যেমন শুধুই মহাভারত নিয়ে পণ্ডিতী গবেষণা নয়, এর প্রেরণায় ছিল আর-একটি গঠনাত্মক আদর্শ, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তেমনি শুধু গবেষণা নয়, তার চেয়েও বেশি।

তথাপি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ইতিহাস বলতে মূলত যে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকে বোঝায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয়ে এই বইখানাই ছিল তার সুপরিণত সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার চেষ্টা আগেও হয়েছে। কিন্তু এতখানি পূর্ণতা কোনোটাতেই ছিল না। 'ইতিহাস' কথাটির মধ্যেই নিহিত ধারাবাহিকতার অর্থ। অতীতের ঘটনাগুলিকে ধারাবাহিক ক্রমে দেখাতে না পারলে তারা ঠিক ইতিহাস-পদবাচ্য হয় না। যুক্তি এবং কার্যকারণের সূত্রটি স্পষ্ট করে দেখাতে হয়; পারিপার্শ্বিক দেশকালের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিকায় স্থাপন করে তবেই ইতিহাসের পূর্ণ রূপ গঠন করতে হয়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচিত হওয়ার পূর্বে যে কয়খানি বাংলা সাহিত্য-বিষয়ে বই লেখা হয়েছিল, তার কোনোটাতেই এই আদর্শের সিদ্ধি ছিল না।

বাংলা সাহিত্যের অতীতকে রক্ষা করবার প্রথম চেষ্টা যিনি করেছিলেন তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫র মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যের একটা যুগের ইতিহাসকে রক্ষা করা। এই যুগ হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসর। প্রধানত শাক্তসঙ্গীত-রচয়িতা এবং কবিওয়ালাদের উল্লেখ করলেও অন্যান্য সাহিত্যধারার মধ্যে "কবিকঙ্কণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বিদ্যাধর (?), কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কেতকী দাস, রামেশ্বর"— এঁদের জীবনী ও কীর্তি প্রকাশ করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল। কার্যত তিনি পেরেছিলেন ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ নিধুবাবু রামবসু হরুঠাকুর নিত্যানন্দ বৈরাগী রাসু-নৃসিংহ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কয়েকজনের আলোচনা করতে। সুতরাং আলোচনার ব্যাপকতা বিচার করলেও ঈশ্বর গুপ্তের প্রয়াস পূর্ণাঙ্গ নয়। ইতিহাস হিসাবে অপূর্ণতার আরো লক্ষণ ছিল। এ যুগের কবিদের আলোচনায় ব্যাপৃত হতে গিয়ে, যুগের অনেক ঘটনার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হলেও, পারিপার্শ্বিক জীবন ও সমাজের সঙ্গে যোগকে তিনি স্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। সে রকম চেষ্টার আভাস যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় নি, তা নয়। যেমন ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গে তিনি বলছেন—

"এই মহাশয় অন্নদামঙ্গল রচনার পূর্বে কিম্বা পরে যে সকল ভাষা কবিতা রচনা করিয়াছেন, অন্নদামঙ্গলের সহিত তাহার তুলনা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। ইহাতে বিশিষ্টরূপেই প্রমাণ হইতেছে যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভার আশ্রয় লওয়াতেই নানাকারণে এই অন্নদামঙ্গল অনেক প্রকারে দোষশূন্য ও প্রকৃষ্ট হইয়াছে··"

এখানে ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের কবিমনের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের যোগ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রয়াস ইতিহাসকারেরই প্রয়াস। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনায় এই কার্যকারণ নির্ণয়ের চেষ্টা তেমন সুলভ নয়।

কিন্তু এতে ঈশ্বর গুপ্তের উদ্যমের মৌলিক অগ্রগামিত্ব, তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও গবেষণার মূল্য কিছুমাত্র অস্বীকৃত হচ্ছে না। তিনি বলেছিলেন—

"ইহার পূর্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোন কবির জীবনচরিত প্রকাশ করেন নাই— এবং এতৎ প্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত হয়েন নাই— আমরা প্রথমেই ইহার পথপ্রদর্শক হইলাম।"

ঈশ্বর গুপ্তের এই কথাগুলি আত্মম্ভরিতা নয়। যে অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা দেশের ইতিহাসের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের এই উক্তিও সেই অর্থেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—

"যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়ন জন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী না হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোণা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না?"[৩]

এই মনোভাবকে হুবহু ঈশ্বর গুপ্তের মনোভাব বলেই বর্ণনা করা যেতে পারে। সাহিত্য-ইতিহাস রচনার সার্থক ভূমিকা তিনি করে গিয়েছেন। তাঁর এই জীবনী-রচনাও ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই সাহিত্য-জননীপদে অঞ্জলি-স্বরূপ। বিশুদ্ধ ইতিহাসের রূপ যদি এই রচনাগুলি নাও পেয়ে থাকে, তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত যে এই প্রচেষ্টায় অনেক দূর এগিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। রমেশচন্দ্র দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই প্রচেষ্টার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে বলেছেন—

Iswar Chandra Gupta, the first great poet of this century, was the first writer who attempted to publish biographical accounts of the previous writers; but his attempt necessarily met with imperfect success.[৪]

কেউ যদি ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিতটির সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের ভারতচন্দ্র ও রামনিধি গুপ্তের জীবনচরিত দুটির তুলনা করে দেখেন, তবে বুঝতে পারবেন তাঁর অপূর্ণতা সত্ত্বেও আলোচ্য ব্যক্তিদের দেশে এবং কালে স্থাপিত করতে তিনি কতখানি সফল হয়েছিলেন। নানা ঘটনার উল্লেখ, সময়-নির্দেশক নানা ঐতিহাসিক বিবরণের তুলনাত্মক আলোচনায় ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীগুলি পূর্ণ। পুরনো দলিলপত্রও তিনি যথাসম্ভব পরীক্ষা করেছিলেন। বিশেষত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তথ্যসংগ্রহে ঈশ্বর গুপ্ত যে অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম করেছিলেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-রচনাকালে দীনেশচন্দ্রের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সঙ্গে তা তুলনীয়।

পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রাথমিক বাধা হচ্ছে উপকরণের অভাব। ঈশ্বর গুপ্ত যথাসাধ্য উপকরণ সংগ্রহ করে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার পর দীর্ঘকাল উপকরণ সংগ্রহের সে-রকম চেষ্টা হয় নি। আগেই বলেছি, ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠছিল সেগুলির ঠিক ইতিহাস রচনার সময় তখনও আসে নি, তবে সমালোচনা বা মূল্যবিচারের চেষ্টা যে চলে নি তা নয়। ঈশ্বর গুপ্তের পর বাংলা

---

৩ বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ. বিজ্ঞাপন

৪ *The Literature of Bengal* (1895)। ভূমিকা

সাহিত্যের আলোচনা-গ্রন্থ হিসাবে দুটি বই উল্লেখযোগ্য, যে-দুটি বই ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনাপদ্ধতিকেই মূলত অনুসরণ করেছিল। কবি হরিশচন্দ্র মিত্র ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিকলাপ' (১ম খণ্ড, আশ্বিন ১২৭৩) নামে একটি বই প্রকাশ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত যেমন ভিন্ন ভিন্ন কবিদের নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, সেই একই প্রণালীতে এতে 'আদিকবি কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, নন্দকুমার চক্রবর্তী, কাশীরাম দাস এবং কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উত্তম প্রণালীতে লিপিবদ্ধ' করা হয়েছিল। বইটা ছোটো ; মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৯।[৫]

এই আলোচনারীতির অনুসরণে পরবর্তী বই 'কবিচরিত' রচিত হয়। বইখানা লেখেন হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই বইয়ে আটটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় উপক্রমণিকা। পরে সাতটি অধ্যায়ে আলোচিত কবিরা হচ্ছেন কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায়, মদনমোহন তর্কালংকার এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। উল্লেখযোগ্য, কবিচরিতে প্রকাশিত জীবনীই ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম জীবনচরিত।

লক্ষ্য করবার বিষয় কবিচরিতের উপক্রমণিকাটি। এখানেই আমরা প্রথম ধারাবাহিক বাংলা সাহিত্যের একটি বিবরণ পাচ্ছি। এই বিবরণের আরম্ভ বাংলা ভাষার উৎপত্তি বর্ণনা করে। এখানে বৈষ্ণব কবিদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা পাই। লেখকের মতে 'জীব গোস্বামীর করচাই সর্ব প্রাচীন গ্রন্থ। উহার বয়ঃক্রম প্রায় ৩৪০ বৎসর।' বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ—এই কয়জন লেখকদের পর্যালোচনা করে লেখক বাংলা সাহিত্যের এক সমৃদ্ধ যুগের পরিচয় দিয়েছেন। দীনেশচন্দ্র সেন এবং তৎপরবর্তী ঐতিহাসিকেরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব যুগের যে একটি বৃহৎ এবং মহৎ অধ্যায় রচনা করবেন তার সূচনা হয়েছিল এখানেই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব ছাড়া অন্যান্য কবিদের মধ্যে আলোচিত কৃত্তিবাস মুকুন্দরাম রামপ্রসাদ প্রাণরাম চক্রবর্তী ভারতচন্দ্র রাধামোহন সেন রামমোহন (ব্রহ্মসঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে) রামনিধি গুপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য আলোচিত-কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি, দুর্গামঙ্গল-রচয়িতা বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনাথ গোস্বামী দাশরথি রায় গোবিন্দ অধিকারী মধু কান এবং কবিওয়ালা নামে পরিচিত কবিরা।

ইংরেজি যুগের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে অনঙ্গমোহন-লেখক অক্ষয়কুমার দত্তকে। এ যুগের অন্যান্য লেখকদের আলোচনা 'কবিচরিতে'র পরবর্তী খণ্ডে থাকবে বলে হরিমোহন জানিয়েছেন। 'কবিচরিতে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০১) রচনা করে হরিমোহন 'কবিচরিতে'র আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন। 'কবিচরিত' রচনা করতে গিয়ে লেখক যেসব বই ও পত্রিকার সাহায্য নিয়েছিলেন, তাও উল্লেখযোগ্য ; যেমন হরিশচন্দ্র মিত্র প্রণীত কবিকলাপ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত কবিকঙ্কণের সমালোচনা, নন্দলাল দত্তের কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ, নিউ প্রেসে মুদ্রিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থসংকলন এবং প্রভাকর ; বিবিধার্থসংগ্রহ, নবপ্রবন্ধসার, হিতসাধক প্রভৃতি সাময়িকপত্র ও গ্রন্থ। বলা বাহুল্য, এগুলি সবই দ্বিতীয় পর্যায়ের (secondary) প্রমাণপত্র। ঈশ্বর গুপ্তের পরে মৌলিক প্রমাণপত্র (primary source) ব্যবহার করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্র পুথি মিলিয়ে দলিল পরীক্ষা করে পাঠনির্ণয় করে ইতিহাস রচনা করেন। ঈশ্বর গুপ্ত তার আরম্ভ করেছিলেন।

---

৫ বইটি দুষ্প্রাপ্য। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা থেকে এই বিবরণ গৃহীত।

মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (১৮৭১) বস্তুত লেখা হয়েছিল কবিচরিতের এক বৎসর পরেই। এই বইটির বিশেষত্ব, ইতিহাস নামে বাংলা সাহিত্য-বিষয়ে এটাই প্রথম সম্পূর্ণ গ্রন্থ, যদিও বইটিকে মূলতই বলা যেতে পারে কবিচরিতের উপক্রমণিকা-প্রবন্ধেরই সম্প্রসারণ। এখানেও বাংলা ভাষার ইতিহাস উপক্রমণিকার মতোই বৈদিক যুগ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। উপক্রমণিকার মতোই বৌদ্ধ গাথা পালি প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষান্তরগুলি আলোচিত। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ সম্বন্ধে হরিমোহনের মতের অনুসরণে মহেন্দ্রনাথও বলেছেন জীব গোস্বামীর করচা ৩৪০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল। হরিমোহন মধ্যযুগের যেসব কবিদের আলোচনা করেছিলেন, 'বঙ্গভাষার ইতিহাসে'ও ঠিক তাঁরাই আলোচিত।

মহেন্দ্রনাথের নিজস্ব কীর্তি হচ্ছে আধুনিক গদ্যলেখকদের অবতারণা। হরিমোহন দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করবেন বলে কবিচরিতে তাদের আলোচনা করেন নি। সে দিক থেকে 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' ব্যাপকতর। মহেন্দ্রনাথের বইতে তিনটি অধ্যায়ই সেকালের পক্ষে অভিনব। বঙ্গভাষার বিদ্যালয় এবং বাঙ্গলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে দুটি অধ্যায় এবং পরিশিষ্টে আধুনিক গদ্যলেখকদের বিবরণ। কবিচরিতে বৈষ্ণব যুগের যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল মহেন্দ্রনাথ তাকে স্বীকার করে বলেছিলেন চৈতন্যাবতরণের পরেই বাংলা ভাষার উন্নতির সূচনা। মনে হয় হরিমোহনের কবিচরিতের (১৮৬৯) থেকেই বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে রসবিচারের দৃষ্টি পরিবর্তিত হতে থাকে। বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা এবং চৈতন্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের পরিবর্তনের প্রতি হরিমোহন আমাদের অবহিত করেন। এর পরে রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু বা বঙ্কিমচন্দ্র কেউ এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন নি। দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যই ছিল বৈষ্ণব যুগের বিস্তৃত ইতিহাস রচনায়। দীনেশচন্দ্র ইংরেজিতে এই যুগ নিয়ে আলাদা বইও রচনা করেছিলেন। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ঈশ্বর গুপ্তের পরিকল্পনাতে পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিদের উল্লেখের স্বল্পতা পরবর্তী যুগের তুলনায় চোখে না পড়ে পারে না। 'কবিচরিতে'র সমালোচনা-উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে যে-প্রবন্ধ[৬] লেখেন তাতে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছিলেন, চৈতন্য-সাহিত্য এবং পুরাণ-সাহিত্য অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য। তিনি দুয়ের তুলনায় স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন—

In poetic power they are decidedly inferior to the best of the Vaisnava poets.

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে father of modern Bengali বললেও তাঁর অভিমত ছিল

In the higher attributes of a poet Bharat Chandra is far inferior to many who have preceded and followed him.

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঠিক বলা চলে না। প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একটি সাধারণ সমালোচনা করেছিলেন। তাতে ইংরেজি শিক্ষিত নব্যদল বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন তার আভাস পাওয়া যায়। আধুনিক রসরুচি বাংলা সাহিত্যের কোন্ দিককে সার্থক বলে মনে করে এবং ইতিহাস-রচনায় কোন্ দিকে বিশেষ জোর দেওয়া উচিত, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আধুনিক কালে রচিত বাংলা সাহিত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র দুই

---

৬ Bengali Literature, *Calcutta Review*, 1871

বঙ্গভাষার ইতিহাস।

প্রথমভাগ।

———

প্রণেতা

শ্রী মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

———

গুপ্তযন্ত্র

কলিকাতা—২৪ মির্জ্জাফর্শ লেন।

———

সম্বৎ ১৯২৮, জ্যৈষ্ঠ।

'বঙ্গভাষার ইতিহাস' : ১৯২৮ সম্বৎ (১৮৭১ খ্রীঃ)। আখ্যাপত্র

ভাগে ভাগ করেছিলেন, সংস্কৃতানুগত এবং ইংরেজি-অনুগত। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত ভরসা ছিল দ্বিতীয় দলের উপর।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা না করলেও তাঁর কয়েকটি লেখায় ইতিহাস-রচনার দু-একটি সূত্রের নির্দেশ ছিল। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'[৭] প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন—

"সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুজ্ঞেয়, সন্দেহ নাই ; এ পর্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই প্রাকৃতিক নিয়ম এবং কোমতীয় চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই কথাগুলি লিখেছেন। তাঁর এই নীতিটাই আমরা গ্রাহ্য করব কিনা সেটা আলাদা কথা, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় যে একটি নীতিসূত্রের প্রয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাটাই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার যুগে একটা বড়ো ইঙ্গিত। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই ইঙ্গিত নিয়ে দীর্ঘকাল কোনো ইতিহাস লেখা হয় নি। সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গেলে যুগ জীবন ও সমাজের বিশিষ্ট প্রবণতাগুলির সন্ধান করতে হয়, দীনেশচন্দ্রের পূর্বে সেই কথা কারোই মনে হয় নি।

এইজন্য 'বঙ্গভাষার ইতিহাসে'র পরের বৎসরে প্রকাশিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২) শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবই, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। তা হলেও এই বইখানিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার আদর্শ যতদূর অগ্রসর হয়েছে, দীনেশচন্দ্রের পূর্বে এমন আর কোনো বইয়ের দ্বারাই হয় নি। রামগতি এখানে একটি প্রবন্ধ মাত্র রচনা করেন নি, পূর্বযুগ এবং আধুনিক যুগ মিলিয়ে তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন। রামগতি বাংলা সাহিত্যের যে আকৃতি নির্ণয় করেছেন তাঁর আগে এমন আর কেউ করেন নি। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের যুগভাগ করলেন, প্রথম থেকে চৈতন্যদেবের পূর্ব পর্যন্ত আদ্যকাল, চৈতন্যদেব থেকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যকাল, ভারতচন্দ্র থেকে ইদানীন্তন কাল। আদ্যকালের আলোচিত কবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস। মধ্যকালের আলোচিত কবি বৃন্দাবনদাস জীবগোস্বামী কৃষ্ণদাস-কবিরাজ মুকুন্দরাম কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ কাশীরামদাস রামেশ্বর রামপ্রসাদ। ইদানীন্তন কালে ভারতচন্দ্র কবিওয়ালা থেকে পরবর্তী সমস্ত সাহিত্যই আলোচিত। বলা বাহুল্য এই অংশটিই সর্ববৃহৎ।

দেখা যাচ্ছে, রামগতি ন্যায়রত্নের সময়ে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন তেমন কিছু আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের কালনির্ণয় করবার গবেষণা তিনি করেছিলেন, এটা রামগতির ইতিহাস-বোধের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। তাঁর সাধ্যমতো তিনি ইতিহাসের পূর্বাপরতা বিচার করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"চৈতন্যদেব কর্তৃক বিদ্যাপতি-বিরচিত গীত শ্রবণ এবং গোবিন্দদাস কর্তৃক চৈতন্যলীলা বর্ণন—এই

৭ বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০

উভয়ের প্রদর্শন দ্বারা আমরা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদন করিয়াছি যে বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের পূর্বকালীন ও গোবিন্দদাস উত্তরকালীন ছিলেন।"

রামগতির এই আলোচনাপদ্ধতিই প্রমাণ করে ইতিহাস-রচনার কাজে তিনি কতখানি এগিয়ে ছিলেন। এইভাবেই তিনি বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তী এবং লোকপ্রবচনের ভিতর থেকে সত্য উদ্ধার করে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবদ্ধ রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি যে তিনটি যুগ ভাগ করেছেন, আলোচনার আরম্ভে তিনি সেই যুগের ভাষা ও সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণগুলিও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তাতে বাংলা সাহিত্যের চিত্রটি আরো উজ্জ্বল হয়েছে। এই ইতিহাস রচনা করবার জন্য তিনি যে শ্রম স্বীকার করেছিলেন, তাতে নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকের পুত্র গিরীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"এই পুস্তকখানির প্রণয়ন সময়ে পিতৃদেবকে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অর্থব্যয় ও যেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অন্যের পক্ষে সহজ নহে। এই উপলক্ষে তিনি ছোট বড় অনেক গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করিয়াছেন। কত পাণ্ডুলিপি, কত গ্রাম ও প্রদেশের কত স্থান যে সন্ধান করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।"

কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্নের বইটির বিশেষ চিত্তাকর্ষক অংশ হচ্ছে আধুনিক যুগের আলোচনা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন হলেও উপন্যাসধারা কাব্যধারা নাটকধারা প্রভৃতির আলাদা শ্রেণী না করে গ্রন্থকার বা গ্রন্থের শিরোনামে তিনি এ যুগের সাহিত্যের পর্যালোচনা করেছেন। এতে ইতিহাসের ধারাবাহিক ক্রম ঠিক রক্ষিত হয় নি, সম্ভবত 'ইদানীন্তন' বলেই তার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু সেকালের সাহিত্য সম্বন্ধে সেকালেরই একজন আলোচকের অভিমতটাই আজ বিশেষ মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত রামগতি নিজেই একজন সাহিত্যিক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যাদের সংস্কৃতপন্থী দল বলেছেন রামগতি ছিলেন তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত। রামগতির এই আলোচনা ইতিহাস অপেক্ষা সমালোচনা হিসাবেই কৌতূহলজনক।

সম্ভবত তখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সাহিত্যিক নিদর্শনের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা অপেক্ষা সমালোচনা-মূলক বিবরণ রচনা করাই সম্ভব ছিল। তাই রামগতির পরেই রাজনারায়ণ বসু 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'ই (১৮৭৮) লিখেছেন। রাজনারায়ণ বসু প্রধানত দুটি বইয়ের উপরেই নির্ভর করেছিলেন, রামগতির বই এবং লঙের Descriptive Catalogue, রাজনারায়ণের এই ছোটো বইটির মূল্যও আজ ইতিহাস হিসাবে নয়, সমসাময়িকের চোখে সেকালের সাহিত্যের মূল্যনির্ণয়ের প্রচেষ্টা হিসাবে। সেদিক থেকে একে বঙ্কিমচন্দ্রের Bengali Literature প্রবন্ধটির সমগোত্র করা যায়। এসব রচনার প্রধান লক্ষ্য প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা নয়, বাংলা সাহিত্যের মূল্যবিচার। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের কালানুক্রমিক ভাগ করেন নি; তিনি সাহিত্যের প্রকৃতি বিচার করে শ্রেণীভাগ করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সুবিখ্যাত বই *Literature of Bengal* প্রকাশ করলেন; তাতেও তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করেন নি। স্বভাব-ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র ইতিহাসের সংস্কার দ্বারা চালিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের যে বিবরণ প্রস্তুত করেছিলেন, তা প্রখর ইতিহাস-চেতনায় সমুজ্জ্বল, তথাপি লক্ষ্য করবার বিষয় রমেশচন্দ্র নিজে তাঁর এই বিবরণকে ইতিহাস বলেন নি। কারণ এই বইতে সত্য সত্যই তিনি বাংলা 'সাহিত্যে'র ইতিহাস লিখতে চান নি, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যকে অবলম্বন করে বাঙালির

মনোজীবনের গতি-প্রকৃতিকে নির্ণয় করা। এটাই যে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যের নবজন্মের বর্ণনাতেই তা বোঝা যায়—

Up to the end of the fifteenth century our literature consisted simply of songs feelingly sung, about the amours of Krishna and Radhika. But the national mind was now awakened. The fiirst effect of this change was the introduction of new religion, deep and earnest in its character, and far-reaching in its consequences. In literature, too, there was a hankering for something vaster and nobler than what had been inherited from the preceding ages ; there was an energy capable of something greater than the composition of songs.

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের ফলে বাঙালির চিত্তে যে নবচেতনার সূত্রপাত হয়েছিল সে সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র বলছেন—

The conquest of Bengal by the English was not only a political revolution, but ushered in a greater revolution in thoughts and ideas ; in religion and society.[৮]

এ ধরণের কথা ইতিপূর্বে কেউ বলতে পারেন নি। যথার্থ ঐতিহাসিকের পক্ষেই তথ্যকে আশ্রয় করে গভীরতর ভাবগত সত্যকে উদ্ধার করা সম্ভব। রমেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্য-অবলম্বনে এই ভাবজীবনের পরিচয়ই দিতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য Raghunath and his school of Logic এবং Raghunandan and his Institutes এবং General Intellectual Progress (nineteenth century) প্রভৃতি অধ্যায় তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, কারণ বাঙালির মননপ্রকৃতিকে বুঝতে হলে এগুলির সন্ধান নিতেই হবে।

রমেশচন্দ্রের এই বইখানা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়াসে একটি বড়ো পদক্ষেপ। এতে যথার্থ ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে জাতীয় মনটিকে বোঝাবার মতো তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছে। এতকাল এই অন্তর্দৃষ্টিরই অভাব ছিল। অবশ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের সুপরিচিত প্রধান কয়েকজন কবিকে অবলম্বন করেই রমেশচন্দ্র এই দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। যদি বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন অধিকতর পরিমাণে পেতেন তবে হয়তো বাঙালি জাতির অন্তর্জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি লিখতে পারতেন। সেই সিদ্ধিতে পৌছেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) রচনা করে।

তাই রবীন্দ্রনাথ এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯০১) সমালোচনা-উপলক্ষে লিখেছিলেন—

"দ্বিতীয়বার পাঠে গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছি। এবারে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকারদের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত পরিচয়ে বা তুলনামূলক সমালোচনায় আমাদের মন আকর্ষণ করে নাই ; আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাসবনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।"

৮ এই মন্তব্যগুলি রমেশচন্দ্রের বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৯৫) বর্জিত হয়েছিল। J. N. Gupta প্রণীত *Life and Work of Romesh Chunder Dutt* (1911) গ্রন্থে বর্জিত অংশগুলি সংকলিত আছে। পৃ ৬১-৬৫

দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে পূর্বযুগের খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াস একত্র সম্মিলিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। প্রচুর তথ্যসংগ্রহ, কালানুক্রমিক বিন্যাস এবং লোকচিত্তের উদ্‌ঘাটনের দ্বারা জাতির অন্তর্জীবনের বিবরণ রচনা— এই তিন দিক দিয়েই দীনেশচন্দ্রের বইখানা একটি সুস্পষ্ট ও সমগ্র রূপ-রচনায় সার্থক হয়েছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের অপ্রচুর সাহিত্যিক নিদর্শন সত্ত্বেও কীভাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তিনি নিজেই তার বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পিস অ্যাসোসিয়েশন থেকে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে 'বিদ্যাসাগর-পদক' দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। দীনেশচন্দ্র এই পদক লাভ করেন। এই প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়েই তিনি রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ'র একটি পুথি পান। তাঁর উৎসাহ বেড়ে ওঠে। ত্রিপুরা চট্টগ্রাম অঞ্চলের পল্লীতে ঘুরে ঘুরে বহু পুথি তিনি সংগ্রহ করেন। তিনি এই কাজে এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য প্রার্থনা করে চিঠি লেখেন। তখনই তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আনুকূল্য লাভ করেন। কয়েক বৎসরের চেষ্টায় বহু কষ্ট স্বীকার করে তিনি যে পুথি সংগ্রহ করেন, তারই উপর ভিত্তি করে রচনা করেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। দীনেশচন্দ্রের এই ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে; তিনিও ঠিক এমনি কষ্ট স্বীকার করেই কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে বাংলা সাহিত্য-আলোচনার এক নবযুগের সূচনা করলেন। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই সম্বন্ধে আশা এবং উৎসাহ প্রকাশ করে বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায়।[৯] 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হলে হীরেন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' পত্রিকায় এই গ্রন্থের এক বিস্তৃত সমালোচনাও প্রকাশ করেন।[১০]

প্রাচীন সাহিত্যের অজস্র নিদর্শনই যে তিনি উদ্ধার করেছিলেন তা নয়। বস্তুত এই কাজে যত পরিশ্রমই থাক, দীনেশচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় অন্যত্র। অজস্র নিদর্শন উদ্ধার করে কালনির্ণয় করা এবং কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতায় তাদের স্থাপন করাতেই দীনেশচন্দ্রের প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া গেল। যে-কালে প্রাচীন সাহিত্যের পুথি সামান্যই পাওয়া যেত, সেই সময়ে দীনেশচন্দ্র পুথি সংগ্রহ করে তারিখ নির্ণয় করে শূন্য অতীতকে ইতিহাসে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর যে ভুল হয়নি তা নয়। 'শূন্যপুরাণ' অর্বাচীন রচনা হলেও প্রাচীন যুগের সাহিত্য মনে করেই তিনি আলোচনা করেছিলেন। এ ধরণের ত্রুটি আরো ছিল। কিন্তু দীনেশচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের যে পূর্ণাবয়ব রূপ নির্মাণ করেছিলেন সেই রূপ অক্ষয় হয়ে রইল।

এই রূপটিকে স্পষ্ট করে তুলবার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ নির্দিষ্ট করে দিলেন, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, চৈতন্য-যুগ, সংস্কার-যুগ, কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ এবং ইংরেজ-যুগ। ইতিপূর্বে রামগতি যুগবিভাগের একটা চেষ্টা করেছিলেন। রমেশচন্দ্রও গীতিকবিতার যুগ, সংস্কৃত প্রভাবের যুগ এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের যুগ— এইভাবে যুগভাগ করেছিলেন। দীনেশচন্দ্রের যুগভাগের সঙ্গে তুলনা করলেই তাঁদের পরিকল্পনার অসম্পূর্ণতা সহজেই চোখে পড়ে। দীনেশচন্দ্র যেভাবে যুগভাগ করেছিলেন কালসীমা তেমন সুস্পষ্ট না

৯ দ্র° বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা শ্রাবণ ১৩০১, 'প্রাচীন সাহিত্যালোচনা' প্রবন্ধ।

১০ সাহিত্য ১৩০৪ আষাঢ়।

কিন্তু কৃত্রিম হলেও এই অক্ষরবৃত্ত রীতির মধ্যে কি কোনো নিগূঢ় ছন্দোনীতি নেই? নিশ্চয়ই আছে। যদি না থাকত তবে এতকাল ধরে কবিরা এই রীতিতে যে কবিতা রচনা করে আসছেন তা সমস্ত বাঙালির কানের এমন দ্বিধাহীন স্বীকৃতি পেতেই পারত না। কৃত্রিম অক্ষরবৃত্ত রীতির অন্তর্নিহিত ওই ধ্রুব ছন্দোনীতির আবিষ্কারই বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় প্রয়াস, ছন্দোজগতে সংস্কারমুক্তির প্রয়াস। কিন্তু আমাদের পক্ষে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেননা ভারতচন্দ্রের মতো রামপ্রসাদও এই রীতির ছন্দে অক্ষরসংখ্যার নীতিই অনুসরণ করতেন এবং এই রীতির ছন্দকেই সাহিত্যের, বিশেষতঃ অ-গেয় সাহিত্যের, প্রধান বাহন বলে মনে করতেন। তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের প্রতি একটু দৃষ্টি দিলেই তা বোঝা যাবে।

গানরচনায় রামপ্রসাদ প্রয়োজনমতো তিন রীতির ছন্দই ব্যবহার করতেন। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ছন্দের নীতি (সে নীতি কৃত্রিম বা অকৃত্রিম যা-ই হক না কেন) অনুসরণ করে চলা অত্যাবশ্যক নয়। অনায়াসেই গানের সুরের উপরে ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া চলে। আবৃত্তিযোগ্য রচনায় যেখানেই মাত্রাহানি, মাত্রাবৃদ্ধি, যতিলঙ্ঘন বা রীতিমিশ্রণ -জনিত ত্রুটি থাকে সেখানেই কণ্ঠের স্খলন ঘটে ও শ্রুতি পীড়িত হয়। কিন্তু গানের সুরে এসব ত্রুটি অনায়াসেই সেরে নেওয়া যায়। রামপ্রসাদের গীতিরচনায় সবরকম ত্রুটিই পাওয়া যায়। কিন্তু সবরকম ত্রুটির দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। শুধু একরকম ত্রুটির উদাহরণ দেওয়াই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।—

> অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময় ভজ,
> মকরন্দরসে মজ, ওরে মন-ভৃঙ্গ।
> স্বপ্নে রাজ্য লভ্য 'যেমন', নিদ্রাভঙ্গে ভাব 'কেমন',
> বিষয় জানিবে 'তেমন', হোলে নিদ্রাভঙ্গ॥
> .. ..
> এই যে তোমার ঘরে ছয় চোরে চুরি করে,
> তুমি যাও 'পরের' ঘরে, এত বড় রঙ্গ।
> 'প্রসাদ' বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,
> অঙ্গহীন হয়ে সেটা দগ্ধ করে অঙ্গ॥

—ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ-সঙ্গ, 'কবিজীবনী' (ভবতোষ দত্ত), পৃ ৩৩৯-৪০

এই গানটি তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত' রীতির ছন্দে করিত। এর প্রতি পংক্তি চৌপদী। প্রথম তিন পদে আট 'অক্ষর' এবং চতুর্থ পদে ছয় অক্ষর— এ ছন্দোবন্ধের এই হল আদর্শ। কিন্তু পাঁচটি পদে আদর্শচ্যুতি ঘটেছে, কারণ এসব পদে একটি করে বাড়তি অক্ষর আছে। অর্থাৎ এসব স্থলে মাত্রাবৃদ্ধি দোষ ঘটেছে। কিন্তু আসলে তা হয় নি, হয়েছে রীতিমিশ্রণ দোষ। উচ্চারণভঙ্গির প্রতি একটু মন দিলেই বোঝা যাবে যে, ছন্দোরক্ষার খাতিরে আমরা স্বভাবতঃই উদ্ধৃতিচিহ্ননির্দিষ্ট পাঁচটি শব্দকে দলবৃত্ত রীতির ভঙ্গিতে উচ্চারণ করি, অক্ষরবৃত্ত রীতির ভঙ্গিতে নয়। অর্থাৎ ওই পাঁচটি শব্দে আমরা তিন অক্ষরে তিন মাত্রা না ধরে দুই দলে (অর্থাৎ দুই সিলেব্‌ল্‌এ) দুই মাত্রা ধরে ছন্দোরক্ষা করি। মানে, অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে দলবৃত্তের মিশ্রণ ঘটিয়ে টাল সামলাই।

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের যুগটা ছিল ছাপাখানার যুগ। সে যুগে কবির রচনা ও পাঠকের কানের মধ্যে কণ্ঠস্বরের ঘটকালি করবার সুযোগ ছিল না। ফলে স্বরলিপি যেমন করে গানের সুরের প্রতিনিধিত্ব করে, তখনকার দিনে তেমনি করেই ছাপাখানায় মুদ্রিত নীরব ধ্বনিলিপিকে ছন্দের প্রতিনিধিত্ব করতে হত। এমন অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে রামপ্রসাদের ন্যায় পাঠকের উপরে ছন্দের ত্রুটি সেরে নেবার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার উপায় ছিল না। মনে রাখতে হবে, এ কথা বলা হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত রীতির গীতিরচনা সম্পর্কে। রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে এজাতীয় ত্রুটি দেখা যায় না, যা-কিছু দেখা যায় তা তাঁর গীতিরচনাতেই। আর, ঈশ্বরচন্দ্র গেয় ও অগেয় উভয়প্রকার রচনাতেই ওরকম ত্রুটি সযত্নে বাঁচিয়ে চলতেন।

মোট কথা, অক্ষরবৃত্ত (অর্থাৎ মিশ্রকলাবৃত্ত) রীতির সংস্কার বা উন্নতি -সাধনে রামপ্রসাদ বা ঈশ্বরচন্দ্রের কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব নেই। এ ক্ষেত্রে তাঁরা পূর্বাগত প্রথারই অনুবর্তন করেছেন। কেননা, সে প্রথা তখন অল্পাধিক পরিমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং তার সংস্কার বা উন্নতি -সাধনের অবকাশও বেশি ছিল না। এখনও নেই। এ ক্ষেত্রে তাঁদের সব প্রচেষ্টাই নিবদ্ধ ছিল ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্যসাধনের দিকে, ছন্দোরীতির সংস্কারসাধনের দিকে নয়। কিন্তু অতিবাহুল্যের ভয়ে আমরা ছন্দোবন্ধের প্রসঙ্গ থেকে নিবৃত্ত রইলাম।

মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির ক্ষেত্রে যা-ই হয়, দলবৃত্ত ও সরল কলাবৃত্ত রীতির ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব আছে।

দলবৃত্ত রীতি

এবার দলবৃত্ত (প্রচলিত পরিভাষায় 'স্বরবৃত্ত') রীতির কথা ধরা যাক। এ রীতি মূলতঃ মেয়েলি ছড়া, পল্লীগীতি প্রভৃতি লোকসাহিত্যের ছন্দোরীতি, সুতরাং বাংলাভাষার স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু এই লৌকিক রীতি দীর্ঘকাল সাধুসাহিত্যের আসরে স্থান পায় নি। লোচনদাসের (ষোড়শ শতক) ধামালি রচনাতেই এই ছন্দোরীতির প্রথম সাক্ষাৎ পাই। এই হল এ রীতির প্রথম সাহিত্যিক প্রয়োগ। কিন্তু ধামালি রচনাও লোকসাহিত্যেরই প্রকারভেদ মাত্র, উচ্চাঙ্গ বা সাধু -সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। ধামালি-গুলি লোকশিক্ষা তথা লোকরঞ্জনের অভিপ্রায়ে রচিত। তাই তার ভাব, ভাষা ও অলংকার হয়েছে লোকচিত্তের পক্ষে সহজগ্রাহ্য। আর ওই একই অভিপ্রায়ে তাতে অনুসৃত হয়েছে লৌকিক ছন্দোরীতি। মনে রাখতে হবে লোচনদাস তাঁর রচিত সাধুসাহিত্যে (যেমন 'চৈতন্যমঙ্গল') দলবৃত্ত অর্থাৎ লৌকিক রীতির ছন্দ প্রয়োগ করেন নি। তাকে ধামালিজাতীয় লোকসাহিত্যের স্তর থেকে উপরে উঠিয়ে সাধু-সাহিত্যের পর্যায়ে স্থান দিতে সাহস করেন নি।

লোচনদাসের পরেও দীর্ঘকাল এই অবহেলিত ছন্দোরীতিটি লোকসাহিত্যের অন্ধকারের মধ্যে মুখ লুকিয়ে রইল। ভারতচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান্ ছন্দোবিলাসী কবিও তাকে আমল দিলেন না। তিন-খণ্ডব্যাপী সুবৃহৎ অন্নদামঙ্গল কাব্যে একটিমাত্র ক্ষুদ্র রচনায় তিনি ওই ছন্দোরীতি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু তাও একটি ছড়াজাতীয় রচনা, মেয়েদের মুখে বসানো। তাতেই বোঝা যায়, তখনকার দিনেও সাধুসাহিত্যিকরা এই ছন্দোরীতিটিকে কি নজরে দেখতেন।

অবশেষে রামপ্রসাদের হাতে এসে এই ছন্দোরীতি ভদ্রসমাজে স্থান পাবার অধিকার লাভ করল। ষোলো আনা অধিকার না হলেও রামপ্রসাদ যে অধিকার তাকে দিলেন তাতেই সাধুসাহিত্যের আসরে অন্য দুই ছন্দোরীতির সঙ্গে তার সমকক্ষতা লাভের পক্ষ সুগম হল। রামপ্রসাদও লোচনদাসের মতোই সাধুসাহিত্য রচনায় (যেমন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে) এই লৌকিক ছন্দোরীতিটিকে আমল দেন নি। কিন্তু তাঁর গীতিরচনার ফলে এই রীতিটি যে জনপ্রিয়তা ও উচ্চমর্যাদা লাভের সুযোগ পেয়েছে, লোচনদাসের ধামালি তাকে সে সুযোগ দিতে পারে নি। লোচনদাসের ধামালি রচনায় যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিল, রামপ্রসাদের গানে তা নেই। রামপ্রসাদের গানগুলি যদিও প্রত্যক্ষতঃ কালী, তারা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দেবতার নামেই রচিত তথাপি সেগুলির অন্তর্নিহিত সর্বজনীনতা সংশয়াতীত। 'মা তুমি অন্তরে আছ', 'ডুব দে রে মন কালী বলে হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে', 'মা বিরাজে সর্বঘটে', 'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি' প্রভৃতি বহু উক্তির কথা স্মরণ করলেই এই সর্বজনীনতার কারণ উপলব্ধি হবে। ফলে রামপ্রসাদের গানে সম্প্রদায়নির্বিশেষে বাঙালির জাতীয় চিত্তকে অধিকার করবার যে শক্তি ছিল, লোচনদাসের ধামালিতে তা ছিল না। তা ছাড়া রামপ্রসাদের গান যতখানি উঁচু স্বরে বাঁধা, লোচনের ধামালি তা নয়। রামপ্রসাদের গানে ভক্তির নিষ্ঠা ও গভীরতা আছে, গদ্‌গদ বিহ্বলতা বা অস্থির ব্যাকুলতা নেই। তা ছাড়া ওই ভক্তি দার্শনিক তত্ত্বোপলব্ধির সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তরল ভাবপ্রবণতার স্রোতে ভেসে-যাওয়া মাত্র নয়। ফলে রামপ্রসাদের গানগুলি শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে সমাজের উঁচুনীচু সকল স্তরেই সমাদর লাভের সুযোগ পেয়েছিল যা লোচনদাসের ধামালির পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। আর, এই গানের যোগেই অবহেলিত লৌকিক ছন্দোরীতিটিও প্রায় অলক্ষিতেই ভদ্রসমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করল। বস্তুতঃ গানরচনার ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ যে এই উপেক্ষিত ছন্দো-রীতিটিকে উচ্চাঙ্গ ভাবের আসরে বিনা দ্বিধায় প্রবেশাধিকার দিলেন, ছন্দশিল্পী হিসাবে এটা তাঁর একটা বড় কৃতিত্ব।

রামপ্রসাদের অনুবর্তী ঈশ্বরচন্দ্রও এতটা সাহস করেন নি। তিনিও এই ছন্দোরীতিটিকে উচ্চাঙ্গ ধর্মভাবের কবিতার বাহনরূপে প্রযুক্ত হবার যোগ্য বিবেচনা করেন নি, লোকরঞ্জক গীতি-রচনার যোগ্য বলেই মনে করতেন। তবে কোনো ক্ষেত্রেই যে তার ব্যতিক্রম নেই তা নয়। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সংবাদপ্রভাকর পত্রিকায় 'মনুষ্য' নামে একটি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (১২৬০ কার্তিক ৩)। আলোচিত ভাবের পরিপূরক হিসাবে একটি পদ্যরচনাও ছিল ওই প্রবন্ধের অন্তর্গত। এই রচনাটি পরবর্তী কালে 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে গৃহীত হয় 'ক্ষমা'র সংগীত রূপে।[৩] এই রচনাটি উচ্চভাবের হলেও লৌকিক দলবৃত্ত রীতিতেই রচিত। তার থেকে কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করছি।—

হতে চাও মানুষ যদি, ভ্রান্তিনদী
এই বেলা পার হও রে তবে।…
নয়নে ছোট বড় দেখবে যারে,
তুষবে তারে প্রিয় রবে।

৩ রচনাটি প্রচলিত বসুমতী-সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে (পৃ ৮৮-৯০) সংকলিত আছে 'সংগীত-১' নামে।

জগতে হাড়ি মুচি সবাই শুচি,
সমভাবে ভাববে সবে ॥···
স্বভাবে হও রে সোজা, ভূতের বোঝা
আর কত দিন মাথায় ববে ?

—'বোধেন্দুবিকাস' (গ্রন্থাবলী : মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত), চতুর্থ অঙ্ক, পৃ ১৫৭

এই রচনার ছন্দোরীতিটাই শুধু নয়, এর ছন্দোবন্ধের উপভোগ্য বিশেষ ভঙ্গিটাও লক্ষণীয়। যা হক, এই ধরণের উচ্চভাবের বাহন হিসাবে দলবৃত্ত রীতির প্রয়োগ ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় বেশি দেখা যায় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের পরে মধুসূদন হেমচন্দ্র -প্রমুখ কবিরাও দীর্ঘকাল এই রীতিটিকে লঘুভাবের বাহন হিসাবেই প্রয়োগ করেছেন, তাকে গুরুভাবের যোগ্য বাহন বলে মনে করেন নি। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ এই রীতির যথার্থ শক্তি উপলব্ধি করে তাকে অন্য দুটি সাধু ছন্দোরীতির সমান মর্যাদা দেন। তাঁর খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, বলাকা, পলাতকা প্রভৃতি কাব্যে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ধর্মভাব তথা অন্যবিধ উচ্চভাবের বাহনরূপে এই লৌকিক রীতির শক্তি ও সৌন্দর্য সাধুরীতি-দুটির চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। এই হিসাবে রামপ্রসাদকে আধুনিক কালের অগ্রদূত বলে গণ্য করা যায়।

এই লৌকিক ছন্দোরীতিটি রামপ্রসাদের প্রতিভাবলে সাহিত্যসমাজে ব্যাপ্তি এবং মর্যাদা -লাভ করলেও তাঁর রচনায় এটি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত হতে পারে নি। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

মন কেন রে ভাবিস এত।
যেন মাতৃহীন বালকের মত ॥
ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে 'কালের কাল' 'মহাকাল', সে কাল মায়ের পদানত ॥
ফণী হয়ে 'ভেকে ভয়', এ যে বড় অদ্‌ভুত।
ওরে তুই করিস কি 'কালের ভয়' হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত ॥

—মন কেন রে ভাবিস এত, 'কবিজীবনী', পৃ ৮৯

এখানে উদ্‌ধৃতিচিহ্ন-নির্দিষ্ট চারটি পর্বে একটি করে দলমাত্রা কম পড়ছে। অর্থাৎ মাত্রাহানি দোষ ঘটেছে। আসলে কিন্তু এটা মাত্রাহানি দোষ নয়, রীতিমিশ্রণ দোষ। কেননা, এখানে দুটো 'কাল' এবং দুটো 'ভয়' শব্দে মাত্রা রক্ষিত হচ্ছে বাংলা অক্ষরবৃত্ত রীতির উচ্চারণের দ্বারা। কিন্তু 'অদ্‌ভুত' পর্বে মাত্রাহানিই ঘটেছে।

পূর্বে দেখেছি রামপ্রসাদের রচনায় অক্ষরবৃত্ত রীতির সঙ্গে দলবৃত্ত রীতির মিশ্রণদোষ। এখন দেখলাম ঠিক তার বিপরীত রকমের দোষ। এ দুটিই তাঁর রচনার প্রধান দোষ। অন্যবিধ দোষও যে নেই তা নয়। তার প্রধান কারণ রামপ্রসাদের এসব রচনা গাওয়ার জন্য রচিত, পাঠ বা আবৃত্তির জন্য নয়। আর গানের সুরে ও তালে সব ছন্দোদোষ আপনা থেকেই শুধরে যায়, কানে ধরা পড়ে না। তা ছাড়া গীতিরচনায় পঠিত ছন্দ রক্ষা করে চলাও অত্যাবশ্যক নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রধানতঃ গেয় রচনাতেই দলবৃত্ত রীতির ছন্দে প্রয়োগ করেছেন, তাঁর অ-গেয় রচনায় এই রীতির প্রয়োগ বেশি নেই। অবশ্য 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর উক্তিতে এই ছন্দোরীতির

কিছু প্রয়োগ দেখা যায়। যা হুক, তাঁর গেয় ও অ-গেয় উভয় প্রকার রচনাই রীতিমিশ্রণ প্রভৃতি দোষ থেকে অনেকাংশেই মুক্ত এবং রামপ্রসাদের রচনার তুলনায় অধিকতর সুগঠিত ছিল। 'বোধেন্দুবিকাস' নাটক থেকে দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। প্রথমটি এই নাটকের 'প্রস্তাবনা'-য় নটীর একটি উক্তির অংশ।—

ও কথা আর বলো না, আর বলো না,
বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে ?
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে, হাসবে লোকে॥
বল হে বলব কত, বলব কত,
বলতে হুল মনের দুখে।
এ বড় অনাসৃষ্টি, বিষম সৃষ্টি,
সুধাবৃষ্টি সাপের মুখে॥
কাণার চোখে চশমা দিয়ে কার্য কিবা আছে।
পতিব্রতা-ধর্মকথা বারাঙ্গনার কাছে॥
কালার কাছে কাব্যকথা, [এ] কি তোমার ভ্রান্তি।
চোরের কাছে পুণ্যকথা, বীরের কাছে শান্তি॥

—বোধেন্দুবিকাস (রামচন্দ্র গুপ্ত), পৃ ৫

ঈশ্বরচন্দ্র এ ছন্দের নাম দিয়েছেন 'প্রকৃতিচ্ছন্দ'। যে লৌকিক রীতির ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেন 'প্রাকৃত ছন্দ', তাকেই এস্থলে বলা হয়েছে প্রকৃতিচ্ছন্দ।

এবার দ্বিতীয় অঙ্কে বিভ্রমাবতীর গীত থেকে কয়েক পংক্তি তুলে দিচ্ছি।—

দিনদুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাত-পোয়ানো ভার।
হল পুন্নিমেতে অমাবস্যা, তেরো পহর অন্ধকার॥
এসে বেন্দাবনে বলে গেল বামী বষ্টমী
একাদশীর দিনে হবে জর্ম-অষ্টমী,
আর ভাদ্দর মাসের সাতুই পোষে চড়ক-পূজার দিন এবার॥
.. .. ..
ঐ সুজ্জিমামা পুব্বু দিগে অস্তে চলে যায়,
উত্তুর-দখিন কোণ থেকে আজ বাতাস লাগছে গায়,
সেই রাজার বাড়ির টাটু ঘোড়া, শিং উঠেছে দুটো তার॥

—বোধেন্দুবিকাস (রামচন্দ্র গুপ্ত), পৃ ৬৫-৬৬

বলা বাহুল্য, এটাও ঈশ্বরচন্দ্র-আখ্যাত প্রকৃতিচ্ছন্দে অর্থাৎ লৌকিক বা দলবৃত্ত রীতির ছন্দেই রচিত। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বলা ভালো যে, এই রচনাটিকে উত্তরকালীন সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' বা রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' -জাতীয় রচনার অগ্রদূত বলে মনে করা অসমীচীন নয়।

দলবৃত্ত রীতির ছন্দকে শুধু সুগঠিত রূপদানেই নয়, তার বন্ধবৈচিত্র্যসাধনেও ঈশ্বরচন্দ্রের কৃতিত্ব কম

নয়। রামপ্রসাদের সব দলবৃত্ত রচনাই প্রায় এক ধরণের, তাঁর বিভিন্ন রচনার বহিরাকৃতিতে নূতন নূতন রূপ বড় দেখা যায় না। এ ছন্দের গীতিরচনায় ভাবের প্রতিই কবির দৃষ্টি বেশি, তার শিল্পরূপের প্রতি নয়। পক্ষান্তরে ঈশ্বরচন্দ্র রচনার শিল্পরূপের প্রতি সর্বদাই অবহিত থাকতেন। তাই তাঁর রচনায় ছন্দের বন্ধবৈচিত্র্যের অভাব ঘটে নি। তাঁর রচনা থেকে এ রীতির ছন্দের যে-কয়টি দৃষ্টান্ত পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। কিন্তু বন্ধবৈচিত্র্য বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। তবু ঈশ্বরচন্দ্রের লঘুরচনা থেকে নমুনাস্বরূপ আর-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।—

দন্নাল বাবু কোথায় আছে,
পূরে আশা গেলে কাছে,
দয়াল নয় সব, কয়াল বাবু,
হাড়ে টোকো মুখে মিঠে।...
এমন দাতা আছে কেবা,
সুখে করায় উদর-সেবা,
পিটে-পুলির ছিটে গুলি
মারবে কসে আমার পেটে॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পৌষড়ার গীত

কলাবৃত্ত রীতি

কলাবৃত্ত (প্রচলিত পরিভাষায় 'মাত্রাবৃত্ত') রীতির ছন্দ রচনাতেই বোধ করি রামপ্রসাদের এবং কিছু পরিমাণে ঈশ্বরচন্দ্রেরও কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। অথচ তাঁদের এই কৃতিত্বের কথাটাই সাহিত্যসমাজে এখন পর্যন্ত অলক্ষিত রয়েছে। তাই এই বিষয়টা একটু বিশদভাবেই বোঝাতে হচ্ছে।

আধা-জয়দেবী কলাবৃত্ত

চর্যাগীতিগুলিতেই বাংলা কলাবৃত্ত রীতির প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চর্যাগীতির ছন্দ ত্রুটিহীন নয়। এগুলিতে নানা স্থানেই কলাবৃত্ত রীতির নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। তা ছাড়া এগুলি পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের, বিশেষতঃ ছন্দোরচনার প্রেরণাস্থল বলে গণ্য হয় নি। সে প্রেরণা জুগিয়েছিল জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের গানগুলি। এই গানগুলির ছন্দ নিখুঁত ও আদর্শস্থানীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণরীতি বাংলা ভাষার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তাই চর্যাকারদের ন্যায় জয়দেবের অনুবর্তীদের ছন্দও নিখুঁত হতে পারে নি। তাঁদের রচনায় স্বভাবতঃই (হয় তো তাঁদের অলক্ষিতেই) নানা স্থানে সংস্কৃত ও বাংলা উচ্চারণরীতির মিশ্রণ ঘটে গিয়েছে। জয়দেবের প্রধান অনুবর্তী বিদ্যাপতির পদাবলীতেই এই মিশ্রণজনিত ত্রুটির বহু নিদর্শন আছে। আর বিদ্যাপতির অনুগামী গোবিন্দদাসপ্রমুখ কবিদের রচনাতেও এই ত্রুটির অভাব নেই। ছন্দোনিপুণ গোবিন্দদাসের রচনা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

শরদচন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
মত্ত মধুকর ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলিগান পঞ্চম তান
কুলবতি-চিত-চোরণি ॥

—বৈষ্ণব পদাবলী (সাহিত্যসংসদ্), পৃ ৬৩৭

এই কয়েক পংক্তিতেই সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত রীতির স্খলন ঘটেছে অনেক স্থানে। এরকম খোঁড়া মাত্রাবৃত্ত রীতিকে বলতে পারি 'ভাঙা-জয়দেবী' বা 'আধা-জয়দেবী' রীতি। এই আধা-জয়দেবী রীতি বৈষ্ণব গীতিকবিতার অন্যতম প্রধান বাহন হিসাবে আদৃত ছিল ওই সাহিত্যের শেষ পর্ব পর্যন্ত। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'রও অবলম্বন এই আধা-জয়দেবী রীতি।

বলা বাহুল্য, এই রফা-করা ছন্দোরীতিও বাংলাভাষার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কেননা, বাংলায় সংস্কৃত পদ্ধতিতে স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ অচল। তাই তখনকার দিনের কবিরা স্বভাবতঃই এই কৃত্রিম ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন, খাঁটি বাংলায় এই রীতির প্রয়োগ করেন নি। বাংলায় এই রফাপ্রবণতা প্রথম দেখা দেয় চর্যাগীতিগুলিতে। আর তার বিলীয়মান শেষ নিদর্শন পাওয়া যায় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। তার পর থেকে বাংলায় সংস্কৃত ধরণে স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেল। যেটুকু অবশিষ্ট রইল তা শুধু বৈষ্ণব গীতিকবিতায়, আর তাও শুধু তার ব্রজবুলি বিভাগে।

রামপ্রসাদের কৃতিত্ব

পরম ছন্দোবিলাসী কবি ভারতচন্দ্রও আধা-জয়দেবী রীতির ছন্দ চালাতে চেষ্টা করেন নি। যেসব গীতিরচনায় মাত্রাবৃত্ত রীতি প্রয়োগের প্রয়োজন বোধ করেছেন, সেসব স্থানে নিখুঁত ভাবেই জয়দেবী রীতি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু বাংলায় বিশুদ্ধ জয়দেবী রীতি চালানো সহজসাধ্য নয়। তা ছাড়া সংস্কৃত উচ্চারণের লোহার ছাঁচে পড়ে বাংলা ভাষাও অনেক পরিমাণে কৃত্রিম ও আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতচন্দ্রও অন্নদামঙ্গলের গীতিরচনাগুলিকে এই কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা থেকে বাঁচাতে পারেন নি।

স্বভাবকবি রামপ্রসাদ কিন্তু তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত গানগুলিতে এই কৃত্রিমতাকে মানতে রাজি ছিলেন না। তাই এসব রচনায় তিনি এক দিকে সংস্কৃত উচ্চারণের উদাত্ত মাধুর্য ও অপর দিকে বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক সৌন্দর্য এই দুএর মধ্যে রফানিষ্পত্তি করে আধা-জয়দেবী রীতিরই আশ্রয় নিলেন।

মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, রামপ্রসাদ কি এই ভাঙা ছন্দোরীতি রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন বৈষ্ণব কবিদের কাছেই। মনে হয় এ বিষয়ে বৈষ্ণব গীতিকবিতাই তাঁর প্রেরণার উৎসস্থল। রামপ্রসাদ শাক্ত হলেও বৈষ্ণব গীতিকবিতার রসগ্রহণে তাঁর কুণ্ঠা বা অরুচি ছিল না। তাঁর 'কালীকীর্তন' কাব্যেই তার

সংশয়াতীত প্রমাণ আছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনায় অগ্রসর না হয়ে ওই কাব্য থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করলেই উক্ত সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হবে।

নিরখি নিরখি বদন-ইন্দু।
পুলকে উথলে প্রেমসিন্ধু॥
. .
দর দর দর ঝরত লোর,
চর চর চর তনু বিভোর,
কবহুঁ কবহুঁ করত কোর
থোর থোর দোলনা।
রানী বদন হেরি হেরি
হসিত বদন বেরি বেরি
চোরি চোরি থোরি থোরি
মন্দ মন্দ বোলনা॥
. .
কষিত কনক বিমল কান্তি
মনহি তাপ করত শান্তি,
তনু তিরপিত নয়ন-সুখ
কল্মষ নিকর-ভঞ্জনা।
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস
সতত কাতর করুণাভাষ,
বারয় রবিতনয়-শঙ্কা
মদনমথন-অঙ্গনা॥

—শ্রীশ্রীকালীকীর্তন (গ্রন্থাবলী : বসুমতী), পৃ ৩

বলা বাহুল্য এর ভাব, ভাষা, ছন্দ সবকিছুর দ্বারাই ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রভাব সূচিত হচ্ছে। বর্তমান প্রসঙ্গে এই রচনাটির আধা-জয়দেবী ছন্দোরীতি বিশেষভাবে লক্ষিতব্য।

এবার রামপ্রসাদের সমরসংগীতগুলি থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এই গানগুলির প্রতিই ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তি এই।—

"এই মহাশয়· ·যাহা রচনা করিয়াছেন তাহাই অতি সুন্দর হইয়াছে, বিশেষতঃ বীররসের কবিতা অর্থাৎ ভগবতীর রণবর্ণনাঘটিত পদাবলীর তুলনা দিবার স্থান দেখিতে পাই না। এ কারণ তাহাই সর্বাগ্রে উদ্দিত করিলাম।"

—'কবিজীবনী', পৃ ৬৬-৬৭

প্রথম দৃষ্টান্ত এই।—

১। ভূতপিশাচ প্রমথ সঙ্গে
ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,

রঙ্গিণীবর সঙ্গিনী—,
নগনা সমান বেশ।
গজ রথ রথি করত গ্রাস,
সুরাসুরনর-হৃদয়-ত্রাস,
দ্রুত চলত ঢলত রসে গরগর,
নরকর কটিদেশ ॥

—কুলবালা উলঙ্গ, 'কবিজীবনী', পৃ ৬৯

এটিতেও বৈষ্ণব কবিদের ব্রজবুলি-রচনার ভাষা ও ছন্দের অনুকৃতি সুস্পষ্ট। অনুরূপ আর-একটি দৃষ্টান্ত এই।—

২। নাসে মুকুতা-ফল বিলোর,
পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর,
মন্দ মন্দ হাসি।...
নীলকমল-দলজিতাস্য,
তড়িতজড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিত কুচ অপ্রকাশ্য,
ভালে শিশু শশী ॥...
মম সর্ব গর্ব খর্ব করে,
এ কি সর্বনাশী।
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস
ঘোর তিমির-পুঞ্জ নাশ,
হৃদয়কমলে সতত বাস,
শ্যামা দীর্ঘকেশী ॥

—শ্যামা বামা গুণধামা, 'কবিজীবনী', পৃ ৭০-৭১

সর্বশেষে রামপ্রসাদের আর-একটি রচনা সমগ্রভাবেই উদ্ধৃত করছি। এটিই বোধ করি রামপ্রসাদী রচনায় আধা-জয়দেবী ছন্দোরীতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।—

৩। ও কে রে মনোমোহিনী।
ঐ মনোমোহিনী ॥
ঢল ঢল ঢল তড়িৎঘটা,
মণিমরকত কান্তিছটা,
একি চিত্তছলনা দৈত্যদলনা
ললনা নলিনীবিড়ম্বিনী ॥

সপ্ত পেতি, সপ্ত হেতি
সপ্তবিংশ প্রিয় নয়নী।
শশি -খণ্ড শিরসি, মহেশ-উরসি,
হরের রূপসী একাকিনী॥
ললাট-ফলকে অলকা ঝলকে,
নাসা নলকে, বেসরে মণি।
মরি হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ,
রসসুধাকূপ বদনখানি॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস,
কেশপাশ কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অশূরে দরদা,
নিকটে প্রমোদা, প্রমাদ গণি॥
কহিছে প্রসাদ, না কর বিষাদ,
পড়িল প্রসাদ স্বরূপে মানি।
না হব জয়ী রে, ব্রহ্মময়ী রে,
করুণাময়ীরে বল জননী॥

—ও কেরে মনোমোহিনী, 'কবিজীবনী', পৃ ৯৩

রামপ্রসাদের রচনা থেকে আধা-জয়দেবী রীতির যে-কয়টি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হল সেগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন।—

এক। এই দৃষ্টান্তগুলি সবই ছয় মাত্রার পর্ব নিয়ে গঠিত। গীতগোবিন্দ কাব্যে ছয়মাত্রা পর্বের রচনা একটিও নেই। ছয় মাত্রার কলাবৃত্ত পর্ব প্রথম দেখা দেয় বৈষ্ণব কবিদের ব্রজবুলি পদাবলীতে। রামপ্রসাদ যে এ বিষয়ে ব্রজবুলি পদাবলীর কাছে ঋণী, তাতে বোধ করি সন্দেহ নেই। তাঁর এইজাতীয় অনেক রচনাতেই ব্রজবুলির ছাপ দেখা যায়।

দুই। রামপ্রসাদের কলাবৃত্ত রচনায় ব্রজবুলির ক্রমক্ষীয়মাণ প্রভাবও লক্ষণীয়। তাঁর ভাষা ব্রজবুলির প্রভাব থেকে ক্রমে মুক্ত হয়ে খাঁটি বাংলায় পরিণত হয়েছে। বিশুদ্ধ বাংলায় কলাবৃত্ত ছন্দের প্রথম প্রবর্তক হিসাবে রামপ্রসাদের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সর্বশেষে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটি বিশুদ্ধ বাংলা কলাবৃত্ত রচনার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

তিন। কলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগ এতদিন শুধু বৈষ্ণবসাহিত্যেই নিবদ্ধ ছিল। রামপ্রসাদই প্রথম এই ছন্দোরীতিকে অ-বৈষ্ণব গীতিরচনার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা দান করলেন। এটা তাঁর আর-একটি ঐতিহাসিক কীর্তি।

চার। রামপ্রসাদ তাঁর গীতিরচনাগুলিতে বিশুদ্ধ জয়দেবী রীতি প্রয়োগে সচেষ্ট না হয়ে আধা-জয়দেবী রীতিকেই মেনে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ সংস্কৃত কায়দায় স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণের সঙ্গে বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণের মিতালি ঘটাতে দ্বিধা করেন নি। গেয় রচনায় এরকম মিতালি

সহজেই চলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দেখি সংস্কৃত উচ্চারণ ক্রমে হঠে গিয়ে বাংলাকেই পুরো দখল ছেড়ে দিয়েছে। সবশেষের দৃষ্টান্তটিতেই দেখা যায়, তার প্রথম পংক্তিগুলিতে সংস্কৃত ও বাংলা উচ্চারণে মিতালি চলেছে, কিন্তু শেষ কয়টি পংক্তি খাঁটি বাংলা উচ্চারণের দখলে চলে গিয়েছে। পরে ছয়মাত্রা পর্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে এরকম খাঁটি বাংলা কলাবৃত্তের উৎকৃষ্টতর নিদর্শন দেওয়া যাবে।

এই হিসাবে রামপ্রসাদ আপন সময়ের অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন। বস্তুতঃ পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যে (১৮৯০) যে নব্য ছন্দোরীতি প্রবর্তিত হয়, তারই কিছু প্রাথমিক নিদর্শন পাওয়া যায় রামপ্রসাদের এই গীতিরচনাগুলিতে।

ঈশ্বরচন্দ্রের কৃতিত্ব

এ ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন রামপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী। তাঁর রচনায় কলাবৃত্ত রীতির প্রয়োগ সম্বন্ধে অন্যত্র[৪] কিছু আলোচনা করেছি। তাতে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাতে রবীন্দ্রপ্রবর্তিত নব্য কলাবৃত্ত রীতির অন্যতম প্রথম সুষ্ঠু প্রকাশ দেখা যায়। এস্থলে আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে, অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায় কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ প্রয়োগেও তিনি ছিলেন রামপ্রসাদের অনুবর্তী। আর কথা না বাড়িয়ে প্রথমেই তাঁর 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক থেকে দুটি গীতিরচনা উদ্‌ধৃত করা যাক। দুটিই কাপালিনী-বেশধারিণী রাজসী-শ্রদ্ধার গীত। ছন্দের প্রয়োজনে প্রথম গীতটিতে যেসব স্থলে সংস্কৃত পদ্ধতিতে স্বরবর্ণের উচ্চারণ দীর্ঘ, সেসব স্থলে হাইফেনচিহ্নযোগে তা নির্দেশ করা গেল।—

কে- রে বা- মা, বারিদবরণী,
তরুণী ভা- লে ধরেছে তরণি,
কাহার ঘরণী আসিয়ে ধরণী
        করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূ- প, কি অপরূ- প,
অনুপ রূ- প, নাহি স্বরূ- প,
মদননিধনকরণকারণ
        -চরণ শরণ লয়।
বামা হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
'হুহুঙ্কার' রবে সকল শাসিছে,
নিকটে আসিছে, 'বিপক্ষ' নাশিছে,
        গ্রাসিছে বারণ হয়।
বামা টলিছে ঢলিছে, 'লাবণ্য' গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে,
        ছলিছে ভুবনময়।

---

৪ 'ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ, হরপ্রসাদ মিত্র-সম্পাদিত 'রবীন্দ্রচর্চা' গ্রন্থ (১৩৬৯ শ্রাবণ)।

কে রে ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা বামা বিবসনা
আসবে মগনা রয় ॥
—'বোধেন্দুবিকাস' (রামচন্দ্র গুপ্ত), তৃতীয় অঙ্ক পৃ ১১১

বলা বাহুল্য, এই সবগুলি পংক্তিই চৌপদী। দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে শুধু প্রথম দুই পংক্তিতেই প্রয়োজনমতো স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ হয়েছে। এই দুই পংক্তির আট পদে সাতটিমাত্র স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ, বাকি সব হ্রস্ব। তা ছাড়া, এই দুই পংক্তিতে যুক্তাক্ষরসূচিত রুদ্ধদল একটিও নেই। পরের তিন পংক্তিতে সংস্কৃত ধরণের দীর্ঘ উচ্চারণ কোথাও নেই। কিন্তু হুহুঙ্কার, বিপক্ষ ও লাবণ্য, এই তিনটিমাত্র শব্দে যুক্তাক্ষরসূচিত রুদ্ধদল আছে। এই তিনটি রুদ্ধদলেরই উচ্চারণ সংকুচিত অর্থাৎ একমাত্রক, সরল বা অমিশ্র কলাবৃত্ত রীতি অনুসারে দ্বিমাত্রক নয়। অর্থাৎ এই তিন পংক্তিতে মিশ্রকলাবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) রীতি অনুসৃত হয়েছে, সরল কলাবৃত্ত রীতি নয়। অথচ প্রথম দুই পংক্তিতে আধা-জয়দেবী কায়দায় সরল কলাবৃত্ত রীতিরই পত্তন করা হয়েছে। এক রীতিতে আরম্ভ করে অন্য রীতিতে শেষ করা একটা বড় ত্রুটি বলেই স্বীকার্য। তা ছাড়া, ছয়মাত্রা পর্বের রচনায় মিশ্রকলাবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) কায়দায় রুদ্ধদলের একমাত্রক উচ্চারণটাও বড় শ্রুতিকটু হয়। আর সরল কলাবৃত্তে যুক্তাক্ষরসূচিত রুদ্ধদল বর্জন করে চললেও রচনা বড় দুর্বল হয়। এই সবরকম ত্রুটিই এই প্রথম গীতটিকে পঙ্গু করে রেখেছে।

আশ্চর্যের বিষয় ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সহজাত ছন্দপ্রতিভাগুণে দ্বিতীয় গীতটিতে এই সবরকম ত্রুটি ও দুর্বলতাকে অনায়াসেই এড়িয়ে গেছেন। তাঁর এই অপূর্ব নৈপুণ্যের জন্য এই দ্বিতীয় গীতটি বাংলা ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য।—

কে- রে বা- মা, ষোড়শী রূপসী,
সুরেশী এ- যে, নহে মা- নুষী,
ভালে শিশু শশী, করে শোভে অসি,
রূপ মসী, চারু ভাস।

দেখ বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্তি,
চরণে কৃত্তিবাস ॥

কে রে করাল কামিনী মরালগামিনী,
কাহার স্বামিনী ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত করেছে যামিনী,
দামিনীজড়িত হাস।

কে রে যোগিনীসঙ্গে রুধিররঙ্গে
রণতরঙ্গে নাচে ত্রিভঙ্গে,

কুটিলাপাঙ্গে তিমির অঙ্গে
করিছে তিমির নাশ ॥
আহা, যে দেখি পর্ব, যে ছিল গর্ব,
হইল খর্ব, গেল রে সর্ব,
চরণসরোজে পড়িয়ে শর্ব,
করিছে সর্বনাশ।
দেখি' নিকট মরণ কর রে স্মরণ
মরণহরণ অভয় চরণ,
নিবিড় নবীন নীরদবরণ
মানসে কর প্রকাশ ॥
—'বোধেন্দুবিকাস' (রামচন্দ্র গুপ্ত), তৃতীয় অঙ্ক পৃ ১১৩

এখানেই ঈশ্বরচন্দ্রের ছন্দপ্রতিভার চরম পরিণতি। পরবর্তী কালে 'সোনার তরী' (১৮৯৪) ও 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্য রচনার সময়ে নব্যকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ যে শক্তি অর্জন করেছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের এই রচনাটিতে সে শক্তিই প্রভূতপরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে। এই রচনাটির ছন্দোভঙ্গি সর্বাংশেই রমণীয়। তবু দুএকটি সামান্য ত্রুটির কথা বলা উচিত। প্রথমতঃ, আধা-জয়দেবী কায়দায় এর প্রথম দুই পদে চার জায়গায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ স্বীকৃত হয়েছে। গীতিরচনায় এই সামান্য ত্রুটি উপেক্ষণীয়। তবু বলতে হবে 'নহে মানুষী'তে তালভঙ্গ হয়েছে। 'নহে তো মানুষী' হলে কানে খটকা লাগত না। দ্বিতীয়তঃ, এই রচনাটির প্রায় সর্বত্রই, অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক পর্বেই তিন মাত্রার পরে একটি করে উপযতি রাখা হয়েছে, উপযতিলোপ ঘটানো হয় নি। ফলে রচনাটি অনেকাংশে একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া, এটিতে অন্যবিধ যে দোষই থাক না কেন, ছন্দোগত আর কোনো ত্রুটি নেই।

রবীন্দ্রনাথ ও নব্যকলাবৃত্ত রীতি

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'বিরহ' (১২৯৩ ভাদ্র-আশ্বিন) এবং 'মানসী' কাব্যের 'ভুলভাঙা (১২৯৪ বৈশাখ), এই দুটি কবিতাই নব্যকলাবৃত্ত রীতির অগ্রদূত বলে স্বীকৃত। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সহসা নূতন পথে চলবার প্রেরণা পেলেন কোথায়? তাঁর এই প্রেরণার উৎসস্থল একাধিক হতে পারে। 'বিরহ' কবিতা প্রকাশের কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্রের 'কবিতাসংগ্রহ' (১২৯২ আশ্বিন ১৫)[৫]। এই গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র 'বোধেন্দুবিকাস' নাটক থেকে কাপালিনীর উক্ত দুটি গীত উদ্‌ধৃত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে 'শব্দের প্রতিযোগিশূন্য অধিপতি' বলে বর্ণনা করেন এবং তাঁর অপূর্ব শব্দকুশলতার প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দ্বিতীয় রচনাটির শুধু শব্দকুশলতাই নয়, ছন্দকুশলতাও অপূর্ব। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের এই ছন্দকুশলতা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। মনে হয় রচনাটির শব্দঝংকারই তাঁর কাছে এটির ছন্দোমাধুর্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অর্থাৎ এটির ছন্দকুশলতা তাঁর কানকে খুশি করলেও তাঁর জ্ঞানে ধরা পড়ে নি। কিন্তু তখনকার দিনে

৫ এটি গ্রন্থের প্রকাশক-লিখিত 'বিজ্ঞাপন'এর তারিখ। সুতরাং বইখানি তার কিছুকাল পরে প্রকাশিত হয় মনে করা যায়।

কোনো রচনার পক্ষেই রবীন্দ্রনাথের প্রখর ছন্দোবোধকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রলিখিত 'কবিতাসংগ্রহ' গ্রন্থের এই বিখ্যাত ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি এমন হতে পারে না। আর, ওই ভূমিকায় উদ্‌ধৃত ঈশ্বরচন্দ্রের এই রচনাটির ছন্দোগত সৌন্দর্য ও অভিনবত্ব তাঁর কানে ও জ্ঞানে ধরা পড়ে নি, এমন মনে করাও কঠিন। সুতরাং নব্যকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ প্রবর্তনে তাঁর পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের এই রচনাটি থেকে কিছু প্রেরণা লাভ করা একেবারে অসম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে আর-একটি সম্ভাব্য প্রেরণাস্থলের কথাও মনে রাখা উচিত। এ কথা সকলেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি, বিশেষতঃ তার ছন্দসৌন্দর্যের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। তার বাল্যরচিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ছন্দো-বৈচিত্র্য এই আকর্ষণেরই প্রত্যক্ষ ফল। তার আর-এক ফল তাঁর সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' গ্রন্থের প্রকাশ (১২৯২ বৈশাখ)। গোবিন্দদাস বলরামদাস -প্রমুখ ছন্দোবিলাসী কবিদের অনেকগুলি নৃত্যঝংকৃত রচনাই এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এইসব আধা-জয়দেবী কলাবৃত্ত রচনার ছন্দোমাধুর্যে রবীন্দ্রনাথের কান অর্থাৎ শ্রুতিরুচি এমনই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, কোনো-না-কোনো সময়ে তাঁর নিজের রচনাতেও তার প্রতিফলন ঘটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার দুটি অন্তরায়ও ছিল। এক তার ব্রজবুলি ভাষা, আর তার সংস্কৃত কায়দার উচ্চারণ। এই দুই কৃত্রিমতাই পদাবলীর ছন্দকে বাংলায় চালাবার প্রধান বাধা।

'পদরত্নাবলী' প্রকাশের (১২৯২ বৈশাখ) মাসকয়েক পরেই ঈশ্বরচন্দ্রের 'কবিতাসংগ্রহ' গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র 'বোধেন্দুবিকাস'এর ওই ঝংকারবহুল রচনা-দুটির প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন (১২৯২ আশ্বিন ১৫)। এই দুটি রচনার দ্বিতীয়টিতে নব্যকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ যে অনবদ্য সুষমায় বিলসিত হয়ে উঠেছে তা রবীন্দ্রনাথের অব্যর্থ ছন্দশ্রুতিকেও এড়িয়ে গেল, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। এ রচনাটিতে ব্রজবুলি ভাষা ও সংস্কৃত ভঙ্গির উচ্চারণ কোনো বাধাই ঘটাতে পারে নি। সংস্কৃত ও ব্রজবুলি -বিহারী প্রাচীন কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দোরীতি এই রচনাটিকে আশ্রয় করেই নবজন্ম লাভ করল বিশুদ্ধ বাংলা-ভাষার নবজন্মভূমিতে। বিষয়টা যেন অনেকটা 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি' ধরণের। প্রাচীন ভাষা ও উচ্চারণের জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দোরীতির নিত্য ও শাশ্বত আত্মা বাংলা ভাষা ও উচ্চারণের নবদেহ ধারণ করল ঈশ্বরচন্দ্রের উক্ত গীতিরচনাটির সূতিকাগৃহে। অর্থাৎ 'কে রে বামা ষোড়শী রূপসী' ইত্যাদি রচনাটির আবির্ভাবের দ্বারা প্রাচীন ভাষা ও উচ্চারণের বাধা কেটে গিয়ে বাংলায় নব্যকলাবৃত্ত ছন্দোরীতি প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত হল। ঈশ্বরচন্দ্রের 'কবিতাসংগ্রহ' গ্রন্থের বঙ্কিমলিখিত ভূমিকাযোগে এই রচনাটির সুপ্রচারহেতু মনে হয় এটির ছন্দোগত অভিনবত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। আর তা হলে তাঁর পক্ষে এর থেকে প্রেরণা পাওয়াও কিছু অসম্ভাবিত ব্যাপার নয়।

'পদরত্নাবলী' সম্পাদনকালে বৈষ্ণব কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পুনরুজ্জীবিত ঔৎসুক্য, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশস্তিযোগে ঈশ্বরচন্দ্রের উক্ত রচনাটির ছন্দোগত অভিনবতা থেকে প্রেরণালাভের সম্ভাবনা এবং 'বিরহ' ও 'ভুলভাঙা' কবিতাযোগে নব্যকলাবৃত্ত রীতির প্রবর্তন, এই তিনের পৌর্বাপর্য ও কালগত সান্নিধ্যের কথাই আমরা বলতে পারি। এগুলির মধ্যে কার্যকারণসম্বন্ধ থাকার সম্ভাবনার কথাও বলতে পারি। কিন্তু কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মতো সংশয়াতীত তথ্য উপস্থাপন করতে পারি না।

নব্যকলাবৃত্ত রীতি প্রবর্তনের প্রেরণাস্থল যা-ই হক না কেন, রবীন্দ্রনাথ এ কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন ক্রমে ক্রমে অতি ধীর গতিতে। প্রথমেই প্রবলবেগে বা ব্যাপকভাবে এই নূতন রীতির প্রয়োগ করেন নি। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'বিরহ' এবং 'মানসী' কাব্যের 'ভুলভাঙা', নূতন রীতির এই প্রথম দুটি কবিতাতেই তার নিদর্শন আছে। এই দুটি রচনায় যুক্তাক্ষরসূচিত রুদ্ধদলের বিরলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অল্প বয়সে ছয়মাত্রা পর্বের সমস্ত রচনাতেই যুক্তাক্ষরওয়ালা শব্দ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। কেননা, ওসব যুক্তাক্ষরই ছন্দকে বন্ধুর ও তার ধ্বনিকে শ্রুতিকটু করে তোলে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

> 'বিশ্বের' মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
> কাঁদিতেছে 'বঙ্গ'ভূমি,
> গান গেয়ে কবি জগতের তলে
> স্থান কিনে দাও তুমি।
> একবার কবি মায়ের ভাষায়
> গাও জগতের গান—
> সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়,
> ঘুচে যায় অপমান॥
>
> —'কড়ি ও কোমল', আহ্বানগীত

এর প্রথম পংক্তিতে যুক্তাক্ষরজাত রুদ্ধদল আছে দুটি— বিশ্‌ ও বঙ্‌। এই দুটি রুদ্ধদলই নিরেট উপলখণ্ডের মত উদ্ধত হয়ে ছন্দের মসৃণ গতিতে বাধা সৃষ্টি করছে। এইজন্যই কবি এইজাতীয় যুক্তাক্ষরকে সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। পরবর্তী তিন পংক্তিতে ওরকম যুক্তাক্ষরজাত রুদ্ধদল একটিও নেই। ফলে ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহও মসৃণ গতিতে অবাধে বয়ে চলেছে। কিন্তু ওরকম রুদ্ধদলের অভাবে ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহ নিস্তরঙ্গ একঘেয়ে হয়ে ওঠে। এটাও একটা দুর্বলতা। এক দিকে যুক্তাক্ষরজাত বন্ধুরতা, অপর দিকে যুক্তাক্ষরহীন নিস্তরঙ্গ একঘেয়েমি— এই উভয়সংকট থেকে ছয়মাত্রা পর্বের ছন্দকে কিভাবে মুক্ত করা যায়, এই ছিল তৎকালে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সমস্যা। 'কড়ি ও কোমল' রচনার কালেই তিনি এই সমস্যার মীমাংসা করলেন উক্তপ্রকার রুদ্ধদলকে একমাত্রার বদলে দুই মাত্রার মর্যাদা দিয়ে। ও কাব্যের 'বিরহ' কবিতাটিতেই তার প্রথম পরীক্ষা। যেমন—

> কত শারদ যামিনী যাইবে চলিয়া
> 'বসন্ত' যাবে চলিয়া।
> কত উঠিবে তপন আশার স্বপন
> প্রভাত যাইবে ছলিয়া॥
> . . . .
> ওই বাঁশি-স্বর তার আসে বারবার
> সেই শুধু কেন আসে না।

এই হৃদয়-আসন 'শূন্য' যে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা॥

—'কড়ি ও কোমল', বিরহ

এর চার পংক্তিতে যুক্তাক্ষরসূচিত রুদ্ধদল আছে মাত্র দুটি— 'বসন্ত' শব্দের সন্ এবং 'শূন্য' শব্দের শূন্। কিন্তু তাতে ছন্দোমাধুর্য কমে নি, বরং বেড়েছে। কারণ এখানে প্রত্যেক রুদ্ধদলকে দুই মাত্রার মূল্য দেওয়া হয়েছে। পূর্বের দৃষ্টান্তে বিশ্ ও বঙ্ যে শ্রুতিকটুতা ঘটিয়েছে, এখানে সন্ ও শূন্ তা ঘটায় নি। প্রথম দৃষ্টান্তে রুদ্ধদল ছন্দকে করেছে বন্ধুর, আর এখানে করেছে তরঙ্গিত। কারণ প্রথমটিতে রুদ্ধদল কুঞ্চিত ও নিরেট হয়ে নিয়েছে একমাত্রার স্থান, আর দ্বিতীয়টিতে বিস্তৃত হয়ে পেয়েছে দুই মাত্রার স্থান। তাতেই ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রসন্নতা দেখা দিয়েছে। তেমনি ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বোদ্ধৃত দুটি কবিতার প্রথমটিতে 'হুহুঙ্কার রবে', 'বিপক্ষ নাশিছে' ও 'লাবণ্য গলিছে', এই তিন পর্বের রুদ্ধদলগুলি যেন পথের মধ্যে অনাবশ্যক ইঁটপাটকেলের মতো মাথা উঁচু করে ছন্দের অবাধ গতিকে ব্যাহত করছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কবিতাটির 'গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্তি, চরণে কৃত্তিবাস', এই তিন পর্বের রুদ্ধদলগুলি যেন ছন্দের তরল গতিপ্রবাহকে আঘাতে আঘাতে তরঙ্গিত করে তুলছে। প্রথমটিতে রুদ্ধদল নিরেট ও কুঞ্চিত, দ্বিতীয়টিতে স্ফীত ও প্রসারিত।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত 'বিরহ' কবিতাটিতে দ্বিমাত্রক রুদ্ধদল আছে মাত্র তিনটি, আর 'মানসী' কাব্যের 'ভুলভাঙা' কবিতায় আছে ছয়টি। 'ভুলভাঙা'র পূর্বে রচিত 'ভুলে' কবিতায় একটিও নেই। বস্তুতঃ নব্যকলাবৃত্ত রীতির রচনায় দ্বিমাত্রক রুদ্ধদলের এই বিরলতা দেখা যায় 'মানসী' কাব্যের অনেক কবিতাতেই। অর্থাৎ 'মানসী' কাব্যে এই রীতির প্রথম প্রবর্তন হলেও এই কাব্যের সর্বত্র তাব পূর্ণশক্তি প্রকাশ পায় নি। নব্যকলাবৃত্ত রীতির পূর্ণশক্তি প্রকাশ পেয়েছে 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যের রচনাগুলিতে।

ঈশ্বরচন্দ্র ও রামপ্রসাদ

অথচ ঈশ্বরচন্দ্রের 'কে রে বামা ষোড়শী রূপসী' ইত্যাদি দ্বিতীয় রচনাটিতে নব্যকলাবৃত্ত রীতি তার পূর্ণশক্তি ও সৌন্দর্য নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে। পরিপূর্ণ শক্তি ও সৌন্দর্যের এই আকস্মিক আবির্ভাবটা সত্যই বিস্ময়কর। এ যেন অনেকটাই—

'যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।'

বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় এই নূতন ছন্দোরীতির ক্রমপরিণতির কোনো নিদর্শন নেই। বৈষ্ণব গীতি-সাহিত্যের, বিশেষতঃ ব্রজবুলি গীতিকবিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর সংগৃহীত কবিদের জীবনবৃত্তান্তে কোনো বৈষ্ণব গীতিকবির নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই, তাঁদের রচনা-সংকলন তো দূরের কথা। সুতরাং তিনি যে বৈষ্ণব কবিদের কাছ থেকে নব্যকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ রচনার প্রেরণা পান নি তাতে বোধ করি কোনো সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যে তাঁর বহুপ্রশংসিত

'অদ্বিতীয় মহাকবি' 'মহাত্মা' রামপ্রসাদের 'ভগবতীর রণবর্ণনাঘটিত পদাবলী' থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে। তিনি এই রণগীতিগুলির যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তা পূর্বেই যথাস্থানে উদ্ধৃত হয়েছে। কলাবৃত্ত রীতির আলোচনাপ্রসঙ্গে রামপ্রসাদের রণগীতি থেকে যে তিনটিমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলির সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের উক্ত দুটি রণগীতির ভাষা মিলিয়ে দেখলে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রেরণার উৎস কোথায় তা অনায়াসেই বোঝা যাবে। তবু পাঠকের সুবিধার জন্য এই ভাষাগত সাদৃশ্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচে সাজিয়ে দিলাম।—

ঈশ্বরচন্দ্র	রামপ্রসাদ
প্রথম রচনা	পদাবলী
১। কে রে বামা 'বারিদবরণী'	আরে ঐ আইল কে রে 'ঘনবরণী' —আরে ঐ আইল
২। হের হে ভূপ, কি অপরূপ	হেরি এ কি রূপ, দেখ দেখ ভূপ সুধারসকূপ বদনখানি। —ও কে রে মনোমোহিনী মরি কিবা অপরূপ নিরখ দনুজভূপ। —কে মোহিনী
৩। হাসিছে ভাসিছে 'লাজ না বাসিছে'	কি সুখে হাসিছে, 'লাজ না বাসিছে', নাচিছে মহেশ উরসে। —বামা ওকে এলোকেশে কে রে নবীনা নগনা লাজরহিত। —আরে ঐ আইল
৪। গ্রাসিছে বারণ হয়	গজরথরথী করত গ্রাস —ফুলবালা উলঙ্গ রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে, রথরথী সারথি তুরঙ্গ গরাসে। —মরি, ও রমণী কি সমর করে রথরথী গজবাজী বয়ানে পূরে —শ্যামা বামা কে

দ্বিতীয় রচনা

১। কে রে বামা ষোড়শী রূপসী
স্বরেশী এ যে, নহে মানুষী,
'ভালে শিশু শশী'· ·

কে মোহিনী 'ভালে বালশশী'
পরম রূপসী।
·· ·· ··
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
—কে মোহিনী

তড়িতজড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিত কুচ অপ্রকাশ্য,
'ভালে শিশুশশী'।
—শ্যামা বামা গুণধামা

২। · ·করে শোভে অসি,
'রূপ মসী', চারুভাস।

···বামকরে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর যাচে অভয় বর,
বরাঙ্গনা 'রূপ মসী'॥
—এলো চিকুরনিকর

৩। যে দেখি পর্ব, যে ছিল গর্ব,
হইল খর্ব, গেল রে সর্ব,
· ·করিছে সর্বনাশ।

মম সর্ব গর্ব খর্ব করে
এ কি সর্বনাশী।
—শ্যামা বামা গুণধামা

ভালো করে খুঁজলে দুজনের রচনার মধ্যে আরও সাদৃশ্য বার করা যেতে পারে। কিন্তু আর প্রয়োজন নেই। আশা করি এখন আর কোনো সন্দেহ নেই যে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রিয় কবি রামপ্রসাদের রণগীতিগুলির আদর্শে এবং সেগুলি থেকে নানাভাবে ভাব ও কথা আহরণ করেই বোধেন্দুবিকাসের ওই দুটি রণগীতি রচনা করেছিলেন। শুধু ভাব ও ভাষা নয়, অলংকার ও ছন্দ রচনাতেও তিনি এ ক্ষেত্রে রামপ্রসাদেরই অনুবর্তী। বস্তুতঃ রচনার গুণদোষের বিচারেও দেখা যায় তিনি রামপ্রসাদেরই উত্তরাধিকারী। এই অনুবর্তন ও উত্তরাধিকার এতই ব্যাপক যে, ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিদুটি রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও প্রায় সমভাবেই প্রযোজ্য বললে খুব অন্যায় হয় না। উক্তিদুটি এই।—

১। "ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা-সরহদ্দ নাই, একবার অনুপ্রাস-যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোনো দিগে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে।"

২। "ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তাঁহার যেমন গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে— যখন অনুপ্রাস-যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছিলেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখেন নাই।"

—'কবিতাসংগ্রহ' : ভূমিকা, পৃ ৭২ এবং ৭৪

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার 'দোষগুণের উদাহরণস্বরূপ' বঙ্কিমচন্দ্র বোধেন্দুবিকাস থেকে যে-দুটি গীত উদ্ধৃত করেছেন, আমরা দেখলাম সে-দুটি রামপ্রসাদের বিভিন্ন রণগীতির প্রতিধ্বনি মাত্র— ভাবে ভাষায় ছন্দে ও অলংকারে। সুতরাং

"শব্দব্যবহারে তিনি [ঈশ্বরচন্দ্র] অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগিশূন্য অধিপতি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য উনবিংশ শতক সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও বাংলা সাহিত্যের সর্বকাল সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলে মনে করি না। শব্দব্যবহারে ঈশ্বরচন্দ্র অদ্বিতীয় নন, দ্বিতীয়। প্রথম রামপ্রসাদ। শব্দ-প্রয়োগে তাঁর কোনো প্রতিযোগী না থাকতে পারে, কিন্তু তিনি নিজেই ছিলেন রামপ্রসাদের প্রতিযোগী। এ ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র অনুবর্তক মাত্র, প্রবর্তক রামপ্রসাদ। শব্দ ও শব্দালংকার -প্রয়োগে অনুবর্তক অনেকাংশে প্রবর্তককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, এ কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু ছন্দোনৈপুণ্যে শিষ্য যে গুরুকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

'তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ'

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

> "বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়! তার মানে, গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলনসংগীতে বদ্-সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে-বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন— দুইয়ে মিশে আছে।"[১]

প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ। আকাশ বাতাস রৌদ্র জ্যোৎস্না পাহাড় নদী মেঘ সমুদ্র ইত্যাদির সমন্বয়ে আমাদের জীবনের যে একটি দৈব বাতাবরণ রচিত হয়েছে, তার সবকিছুকেই তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর বৃক্ষানুরাগ সেই সার্বিক ভালোবাসারই একটি অভ্রান্ত অভিজ্ঞান। রবীন্দ্ররচনার আদ্যন্ত সেই অভিজ্ঞান ছড়িয়ে আছে; তাঁর সাহিত্যসাধনার যে-কোনও অধ্যায়ে যে-কোনও পর্যায়ে তাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি। কান পাতলেই শুনতে পারি, বৃক্ষলতা সম্পর্কে এক আশ্চর্য ভালোবাসা তাঁর কণ্ঠে সর্বদা ধ্বনিত হয়েছে।

আমরা কান পেতে সেই ভালোবাসার সুর শুনি; কবি সেক্ষেত্রে 'প্রাণ পেতে' গাছের মধ্যেকার প্রাণের বিশুদ্ধ সুরটিকে গ্রহণ করবার পক্ষপাতী ছিলেন। উপরন্তু বৃক্ষকে যে শুধুই মানবজীবনের অপরিহার্য সঙ্গী-রূপে তিনি জেনেছিলেন তা নয়, সৃষ্টির বিবর্তনের ইতিহাসে বৃক্ষলতার ভূমিকার প্রাচীনতাও তাঁকে আনন্দে-বিস্ময়ে আলোড়িত করেছে। সেই বনেদী ভূমিকাটিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে তাঁর কুণ্ঠা হয় নি।

> অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
> প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ;
> ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
> ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে; আনিলে বেদনা
> নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।[২]

বৃক্ষ তাঁর কাছে মৃত্তিকার 'বীর সন্তান'; তার শাখাকে তিনি 'সংগীতের আদিম আশ্রয়' বলে গণ্য করেন; তিনি স্বীকার করেন, 'বীর্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্যে' শক্তির শান্তিরূপ যে দেখাতে পেরেছে, সে এই বৃক্ষ; তারই কাছে তিনি শান্তিদীক্ষা নিতে চান; এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, বৃক্ষই এই বসুন্ধরাকে 'অনন্তযৌবনা' করে সাজাতে পেরেছে।

বৃক্ষকে কেউ ভালোবাসে ফুলের জন্য, কেউ ফলের প্রত্যাশায়। সেক্ষেত্রে তাকে যিনি 'মৌনের মহাবাণী'র উদ্‌গাতা বলে জেনেছেন, কোনোরকম প্রত্যাশা না-রেখেও তাঁর পক্ষে হয়তো বৃক্ষকে শ্রদ্ধা

১ ভূমিকা। 'বনবাণী'   ২ বৃক্ষবন্দনা। 'বনবাণী'

১৯২৬ সালে হাঙ্গেরীর সাগর বালাতন হ্রদের তীরে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রোপিত বৃক্ষচারা মহীরুহে পরিণত
সম্মুখে স্তম্ভের উপর রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তি

A FAÜLTETÉS EMLÉKÉRE
A NAGY HINDU KÖLTŐ AZ ALÁBBI VERSET IRTA
A FÜREDI VENDÉGKÖNYVBE

„When I am no longer	magyar
on this earth my tree	fordítása
Let the ever renewed	*Ha nem vagyok többé a földön Ó fám*
leaves of thy spring	*[illegible]*
Murmur to the wayfarer	*[illegible]*
The poet did love while he lived	*[illegible]*

8 November 1926 Rabindranath Tagore

১৯২৬ সালের ৮ নভেম্বর অতিথিদের মন্তব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত কবিতা

RABINDRANATH TAGORE
A NAGY HINDU KÖLTŐ
ÜLTETTE EZT A FÁT
1926 NOVEMBER 6-ÁN
ANNAK EMLÉKÉRE HOGY
BALATONFÜREDEN
NYERTE VISSZA EGÉSZSÉGÉT.

ফলকের ভাষ্য : 'নিজ স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের স্মরণে মহান ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬ সালের ৬ নভেম্বর বালাতন ফুরেডে এই বৃক্ষ রোপণ করেন।'

নিবেদন করা সম্ভব। শুধু বর্ণাঢ্য ফুল কেন, নিরলঙ্কার পাতাগুলিকেও তিনি ভালোবাসতে পারেন। তিনি বলতে পারেন :

ফুলগুলি যেন কথা,
পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা ॥[৩]

যদি বলি যে, পত্রাবলীর নৈঃশব্দ্য যেমন পুষ্পের বাঙ্ময়তাকে আরও পরিস্ফুট করে তোলে, সমগ্র বিশ্ব-জগৎও তেমনি বিশ্ব-চরাচরের বাঙ্ময়তাকে আরও তাৎপর্য দেবার জন্যই তার একটি শান্ত পশ্চাৎপট রচনা করে রেখেছে, তাহলে হয়তো খুব অসঙ্গত কিছু বলা হবে না। রবীন্দ্রনাথ সেই শান্ত পটভূমিকাতেও, বৃক্ষশাখায় যখন হাওয়ার মর্মর ওঠে, 'বিশ্ববাউলের একতারা' শুনতে পেয়েছেন। বৃক্ষের কাছে তিনি যেমন 'শান্তিদীক্ষা' নিতে চেয়েছেন, তেমনি আবার তার উতরোল মর্মর-সংগীত শুনে, তার পত্রালির সানন্দ আন্দোলন দেখে, তারই কাছে মুক্তির মন্ত্র প্রার্থনা করেছেন। বলেছেন, ওই গাছগুলোর "মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।"[৪]

বৃক্ষলতাপত্রপুষ্পের সঙ্গে একদিকে তাঁর সম্পর্ক ছিল জীবনের গভীরতম উপলব্ধিতে অনুস্যূত; অন্য দিকে সেই সম্পর্ক ছিল ঘরোয়া। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনকে আরও সরস আর মধুর করবার প্রয়োজনেই প্রকৃতির সঙ্গে একটি খোলামেলা আটপৌরে হার্দ্য সম্পর্কও তিনি গড়ে নিয়েছিলেন। সম্পর্ক যাতে সহজ হয়, তারই জন্য বিদেশী বৃক্ষ কিংবা লতার স্বদেশী নাম রাখতেন তিনি, এবং এইভাবেই তার বিদেশিয়ানা ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে ঘরের জিনিস করে নিতেন। দৃষ্টান্ত 'নীলমণিলতা'। কবিতাটির ভূমিকায় তিনি বলছেন, "শান্তিনিকেতন-উত্তরায়ণের একটি কোণের বাড়িতে আমার বাসা ছিল। এই বাসার অঙ্গনে আমার পরলোকগত বন্ধু পিয়র্সন একটি বিদেশী গাছের চারা রোপণ করেছিলেন। অনেককাল অপেক্ষার পরে নীলফুলের স্তবকে স্তবকে একদিন সে আপনার অজস্র পরিচয় অবারিত করলে। নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের বাণী আমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমাকে ডাক দিয়ে বারে বারে স্তব্ধ করেছে। আমার দিক থেকে কবিরও কিছু বলবার ইচ্ছে হত কিন্তু নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলে না। তাই লতাটির নাম দিয়েছি নীলমণিলতা।"[৫]

নীলমণিলতাকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তুমি সুদূরের দূতী, নূতন এসেছ নীলমণি"। কিন্তু তখন নূতন এলেও, অনুমান করা যায়, সে নূতন থাকে নি। বিদেশ থেকে কত বৃক্ষই তো এসেছে

---

৩ লেখন। ৪ ভূমিকা। 'বনবাণী' ৫ নীলমণিলতা। 'বনবাণী'

এ-দেশে; তাদের অনেকেই আর আজ নূতন নয়। এমনকি, এ-দেশের রৌদ্র-হাওয়া-জল থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে এ-দেশের দৃশ্যপটে তারা এতই সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মিলিয়ে দিয়েছে যে, কখনও যে তারা নূতন ছিল, তাও আর আজ অনেকের মনে পড়ে না। কিন্তু সে-কথা থাক। যে-কথা বলবার তা এই যে, কী গভীর মমতায় যে বৃক্ষলতার জগৎকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে গ্রহণ করেছিলেন, বিদেশী লতার এই স্বদেশী নামকরণ থেকেও তা বুঝতে পারা যায়।

বৃক্ষ-লালনে তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। এবং বৃক্ষ-রোপণও তাঁর কাছে ছিল ধর্মাচরণের মতই পবিত্র একটি অনুষ্ঠান। এমন কি, বিদেশেও একাধিকবার সেই অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছেন। ১৯১৬ সনের ডিসেম্বর মাসে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি স্বহস্তে একটি বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন।[৬]

১৯২৬ সনের ইউরোপ-সফরের সঙ্গেও বৃক্ষ-রোপণের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে। সফর-সূত্রে সেই বছর অক্টোবর মাসের শেষে তিনি হাঙ্গারিতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্য বিকল হয়ে পড়ে, এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে দিন কয়েক তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হয়। বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তখন তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন বালাতন হ্রদের তীরে। হাঙ্গারির সেটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস। সেইখানে একটি বৃক্ষচারা রোপণ করেছিলেন তিনি।[৭] সেই শিশুতরু আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

বিদেশে গিয়েও বৃক্ষ-রোপণের আনন্দ-অনুষ্ঠানে নিজেকে যখন তিনি সাগ্রহে যুক্ত করেছেন, ভাবতে ভালো লাগে যে, বাংলা দেশের ঘরোয়া প্রকৃতির চেনা বাতাবরণের হাতছানি তখনও তাঁকে উন্মনা করে তুলত। ভাবতে ভালো লাগে, হাঙ্গারিতে পৌঁছবার মাত্র কয়েকদিন আগে (২৩ অক্টোবর ১৯২৬) ভিয়েনার 'হোটেল ইম্পীরিয়ল'এ বসে 'বনবাণী'র ভূমিকা লিখেছিলেন তিনি। দেখে ভালো লাগে যে, সেই ভূমিকার মধ্যেও তাঁর পরিচিত বৃক্ষলতার ছায়া পড়েছে।

"এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জানালার কাছে বসে কত দিন মনে করেছি, শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দরূপ আমি দেখব আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম-প্রৈতির বন্ধবিহীন প্রকাশরূপ দেখব সেই নাগকেশরের ফুলে ফুলে।· ·এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময়—তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ—অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দামবেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়। কোলাহল থেকে সংগীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম তখন মনে পড়ে গেল, সেই সংগীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে—তাদের কাছে চুপ করে বসতে পারলেই সেই সুরের নির্মল ঝরনা আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে।"[৮]

---

৬ "পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়া পথে পেনসিলভেনিয়া স্টেটের প্রধান শহর—Pittsburghএ ন্যাশনালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। ক্লেভল্যাণ্ডে তাঁহাকে একবার নামিতে হইল; সেখানে Shakespeare Gardenএ কবিকে নিজ হাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়; বক্তৃতাও করিতে হইয়াছিল।" 'রবীন্দ্রজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৪৪২।

বস্তুত এই 'বৃক্ষ'টি একটি আইভিলতা। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ সংখ্যায় চিত্র দ্রষ্টব্য।

৭ "হাঙ্গারি বাসকালে· ·তথাকার সাহিত্যিকগণের অনুরোধে হাঙ্গারির বিখ্যাত কবি Karoly Kisfaludyর (১৭৮৮-১৮৩০) মর্মর মূর্তির·নিকট রবীন্দ্রনাথকে একটি বৃক্ষরোপণ করিতে হইয়াছিল"। 'রবীন্দ্রজীবনী', তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৯৮।

৮ ভূমিকা। 'বনবাণী'

যুগের শিল্প

অমিয় চক্রবর্তী

প্রকাশের গভীর সহজ ভঙ্গী শুধু বাংলায় নয়, বর্তমান যুগের বিবিধ দেশীয় সাহিত্যে লক্ষণীয়। সেইদিক থেকে বলা চলে শব্দের অতিমাত্রা, পৌরাণিক বা নবযুগের দামামাধ্বনি শিল্পের বহির্গত। বীটনিকের পশ্চিমী বাক্যস্রোত নতুন যুগে অবান্তর : মিলটনের গরিমা তাতে নেই, শুধু ঘোষণা বিদ্যমান। সংস্কৃত-বহুল জটিল শব্দবিলাস বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতিহীন ; প্রচারের অজস্রত্বে ধরা পড়ে প্রয়াস, ছড়িয়ে থাকে কথার নুড়ি। প্রাণপ্রবাহিণী উৎকর্ষের ধারা অন্য।

চতুর্দিকের জাগ্রত শিল্পজগতে দেখতে পাই বৈরল্যের আঙ্গিক। নতুন ইস্পানি মার্কিনি চীনজাপানি যে-কোনো কবিতার বই খুললে মনে হয় কাব্যের পৃষ্ঠায় অক্ষরেব ভার স্বল্প। কাব্যিক বা রাষ্ট্রিক প্রপাগাণ্ডার কথা বাদ দিচ্ছি। নতুন বাড়ি বানানোর ছাঁদে, এমনকি বিরাট স্থাপত্যের গঠনে দেখি ঋজুতার আমেজ। কাঠে পাথরে কাঁচে সংহতির উদ্যম। হোক সে চণ্ডিগড়, জাকার্তার আধুনিক পাড়া, অপেক্ষাকৃত প্রাচীনের শেষতম অনুকরণে গাঁথা ডামাস্কাসের বা কাইরোর পুনরুজ্জীবিত নগর রচনা। ন্যুইয়র্কে বিরাট নতুন দৈত্য বাড়ি ঊর্ধ্বাকাশে হাল্কা হয়ে দাঁড়াতে চায় ; অন্ততপক্ষে নতুন শৈলীর প্রেরণা সেই আঙ্গিকে। ছবির জগতে দেখি প্রাচুর্যের ঠাট সঙ্গত হয়েছে মাধুরীর কঠিন রেখাপাতে, রঙের ব্যঞ্জনায়। সূক্ষ্মের মধ্য দিয়ে প্রবলকে উদ্ধৃত ক'রে ইতালির চিত্রী আনন্দিত। মার্কিনেও তাই, ভারতবর্ষের নতুন প্রাচীন দৃষ্টান্ত আরো দেবো। শ্রুতি-জালের প্রচ্ছন্ন বা আপাত অনির্দিষ্ট বিন্যাসে দূর থেকে ক্যাস্টানেট বা ড্রাম বেজে ওঠে পশ্চিমী সংগীতে ; মধ্যে মধ্যে বাঁশির ধ্বনিতে বাঁধা অনেকখানি স্তব্ধতা। ভেবে দেখুন, য়ুরোপীয় অর্কেস্ট্রার বিরাট আয়োজনে এ কোন্ নতুন পর্ব। ভারতীয় বীণার তান, ঝালার কাজের প্রভাব শেষ পর্যন্ত এ দেশেও দেখা দিল। আরণ্য আফ্রিকার রূঢ় কোমল উচ্চারণ বাদ্য পশ্চিমে প্রবেশ করেছে নিগূঢ় নৃত্যবাহন ছন্দে, অথচ সিম্ফনির মূল ধুয়োয় প্রমিত হয়ে। উগ্রজাতীয় jazz-এর সপক্ষে নয় উল্টো পথে এই অনুপ্রেরণা ; পশ্চিমী নূতন মার্গসংগীতের কথা বলছি। এমনকি jazz এবং রক্ অ্যাণ্ড রোলের তাণ্ডব-লোকে রবিশঙ্কর, আলি আকবর খাঁয়ের দূর প্রভাব পৌছল ; তার আলোচনা এখানে নয়। শুধু উল্লেখ করি, রাশিয়ান সংগীতস্রষ্টা Shostakovitchএর সঙ্গে একবার মস্কৌএ কথা হয়েছিল ; ফরাসী Ravel, Debussy এবং মার্কিনি Gershwinএর পূর্বদেশীয় ও আফ্রিকান্ প্রভাবান্বিত সংগীতের তারিফ করে তিনি বললেন ঐ মিশ্র ধারাই এগিয়ে চলবে। ঘটা ক'রে আন্তর্জাতিকতার বাদ্য বাজে না এই রকমের আশ্চর্য স্বীকৃতি তাঁর কথায় ছিল ; অন্তরঙ্গ মিলের ক্ষেত্র ভিড়ে ধরা দেয় না। সংগীতের কানে শোনা চাই মিলনের সূত্র।

যে ভাবেই দেখি, পৃথিবী জুড়ে একটি সূক্ষ্মচেতন শমিত সৃষ্টিবিদ্যার পথে আমরা চলেছি। সঙ্গে সঙ্গে সংহার এবং স্থূলতার ছায়াও চলেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভিয়েৎনামে যতই অনাসৃষ্টি চলুক-না কেন মানুষের যথার্থ সৃষ্টি সেই সমবেত যান্ত্রিক এবং পাশবিক অভিরুচিকে ছাড়িয়ে যাবে এ বিশ্বাস এখনো আছে। আংকোর্ভাট সাইগন থেকে বেশি দূরে নয়, বীর বন্ধুদলও সে কথা জানেন। যুগে

যুগে কম্বোডিয়ার শিল্পাক্ষর আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শুভ্রের সেই সাক্ষ্য প্রতিবেশীর এবং অভ্যাগতের বোমা-বারুদে চাপা পড়বে না।

বলা বাহুল্য, সংহতির প্রবণতা শিল্পে নতুন নয়, কিন্তু আজকের অভ্যাস বিশেষভাবে সূক্ষ্মতায় স্বীকৃত। বহুকাল থেকে চীনে বা জাপানে একটি পদ্ম বা দুটি বাঁশপাতার একাগ্র মূর্তি ছবির আকাশ জুড়েছে। নো-নাটকে প্রেক্ষাগার, আখ্যায়িকা নিপ্পনের অবিশ্বাস্য স্থিতপ্রজ্ঞ শিল্পে বিধৃত; যা নিভৃত তাই যেন একত্বে বিচিত্র হয়েছে। জেন্‌-ধ্যানের সংগতি এইখানে। আয়তন জাপানি প্রথায় কত স্বল্প প্রসাধিত হতে পারে য়ুরোপ তা প্রথমে দেখেও ধরতে পারে নি। তার পর চীন-জাপানের উত্তরসাধক ফরাসী শিল্পী সাকরেদ্‌ দল— এখানে নাম করা যায় Cezanne এবং অন্য প্রসঙ্গে Gaugin প্রভৃতি যোগধর্মী শিল্পীর— য়ুরোপ জুড়ে ছড়ালেন স্বচ্ছতার টেক্‌নিক। বস্তুভারাক্রান্ত শিল্প নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। ভার নামানোর বিদ্যা রঙ্গমঞ্চে চিত্রে চলচ্চিত্রে দূরতম এশিয়ার ইশারা বহন ক'রে পশ্চিম যুগে এসেছিল সন্দেহ নেই। তার ক্রিয়া থামে নি।

স্বীকার করতে হবে পৌরাণিক ভারতীয় শিল্প এবং সাহিত্য জড়ের বহু অত্যাচার সহ্য করেছে। য়ুরোপের অনুজ্জ্বল পর্বের মতো আমদের এপিকে মহাকাব্যে মন্দিরে বহুর বিরাট কীর্তন সহজিয়ার গভীর সন্ধান হারিয়েছিল। আজ পর্যন্ত আড়ম্বরের দৌরাত্ম্য পূজায় পার্বণে, কথকতায়, 'সাধু-ভাষা'র অসামঞ্জস্যে শিল্পের জায়গা জুড়ে আছে। অথচ প্রাচীন আর্যাবর্তে দেখি শিল্পসূত্রের ধ্যান; এমনকি মনু— হায় মনু— তাঁরও ভাবে না হোক বচনে সংযমের ছন্দ। ভারতীয় স্থাপত্যে ভাস্কর্যে অতিকথনের সাক্ষ্য অস্বীকার করব না— যদিও অত্যক্তি পুনরুক্তির পিছনে বিশেষ চিরন্তন উক্তিকে মানা চাই— কিন্তু পাশাপাশি প্রবর্তিত হল ঐতিহ্যের শ্লোক। তা না হলে সারনাথের বুদ্ধ, কাংগ্রার ছবি দেখা দিত না; বৈষ্ণব পদাবলী লিরিকের তারে বাঁধা না হয়ে দোহার স্রোতে বইত। গ্রীক পারসিক প্রভাব ভারতীয় চেতনাকে সমৃদ্ধ সমাহিত করেছে কিন্তু বৈদিক সত্তা তারও পূর্বগামী। মধ্যযুগের সন্ত কবির ও মীরার ভাষা রত্নোজ্জ্বল অথচ হৃদ্‌রঞ্জিত, কোমলে কঠিনে রচিত ভক্ত নামাবলীর স্বধার্মিক। গঙ্গা-যমুনার তীরে তীরে জেগেছে ভজনের আশ্চর্য স্বাল্পিক গূঢ় পূর্ণতা। যেমন পদ্মানদীর বাউল-সংগীতে, ময়নামতীর লোককাব্যে। পুরোনো কালীঘাটের এবং যামিনী রায়ের নব উদ্ভাবিত পট একই পথ প্রদর্শক। অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নিপুণ ছবি 'লজ্যন লঘুমায়া'র দক্ষ উদাহরণ, আচার্য নন্দলাল বসুর সংহত স্কেচের এবং চিত্রের অজস্রত্ব বিশ্বের শিল্পে অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের গানে, 'লিপিকা'য় তাঁর স্ফটিকশুভ্র ঘন নিবিষ্ট শিল্পের উদাহরণ।

স্থানীয়, জাতীয় বা ব্যক্তিবিশিষ্ট পরিমণ্ডলে যে শিল্পাগ্রহ সেদিন পর্যন্ত দূরলগ্ন বা অসংলগ্ন রূপে দেখা দিয়েছে আজ তার ছোঁয়াচ একই যুগে দ্রুত বিস্তারিত। জগৎজোড়া প্রচলনের কালে শিল্পের মূল অভ্যাস, এবং তার নূতন উৎসারিত বিধি প্রভূত অলংকরণের পরিপন্থী, এই কথা উপরে লিখেছি। বিজ্ঞাপনের পাতায় বা টেলিভিশনের কাঁচে— অথবা রাস্তায় বেরিয়ে হেঁটে— স্পষ্ট চোখে পড়ে শাড়ি কিমোনোর হাল্কা ঐশ্বর্য যা পশ্চিমী মেয়েদের ফ্যাশানে গরিমার হিল্লোল এনেছে। একান্ত হ্রস্বতার বেশ সেই পূর্বীয় প্রসাধনের কাছে লজ্জা পায়; উৎকর্ষের সমন্বয় ক্রমে দেখা দেবে। এয়ার-ইণ্ডিয়ার বিজ্ঞাপন সুরুচি এবং আধুনিক দৃষ্টির মর্যাদা বহন করে এদেশে প্রশংসিত হল। প্লেনের কর্মরত ভারতীয় নারীমূর্তি জাপানী বা

পশ্চিমী হোস্টেস্‌দের মতোই নম্র, সুন্দর। গৃহসজ্জায়, টালির রঙিন প্রাঞ্জল গাঁথুনিতে, নাইলনের বা নব সুগন্ধের মসৃণতায়, বাক্যের ঐশ্বর্যে আমরা খুঁজি বাহুল্যবর্জিত লক্ষণ। উৎকৃষ্ট ব্যবহারে আলাপে, বক্তৃতায় তৃপ্তি আনে হৃদয়ভরা অথচ অনুচ্চ স্পষ্ট আত্মপ্রকাশ, বেশির চেয়ে যা একটু কম। বাংলা কবিতায় আমরা কম্‌তির জাদু মেনেছি। যেখানে কথার প্রসাধন ঘনঘটায় দেখা দেয়, আমরা বলি 'আভরণে আজি আবরণ কেন তবে'। কাব্যে ধ্যানের ভাব আনতে হলে অতিবন্দনার দরকার নেই।

সূক্ষ্ম-সচেতনার প্রকাশ স্বল্পতার আশ্রয় নেবে এমন বাধ্যতা নেই; দীর্ঘ সংহতিও একই ধর্মসঙ্গত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপে নাম করা যায় 'পৃথিবী' কবিতার (রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট' গ্রন্থে); সেখানে ঋক্‌-ধ্বনিময় দীর্ঘায়ত বন্দনা। কিন্তু বলিষ্ঠ, কালধর্মী অথচ শিল্প-সনাতন এই কারুসৃষ্টি নিখুঁত সমুদ্রশঙ্খের মতো একক, ধ্রুবপদের মতো তার ঐকধ্বনি। তবুও বলতে হবে এ রকম শিল্প বিশেষভাবে এবং সংকীর্ণ (অথচ সমৃদ্ধ প্রয়োগে) যুগ-সংশ্লিষ্ট নয়। ফ্রস্টের 'Nothing Gold Will Stay' Yeatsএর 'The Second Coming', রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম দিনের সূর্য', Eliotএর Four Quartetsএর কিছু স্তবক বিবিধ অর্থে নতুন কালের লক্ষণাক্রান্ত।

শহরের রাস্তায় দেখি ক্ষুদ্র নিপুণ নিয়ন-আলোর বাতি পরিচ্ছন্ন অথচ সহস্রদীপান্বিত মালায় জ্বলছে; হয়তো এই পথে এজরা পাউণ্ড হেঁটে যাবেন। রাজামহারাজার যোগ্য আয়োজন অথচ যুগের পথযাত্রী যে-কোনো দেশের সর্বজন-হিতার্থে আলোর এই প্রসন্ন সংহত পদাবলী রচনা। প্রত্যেকটি আলো স্পষ্ট ও সুন্দর। মাটির প্রদীপও জ্বালব কিন্তু প্রগল্‌ভ ধনবিলাসী ঝাড়লণ্ঠন এবং ধ্বংসোদ্ধত জমিদারী প্রাসাদের প্রভূত মর্যাদা এবং আত্মপ্রচার পৌরাণিক বা ভিক্টোরীয় মধ্যযুগের অজস্র বাক্য-বর্ষণের মতো এখন বন্ধ থাক্‌।

নর্থ হ্যাম্পটন
অগস্ট ১৯৬৬

ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ভারতী লাইব্রেরি, কলিকাতা ১২। কুড়ি টাকা।

সংস্কৃতি শব্দটি খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে-কোনো একটি জাতির অধ্যাত্ম ও বাস্তব জীবনে সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ যত ভাস্বর, তাহাদের সংস্কৃতিও তত প্রকাশমান ও প্রভাময়। জাতির প্রাণের প্রাঞ্জলতা ও প্রাচুর্য, মনের সুরুচি ও শালীনতাবোধ সংস্কৃতির পরিমাপ নির্দেশ করে এবং পরিচয় প্রদান করে। সংগীতে এবং চিত্রে, স্থাপত্যে এবং ভাস্কর্যে, কুটীরশিল্পে এবং কৃষিকার্যে জাতির সংস্কৃতিরই প্রকাশ দেখিতে পাই। এমনকি জাতির লৌকিক ব্যবহারে, দৈনন্দিন জীবনযাপনেও সংস্কৃতির পরিচয় প্রকাশিত হয়। এই কথাগুলি ভারতবর্ষের পক্ষে যত সত্য, হয়তো অন্যদেশের পক্ষে তেমন না হইতেও পারে। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সে দিন পর্যন্ত ধর্মই ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান অবলম্বন ছিল। ধর্মকে ভারতবর্ষের সর্বস্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতে প্রধানতঃ ধর্ম হইতেই সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। ধর্মই সংস্কৃতিকে সুবিকশিত করিয়াছে, ধর্মই সংস্কৃতিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য, বাস্তব জীবনে ইহার ব্যতিক্রমও দেখিতে পাই। যদিও ভারতবর্ষ সমস্ত কিছুকেই ধর্মের বাঁধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনের গতি ও প্রকৃতি অনুসারে তাহার লৌকিক ব্যবহারে ও দৈনন্দিন আচারে যে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে সাংস্কৃতিক মর্যাদা দিয়াও নিছক ধর্মমূলক বলিতে পারি না।

কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনো শেষকথা বলিবার সময় আসে নাই। শীঘ্র আসিবে বলিয়াও মনে হয় না। হারাপ্পা মাহেঞ্জদারোর সর্বনিম্ন স্তরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় নাই। আজ পর্যন্ত সেখানে প্রাপ্ত কীলক-লিপির পাঠোদ্ধারও কেহ করিতে পারেন নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে আস্থা স্থাপন করা যায় না। এমনকি এ বিষয়ে সায়নের ব্যাখ্যাও ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

অপর একটি বিষয়েও পণ্ডিতগণ কেহ উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব বিভাগ দিনের পর দিন যে নব নব আবিষ্কার করিতেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ ভারতীয় সভ্যতার একটা ধারাবাহিকতা আছে। কোনো সভ্যতাই একেবারে অবলুপ্ত হয় নাই। পরবর্তী সভ্যতার প্রবল স্রোতে তাহা মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। অনুসন্ধান করিলে বর্তমান সভ্যতার মধ্যেই তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। সুতরাং এই ঐতিহ্যপ্রবাহের অনুসরণে যতদূর অতীতে যাওয়া যায়, তাহার সন্ধান লইতে হইবে। পাণ্ডুরাজার ঢিবিকে হারাপ্পার তুল্য মর্যাদা দেওয়া হইতেছে। ঢিবির বয়স তিন হাজার হইতে পাঁচ হাজারে উঠিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি দেউলপোতা একেবারে পঞ্চাশ হাজারের কোঠায় গিয়া পৌছিয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব হয় পৃথিবীর প্রত্নবিদ্যা-বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া এই সমস্ত আবিষ্কারের মূল্যায়নের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে।

কিন্তু এই সমস্ত কর্তব্য অকর্তব্যের হিতোপদেশ দিয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া প্রকাশিত সঙ্কলনটিকে অবহেলা করা চলিবে না। মাত্র তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ নহে, সাধারণ লেখাপড়া জানা লোকেরও

পুস্তকখানি পড়িয়া দেখা দরকার। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করিতেছি। পণ্ডিতগণ গবেষকগণ পুস্তকখানির আলোচনা করুন। ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসধারার আবিষ্কারে অমূল্যচরণের সংকেত বিচারের ভার তাহাদের উপরেই বর্তিয়াছে।

অমূল্যচরণের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। এই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কিছু কম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মহামহোপাধ্যায় আচার্য হরপ্রসাদ 'মহাদেব' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পাঠ করেন। ব্রহ্মাকে লইয়া কিছু পরে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন হরপ্রসাদের কৃতী পুত্র ডক্টর বিনয়তোষ। দেখাদেখি বিষ্ণু বিষয়ে প্রবন্ধ অমূল্যচরণ পাঠ করিয়াছিলেন। আমি প্রত্যেকটি প্রবন্ধ পাঠের দিনেই উপস্থিত ছিলাম। সেসব দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। দ্বিতীয় সংস্করণ বিশ্বকোষ প্রকাশের সময় আমি নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদকমণ্ডলী-মধ্যে প্রবন্ধলেখক ও সংগ্রাহক রূপে কাজ করিতাম। সুতরাং মহাকোষ প্রকাশের সংবাদও জানি। এইজন্যেই অমূল্যচরণের কতকগুলি লেখা প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

অমূল্যচরণের অনুসন্ধিৎসা ছিল বহুমুখী। সন্ধানও তিনি রাখিতেন অনেক বিষয়ের। প্রবন্ধগুলির বৈচিত্র্যই এ কথার প্রমাণ দিবে। ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা, আর্য ও অনার্য, অসুর জাতি, বিষ্ণু, অগ্নি, অদিতি, ঋষি অত্রি, অথর্ববেদ, মহাভারত— প্রত্যেকটি প্রবন্ধই পড়িবার মত ও আলোচনার যোগ্য।

দর্শন ধর্ম ও সম্প্রদায় বিষয়েও বহু প্রবন্ধ এই সঙ্কলনে স্থান পাইয়াছে। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের অনেকের কথা তিনি বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। তাহার পর আছে নাটক ও নাট্যশালা। এই বিভাগে ভারতীয় নাটকের গোড়ার কথা, ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্রে নাটকের উৎপত্তি, বঙ্গীয় নাটকের গোড়ার কথা, ভারতীয় নাট্যশালার গোড়ায় কথা, রামগড়ের নাট্যশালা, বঙ্গীয় সাধারণ নাট্য-শালা, কন্নড় নাটক, কেরল নাটকচক্র, প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলা, যাত্রা, কবিগান— এই কয়টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে।

অমূল্যচরণের লিখিত প্রত্যেক প্রবন্ধেই কিছু-না-কিছু নূতন কথা আছে। তথ্যসংগ্রহে তিনি কিরূপ পরিশ্রম করিতেন, প্রতিটি প্রবন্ধেই সে পরিচয় পরিস্ফুট রহিয়াছে। সুতরাং প্রবন্ধগুলি শিক্ষার্থীগণেরও কাজে লাগিবে। তবে অমূল্যচরণের পরলোকগমনের পর বহু বিষয়েই অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং কোনো কোনো প্রবন্ধে অসম্পূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক। অথর্ববেদ বিষয়ে স্বর্গত পণ্ডিত দুর্গামোহন সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের আবিষ্কার এ কালের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যাত্রা ও কবি-গান বিষয়েও সম্প্রতি অনেকেই নূতন নূতন তথ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। ভাগবত ধর্ম, বৈষ্ণবের প্রেম প্রভৃতি বিষয়েও মতভেদের অবকাশ আছে। তথাপি অমূল্যচরণের গৌরবের লাঘব্ ঘটিবে না। তাঁহার পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না। সঙ্কলনগ্রন্থখানি বাঙ্গলা-সাহিত্য-ভাণ্ডারকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। অমূল্যচরণের জ্ঞানের পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিই তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। সুতরাং অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশেরও প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সেইসমস্ত প্রবন্ধ হইতেও আমরা অনেক বিষয় জানিতে ও শিখিতে পারিব।

সঙ্কলনখানির প্রধান গুণ ইংরাজী জানা অধ্যাপক এবং ছাত্রগণ একটি পুস্তকের মধ্যেই বহু বিষয়ের ও

অনেক অজানা বিষয়ের সংবাদ জানিতে পারিবেন। পশ্চিমের পণ্ডিতগণের রচনা অনুসন্ধানে ছুটাছুটি করিতে হইবে না। আর অল্প ইংরাজী জানা অথবা কেবলমাত্র বাঙ্গালা লেখাপড়া জানা অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহার মধ্যে মহামূল্য রত্নরাজীর সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন। তাঁহারা দেখা দূরের কথা, কস্মিন্‌-কালে যাহার নামও জানিতে পারিতেন না, সেইসমস্ত মূল্যবান বস্তু হাতের নাগালের মধ্যে পাইবেন। বাঙ্গালী পাঠকগণের পক্ষে ইহা বড় কম লাভের কথা নহে। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রকাশ যে আমাদের পক্ষে একটি সুসংবাদ ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি।

এই বৃহদাকার গ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করিয়াছি। মাত্র সামান্য একটু তুলিয়া দিতেছি। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিব অমূল্যচরণ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের রচনা হইতে বিষয়বস্তু আহরণ করিলেও তাঁহার মন ছিল ভারতীয় সাধনার মর্মমূলে। দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল ভারতীয়। ভারতসংস্কৃতির গোড়ার কথায় তিনি বলিতেছেন—

"ভারতবর্ষে লেখাপড়া ও সংস্কৃতি কোনদিন এক বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সংস্কৃতি ভারতের অন্তরের বস্তু, অক্ষরপরিচয়ে সাহিত্যজ্ঞান কোনদিন তাহার জ্ঞাপক ছিল না। এদেশে বিদ্যা কখনো Academic ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বিদ্যা তাহার অন্তরের সামগ্রী। দর্শনও কোনদিন বুদ্ধির পরিচয় জ্ঞাপক মাত্র হয় নাই— ইহা ছিল ভারতবাসীর প্রাণস্বরূপ। দর্শন ও ধর্ম কোন সময়ে এদেশে দুটি পৃথক বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ধর্মের গোড়ার কথাটি হইয়াছে সর্ববস্তুর মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ। সর্ববস্তু একটি অখণ্ড পূর্ণত্বের প্রকাশ মাত্র। তাহার Macrocosm ও Microcosm ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চতুঃষষ্টি শিল্পকলাও ধর্মের বাহন হইয়াছে। শিল্পকলা গ্রন্থেরও তাই নাম হইয়াছে শাস্ত্র। ধর্মের মত ব্যাপক শব্দও ভারতীয় ভাষায় আর নাই। ধর্ম সকলের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে ও তাহা সকলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সুতরাং এদেশে (ভারতে) কোনো বিদ্যা watertight compartmentএর মত হয় নাই। সর্ববিদ্যার শেষ বাণীই ধর্ম ; তাহাদের মধ্যে কোন বিভাগ বা বিদ্বেষ ঘটে নাই। ভারতে প্রাচীন যুগে তাই ধর্মকে বাদ দিয়া কাব্য হয় নাই, স্থাপত্য হয় নাই, শিল্প সৃষ্টি হয় নাই।"

পরিশেষে একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। অমূল্যচরণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত যিনি লিখিয়াছেন তিনি অনেকের পত্রের অংশ বিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। এইসমস্ত পত্রাংশে কতকগুলি প্রশ্ন রহিয়াছে। প্রশ্নগুলি দেখিলাম, কিন্তু উত্তরগুলি কোথায়? কোন্ প্রশ্নের কিরূপ উত্তর দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি যথাযথ হইয়াছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। কোন্ কোন্ প্রশ্নের উত্তর আদৌ দেওয়া হইয়াছিল কিনা এ সন্দেহেরও অবকাশ রহিয়া গেল। অমূল্যচরণ নানা কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন, বহু বিষয়ের আলোচনা করিতেন, এইজন্য নানা জনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে সব সময় সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিনবিহারী গুপ্ত। সম্পাদক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী, কলিকাতা-৯। মূল্য বারো টাকা।

দীর্ঘকাল পরে পুরাতন প্রসঙ্গ বইটি বার হওয়াতে প্রকাশক-সম্পাদক উভয়েই ধন্যবাদার্হ হলেন। পুরাতন প্রসঙ্গের এক-একটি অধ্যায় যখন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই পাঠককে কৌতূহলী করে তোলে। সে সময় পুরাতন প্রসঙ্গের বক্তব্য নিয়ে কিছু কিছু বাদ-প্রতিবাদও হয়েছিল। তখনকার দিনে পুরাতন প্রসঙ্গ যে পাঠকসমাজে আলোড়ন এনেছিল সে সম্বন্ধে সংশয় নেই। কারণ, পুরাতন প্রসঙ্গে এমন-সব সংবাদ আছে যা ইতিপূর্বে কারও জানা ছিল না। এসব অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের মূল্য সমাজেতিহাসের দিক থেকে অপরিসীম।

আজও সে মূল্য নিঃশেষিত হয় নি। বইটির পুনর্মুদ্রণ সেই কারণে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করবে। বিপিনবিহারী গুপ্ত নিছক কৌতূহলপরবশ হয়ে আচার্য কৃষ্ণকমলের কাছে সেকালের কথা শুনতে চেয়েছিলেন। বিপিনবিহারীর এই কৌতূহলই পরে ইতিহাস-জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়। কৃষ্ণকমল গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, ব্রহ্মমোহন মল্লিক, রাধামাধব কর, উমেশচন্দ্র দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর— এই আটজনের (প্রকৃতপক্ষে সাতজন নয়) কাছ থেকে বিপিনবিহারী গুপ্ত উনিশ শতকের বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে ব্রতী হন। অবশ্য কিছু কিছু জীবনচরিত এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ব্যতীত এই জাতীয় গ্রন্থ খুব বেশি ছিল না। সেজন্য বিপিনবাবুর পরিশ্রম সার্থক। আজ বিপিনবাবুর বহু তথ্যই নানা গবেষণাগ্রন্থে ব্যবহৃত। এইসব গবেষণাগ্রন্থ থেকে বিপিনবাবুর লব্ধ জ্ঞানের পরিচয় জানতে পারা যায়। তথাপি পুরাতন প্রসঙ্গের মূল্য আকরগ্রন্থের।

বিপিনবিহারী গুপ্ত যাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাঁরা অল্পবিস্তর সকলেই উনিশ শতকের নানা কর্মপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেজন্য এসব 'ইতিহাস পড়া নয়, ইতিহাসের স্রোতের মধ্যে দিয়ে অবাধে সন্তরণ। কথক ও লেখক দুজনেই এই গুণের অংশ দাবী করতে পারেন।'[১]

আরও একটি কারণে এই বইর উপযোগিতা। সে হচ্ছে, যাঁরা বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টায় নিজেদের উৎসাহকে যুক্ত করেছিলেন তাঁরা এমন একটা সময়ে আত্মকাহিনী বিবৃত করেছেন যখন এঁরা এঁদের কর্মজীবনের ব্যর্থতা-সার্থকতা সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পেরেছেন। যৌবনের জলধিতরঙ্গ প্রৌঢ়ত্বে যখন শান্ত হয়েছে তখনই এ কাহিনী প্রকাশ করবার সময়। ইতিহাস কেবল কোলাহল কিংবা চাঞ্চল্য-প্রকাশকেই মনে রাখে না— আলোড়নের ফলশ্রুতি ঘোষণাও তার অন্যতম উদ্দেশ্য।

আচার্য কৃষ্ণকমলের বিবৃতি গ্রন্থটির প্রথম পর্যায়ের অধিকাংশ স্থান নিয়েছে। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আচার্যের ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে কিছু বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন কৃষ্ণকমলের উক্তিতে তার কিছু প্রতিবাদ আছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব সম্বন্ধে যে কৃষ্ণকমল অনবহিত ছিলেন না তাঁর প্রমাণ পুরাতন প্রসঙ্গের নানা স্থানে উল্লিখিত আছে। কৃষ্ণকমল বলেছেন, বিদ্যাসাগর কিঞ্চিৎ ঈর্ষালু ছিলেন, শ্যামাচরণের গ্রন্থ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর

১ পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রমথনাথ বিশী লিখিত ভূমিকার অংশবিশেষ।

অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা মানুষ বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ পরিচয় কিছু ক্ষুণ্ণ হয় না। কৃষ্ণকমলও সে কথা বার বার বলেছেন। আর, মানুষ দেবতা নয়। মানুষ মানুষই। বিদ্যাসাগরও মানবিক দুর্বলতার উর্ধ্বে নন। কৃষ্ণকমলের কোঁৎ-প্রীতি সর্বজনবিদিত। লক্ষণীয়, উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির কোঁৎ-প্রীতি প্রায় মজ্জাগত হয়ে পড়েছিল (ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে)। এখানে তার কারণ নির্ণয় করবার অবকাশ নেই। লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে কেবল ফ্যাসনরূপেই পর্যবসিত করেন নি! কোঁৎ মিল ইত্যাদি সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল যে বিস্ময়কর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা অতীব দুর্লভ বস্তু। একজন বাঙালি বৃত্তিতে ইঞ্জিনিয়ার হয়েও দার্শনিক মত ব্যক্ত করার জন্য দু শ পৃষ্ঠার একখানা গ্রন্থ লিখে ফেললেন। সব বস্তুকেই শিক্ষিত বাঙালি সিরিয়াস বলে মনে করতেন বলেই এরকম সম্ভব। অবান্তর হলেও বলি, জীবনচরিতের এসব অংশ থেকে স্বচ্ছন্দে আমরা এযুগেও কিছু ভোজ্যবস্তু পেতে পারি। বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্বন্ধে কৃষ্ণকমলের ধারণা একটু চমক সৃষ্টি করে। তিনি বলেছেন, বিহারীলাল নাস্তিক ছিলেন। বিহারীলালের কাব্যবিচারে এই সূত্রটি নূতন কোনো ইঙ্গিত দেয় কি? বিদ্যাসাগর যে পাইকপাড়ার রাজাদের থিয়েটারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন সে সংবাদে মন প্রসন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের কর্তব্যে অবিচল নিষ্ঠা এবং তাঁর কারুণ্য আমাদের মনকে অধিকার করে আছে। কিন্তু ঐ সামান্য একটি সংবাদ প্রমাণ করছে নাট্যরচনার আদিযুগে তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা কারও চেয়ে কম ছিল না। বাংলার সাহিত্য-উদ্বোধনে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

পুরাতন প্রসঙ্গে বাংলা নাট্যকর্মের বিস্তৃত ইতিহাস অমৃতলাল বসু, রাধামাধব কর প্রমুখ অনেকে দিয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস আজ সকলের পরিচিত। বলা বাহুল্য ব্রজেনবাবু কিছু কিছু তথ্যের জন্য এই গ্রন্থের কাছে ঋণী। ‘স্মৃতিকথা’য় কিছু কিছু সাল-তারিখের গোলমাল আছে, যেগুলি আধুনিক গবেষণায় সংশোধিত। নাট্যশালার বিবরণে অমৃতবাবু গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নিজের দলের যে কিঞ্চিৎ মনান্তর হয়েছিল সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে এই বিরোধের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু অমৃতলাল বসুর বক্তব্য থেকে ন্যাশনাল থিয়েটারের আরও একটু অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। সেই মনান্তরের ইতিহাস নাট্যরচনার বিবরণের দিক থেকে খুবই মূল্যবান। রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সেই আদিযুগে বাংলার যুবকরা যে পরিশ্রম দিয়ে রঙ্গমঞ্চ গড়ার কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন আজ তা অনুধাবন করা সম্ভব হত না যদি-না এসব সংবাদ আমরা পেতাম। জি. বি. হ্যারিসন শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে তদানীন্তন রঙ্গমঞ্চের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। পুরাতন প্রসঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চের অনুরূপ বিশদ তথ্য আছে। এতে করে বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাট্যরচনার যোগসূত্রটি স্পষ্ট হয়েছে। বাংলা পাবলিক থিয়েটার নবীন বাংলার জাগরণের এক অংশের প্রতীক। রাধামাধব কর সেকালের আমোদ-প্রমোদের যে বিবরণ দিয়েছেন তা সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাধামাধববাবু বাংলা নাট্যপ্রয়াস সম্বন্ধে যেসকল কথা বলেছেন তার চাইতে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক সেকালের ছড়া-গান তরজা কবির লড়াই সম্বন্ধে তাঁর বিস্তৃত তথ্য। শিক্ষিত বাঙালির নাট্য-কর্মের উৎসাহ সত্ত্বেও সুলভ প্রমোদের ব্যবস্থাগুলি তখনও অন্তর্হিত হয় নি। সঞ্জীবচন্দ্রের যাত্রা সমালোচন পড়ে এবং রবীন্দ্রনাথের কবিসংগীত প্রবন্ধের জন্য এসব আমোদ-প্রমোদের কথা সকলের নজরে পড়ে

নি। রাধামাধববাবু পাবলিক থিয়েটারের পত্তনের পূর্বে যেসকল অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন তা থেকে সেকালের অন্তত একশ্রেণীর লোকের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দ অধিকারীর দল, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর দল, বদন অধিকারীর দল, মহেশ চক্রবর্তীর দল, বৌমাস্টারের দল, ঝোড়োর দল, ব্রজ অধিকারীর দল, উমেশ মিত্রের দল, মদন মাস্টারের দল, লোক৷ ধোপার দলের যাত্রা বাঙালি সমাজে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। এসব দলের অনুষ্ঠানের কিছু কিছু নিদর্শনও রাধামাধববাবু উল্লেখ করেছেন। ১৮৬৫-৬৬ খ্রীস্টাব্দে শখের থিয়েটারের আসর জমজমাট। আমাদের মনে হয় শখের থিয়েটারের এরকম বাড়বাড়ন্ত হবার কারণ ধনী ব্যক্তিদের নাট্যকর্ম মঞ্চস্থ করার আকস্মিকভাবে আগ্রহের অভাব। স্বলভে, কম খরচে নাট্যরস আস্বাদন করবার আগ্রহ কিন্তু সাধারণের মধ্যে প্রবল ছিল। এই আগ্রহই জাতীয় বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পাবলিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ঘটাল। বলা বাহুল্য, পাবলিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পর থেকে যাত্রার সমাদর ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল। কিংবা বলা উচিত আমাদের নাট্যকর্মে যাত্রার রীতিনীতি কিছু পরিমাণে আত্মগোপন করল। রাধামাধববাবুর এই বিবরণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতি রচনায় এই বিবরণের গুরুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই।

পুরাতন প্রসঙ্গে এমন কতগুলি অংশ আছে যেগুলি আজও আমাদের মুগ্ধ করে।— কৃষ্ণকমলের বাল্যজীবনের করুণ-মধুর কাহিনী, রামতনু লাহিড়ী এবং পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিহাস-রসিকতা, বিহারীলালের অকুতোভয়তা, রাসবিহারী ঘোষের বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি, অমৃতলালের রিহার্সল প্রসঙ্গ, কৃষ্ণনগরের মহারাজ গিরিশচন্দ্রের বিলাসিতা, কৃষ্ণকমলের গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ, সংস্কৃতবিদ্যা প্রসারে পাশ্চাত্য মনীষীদের (গ্রিফিথ সাহেবের রামায়ণ অনুবাদ প্রসঙ্গ বিশেষভাবে স্মরণীয়) উদ্যোগ, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র অভিনয়-কেলেঙ্কারি, রাধামাধবের বংশীপ্রীতি ('বই ফেলিয়া বাঁশী ধরিলাম')। উনিশ শতকের মানুষগুলির সঙ্গে একালের মানুষের যোগাযোগ একটা প্রীতিপ্রসন্ন মনোভাব সৃষ্টি করে।

কিছু কিছু আপাততুচ্ছ তথ্যও ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান। কবির অনাদর হলে কবিরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে হুল ফোটাতেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মূলে প্রায়শই বাস্তব ঘটনার অস্তিত্ব থাকে। হুতোম প্যাঁচার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপগুলির উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরা কে তা জানতে পারলে ইতিহাস তথ্যসমৃদ্ধ হয়। পুরাতন প্রসঙ্গে সেরকম কিছু উল্লেখ আছে। অমৃতলাল বসু বলেছেন রামনারায়ণের কুলীনকুলসর্বস্ব সম্ভবত রামনারায়ণের দাদার রচনা। এর প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু অমৃতলালের যুক্তিতেও সারবত্তা আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উক্তি তো রীতিমত বিস্ময় সৃষ্টি করে। স্বপ্নপ্রয়াণের কোনো কোনো অংশ বঙ্কিমচন্দ্র নির্বিচারে বিষবৃক্ষ উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন— দ্বিজেন্দ্রনাথের এরকম উক্তি রয়েছে। বিষয়টির প্রণিধানযোগ্যতা একালেও রয়েছে। তত্ত্ববিদ্যা আলোচনা প্রসঙ্গে এরকম রচনার তিনিই বাংলা সাহিত্যে পথিকৃৎ এরকম দাবি দ্বিজেন্দ্রনাথ করেছেন। অনেক বিষয়েই দ্বিজেন্দ্রনাথ যে পাইয়োনিয়ার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পুরাতন প্রসঙ্গে অধুনাবিস্মৃত এমন কয়েকজন বাঙালি মনীষীর সম্বন্ধে যে সপ্রশংস শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে তার মূল্য এখন কিছুটা স্বীকৃত। মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া উচিত, পুরাতন প্রসঙ্গের বিবরণ থেকেই তা

জানতে পারি। তারানাথ তর্কবাচস্পতির কথা তো রামকমল বারবার উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিতম্মন্যতা যেমন ধিক্কৃত হয়েছে তেমনি যথার্থ পাণ্ডিত্যের মূল্য যে অপরিসীম তা তারানাথের জীবনীর যে অংশ কৃষ্ণকমল বলেছেন সেই থেকে জানতে পারি। হ্যালিডে ও গ্রান্টের স্মরণীয় কর্মপ্রচেষ্টা বাংলার সমাজেতিহাসেরই অঙ্গ। সেই প্রসঙ্গের অবতারণা পুরাতন প্রসঙ্গে আছে। এসকল 'বড়ো' ইংরেজের কথা উমেশচন্দ্র দত্ত বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন।

'পুরাতন প্রসঙ্গ' নবসংস্করণে মোট তিনটি পর্যায় একসঙ্গে গ্রথিত হয়েছে। বিপিনবিহারী গুপ্ত ইতিহাসবিস্মৃত জাতির কলঙ্কমোচন করেছেন। বিপিনবাবুর উদ্দেশ্য ও ইতিহাসজিজ্ঞাসার প্রণালী নিয়ে আজকের দিনে কিঞ্চিৎ অসন্তোষ থাকতে পারে। প্রায়শই বিপিনবাবু নীরব শ্রোতা। প্রশ্ন তিনি কদাচিৎ করেছেন। আমাদের জানতে ইচ্ছে করে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে বাঙালির কি অভিমত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ পরিচয় যদি এঁদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা যেত। দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে যদি কিছু রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ পেতাম। স্বদেশীযুগে বাংলার অস্থিরতা যদি এঁরা স্পষ্ট করতেন। এসব খুঁটিনাটি তথ্য জানবার প্রত্যাশা আমাদের জাগে। হতে পারে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই এসব বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেন নি। সুতরাং যা পাই নি তার জন্য খেদ হয়তো অশোভন। বোধ করি, বিপিনবাবুর উদ্দেশ্যই ছিল বক্তাদের কর্মজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ আছে এমন বিবরণ সংগ্রহ করা। সেদিক থেকে বিপিনবাবুর প্রচেষ্টা কেবল সার্থকই নয়, তিনি একটি জাতীয় কর্তব্যও পালন করেছেন।

এ বই'র নূতন সংস্করণ বার হওয়াতে মনে হয় এসব গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় বাংলাদেশে বিপিনবাবুর মত যদি এরকম নিরভিমান জ্ঞানতাপসের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। আমাদেরও তো দায়িত্ব আছে বিগত কয়েক দশকের বিবরণ এরকম স্মৃতিকথার সাহায্যে সংগ্রহ করে রাখার। এ বিষয়ে কিছু কাজ হয় নি তা নয়। শ্রীসুশীল রায়ের মনীষী-জীবনকথা এ প্রসঙ্গে স্বতই মনে আসে। কিছুদির আগে 'দেশ' সাময়িক পত্রিকায় এরকম উদ্যোগ লক্ষ্য করে আমরা খুশি হয়েছিলাম। কেউ কেউ আত্মচরিত রচনা করে এ দায়িত্ব কিছুটা পালন করেছেন। এসব উদ্যোগ যত বেশি হয় ততই জাতিপরিচয় সংস্কৃতিপরিচয় সমৃদ্ধ হবে।

আলোচ্য বইটি সম্পাদনা করেছেন শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। ভূমিকা লিখেছেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। 'স্মৃতিকথা'য় উল্লিখিত বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিশুবাবু যথাসম্ভব দিয়েছেন। পাদটীকায় আধুনিক গবেষণায় লব্ধ তথ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেসব তথ্য আরও একটু বেশি হলে বোধ করি সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

বিজিতকুমার দত্ত

বাণীবীণা। শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীপ্রকাশন, ২ রিজেণ্ট স্টেট, কলিকাতা ৩২। চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কলকাতায় বিষ্ণুপুর ঘরানার যে অল্পসংখ্যক গায়ক আছেন প্রবীণ গীতশিল্পী শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। সঙ্গীত সম্বন্ধীয় তাঁর কতিপয় রচনা বিভিন্ন দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা থেকে এই পুস্তকে সঙ্কলিত হয়েছে এবং বহু গানের স্বরলিপিও সংযোজিত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা গানের মূল্য নির্ধারণ করাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এ সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের স্বরলিপিগুলি প্রধানতঃ তাঁর পিতৃদেব গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীতচন্দ্রিকা এবং পিতৃব্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীতমঞ্জরী থেকে আকারমাত্রিকে পরিবর্তিত করা হয়েছে। নমুনা হিসাবে বৈজুবাওরা, নায়ক গোপাল, হরিদাস স্বামী, তানসেন, কবীর, সুরদাস, তুলসীদাস, মীরাবাঈ, সদারঙ্গ, অচপল, মানবঙ্গ, শোরী, কদর, সনদ, জুগরাজদাস এবং যদুভট্টের গানের স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, দাশরথি, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদের গানও বাংলা গানের আলোচনা উপলক্ষে সন্নিবেশিত হয়েছে। ব্রহ্মসঙ্গীতের আলোচনা উপলক্ষে গ্রন্থকার রামমোহন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুটি গানের স্বরলিপি দিয়েছেন। বর্তমানে ভারতীয় সঙ্গীতসাধনার ইতিবৃত্ত নির্ধারণ করবার একটি বিশেষ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রচেষ্টায় মধ্যযুগের ভারতীয় সঙ্গীতে কিভাবে ধ্রুপদ খেয়াল ও ভজন গাওয়া হত এবং পরবর্তীকালে টপ্পা ও ঠুংরীর প্রসার কিভাবে ঘটেছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক। যাঁরা এইভাবে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁরা এই গ্রন্থের গানগুলি অনুশীলন করে বিশেষ উপকৃত হবেন।

অভিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁর বিষয়বস্তু নিয়ে যে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন আশা করি পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি ইতিহাসের দিক থেকে আরও তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুসম্বদ্ধ হবে। বলা বাহুল্য গ্রন্থটি প্রধানতঃ প্রয়োগশিল্পের দিকে নজর রেখেই রচনা করা হয়েছে এবং সেদিক থেকে গ্রন্থকার যথেষ্ট সাধুবাদ অর্জনে সমর্থ হবেন।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

মুক্তধারা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংস্কৃত অনুবাদ : শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। শ্রীমতী উষা চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২।৫ শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলিকাতা ৩১। মূল্য পাঁচ টাকা।

গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের প্রথম সংস্কৃত অনুবাদ। গ্রন্থের প্রারম্ভে অনুবাদক সংস্কৃত ভাষায় একটি সুদীর্ঘ ভূমিকাও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বহু তথ্যের সমাবেশে ভূমিকাটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও রসজ্ঞ হইয়াছে।

অনুবাদ করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। কারণ, মূলগ্রন্থের ভাষার সৌষ্ঠব হানি না করিয়া, যতদূর সম্ভব অর্থ অপরিবর্তিত রাখিয়া, যথাযথভাবে সম্পূর্ণ ভাব ও ভাষাটিকে আয়ত্ত করিয়া অনুবাদ করিতে

হয়, তাহা হইলেই উহা হৃদয়গ্রাহী হয় এবং পাঠকবর্গও উহার রস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ধ্যানেশবাবু সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখায় অনুবাদটি হৃদয়গ্রাহী ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

প্রত্যেক ভাষারই কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ সেই দেশের জলবায়ু আচার-ব্যবহার রীতিনীতি চিন্তাধারা জীবনযাপনপ্রণালী ভাবভঙ্গী স্মরণীয় ঘটনা এবং বহুকালসঞ্চিত জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও ধর্মের মাধ্যমে সেই ভাষায় প্রবেশ করে এবং কালক্রমে তাহার সহিত ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত হইয়া যায়। অনুবাদে সেই দেশজ বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু উভয় ভাষায় দক্ষতা থাকিলে অনুবাদকারীর তুলিকায় তাহার মহিমা হয়তো কিছুটা প্রকটিত হইতে পারে। আসল কথা, মূলের রচনাভঙ্গী ও বাগ্‌বিন্যাস-প্রণালী যথাসম্ভব আত্মসাৎ করিয়া অনুবাদ করিলে অনুবাদকের কৃতিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্যানেশবাবুর অনুবাদে এই গুণের পরিচয় আছে। তাঁহার যে উভয় ভাষাতেই পারদর্শিতা আছে, তাহা এই অনুবাদ পাঠে বোঝা যায়। অনুবাদ করা কালীন তিনি এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

কোনো বৈদেশিক কবি বলিয়াছিলেন—

En la traduccion es consiguinte
Que pierda la dulzura competente.
["The perfume of a pristine thought
Can't in translation be caught."]

যাকে বলে 'ভাবময়ী ভাষার সুবাস, ভিন্নভাষে পায় না প্রকাশ'।

এই উক্তির তাৎপর্য এই যে সুনিপুণ শিল্পী অত্যন্ত দক্ষতাসহকারে চিত্রপটে একটি ফুল আঁকিলেও তাহাতে যেমন ফুলের বর্ণসুষমা, স্নিগ্ধকোমলতা ও স্বর্গীয় সৌরভ প্রতিফলিত করিতে পারেন না, সেইরূপ কোনো ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সৌন্দর্য মাধুর্য ঔদার্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণসমূহ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখিয়া ভাষান্তরিত করা অত্যন্ত দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব।

সংস্কৃত ও বাংলা উভয়েই এক আর্য-শাখায় অন্তর্ভুক্ত। একটি সুপ্রাচীন, আর-একটি অতি নবীন। একটি ভাব ও শব্দসম্পদে অতুলনীয়, অপরটি শব্দচয়নে ও বয়নে অদ্বিতীয়। একটি উদ্যানের রাজীব, অপরটি উহার বনলতা। সুতরাং এই দুইএর সমন্বয় সাধন করার অর্থ হইল অতীত ও বর্তমানকে একসূত্রে গ্রথিত করা।

অনুবাদের ফলপ্রসূতা নির্ভর করে সাধারণতঃ তিনটি অঙ্গের উপর। প্রথমটি হইতেছে শব্দানুবাদ বা আখ্যানানুবাদ। এই অনুবাদের মাধ্যমে মূলভাষার সাহিত্যের সহিত কেবল পরিচয়মাত্র ঘটে। মূলের ভাষার forceটুকুকে অনুবাদ করা হয় না। যে ভাষায় প্রকাশ করা হয়, তাহার idomটুকু রক্ষিত হয়। এই শব্দানুবাদেও নিপুণতার প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয়টি ভাবানুবাদ। যে গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করা হয় তাহার সম্পূর্ণ ভাবটিকে অনুবাদ করা। যাহাকে বলে ভাষার spiritকে অনুবাদ করা। ইহা খুব কঠিন কাজ। কারণ, অন্যের ভাবকে নিজের করিয়া পরে সেই ভাবটিকে অন্যের করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বলাই বাহুল্য, ধ্যানেশবাবু এই ব্যাপারে বেশ সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়াছেন।

তৃতীয় অঙ্গটি হইতেছে ভাষানুবাদ। অনুবাদের ভাবকে যথোপযুক্তরূপে রূপায়িত করিবার জন্য প্রভূত শব্দসম্পদের প্রয়োজন। যে ভাবটি অতি আধুনিক ভাষায় সহজভাবে প্রকাশ করা যায়, প্রাচীন ভাষার আশ্রয়ে উহা প্রকাশ করা তত সহজসাধ্য নয়। আধুনিক ভাব ও শব্দকে প্রাচীন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে হইলে যে ভাষায় অনুবাদ করা হয় তাহার উপর দখল থাকা প্রয়োজন। অনুবাদকের এ দখল আছে।

আসল কথা, ধ্যানেশবাবু এই অনুবাদে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ভাষার সারল্যে ও প্রাঞ্জলতায়, ভাবের গাম্ভীর্যে ও মহিমায়, শব্দের চয়নে ও বয়নে, বিশিষ্ট রচনাভঙ্গী ও রীতিতে অনুবাদটি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরে জাগায়ো না, ও যে বিরাম মাগে নির্মম ভাগ্যের পায়ে।
ও যে সব চাওয়া দিতে চাহে অতলে জলাঞ্জলি ॥
দুরাশার দুঃসহ ভার দিক নামায়ে,
যাক ভুলে অকিঞ্চন জীবনের বঞ্চনা ॥
আসুক নিবিড় নিদ্রা,
তামসী তুলিকায় অতীতের বিদ্রূপবাণী দিক মুছায়ে
স্মরণের পত্র হতে।
স্তব্ধ হোক বেদনগুঞ্জন
সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়ের মতো—
আনো তমস্বিনী,
শ্রান্ত দুঃখের মৌনতিমিরে শান্তির দান ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　　　স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

সা সা II মা মা রা -া । সা -া সা সা I সা সমা মা রা । সা -া -া -া I
ও রে　জা গা য়ো ০　না • ও যে　বি রা০ ম মা　গে ০ ০ •

I সা -া মা মা । রা -া সা সা I মা -া মা -া । -া -া র্সা র্সা I
নি র্ ম ম　ভা গ্ গে র　পা ০ য়ে •　• • ও যে

I র্সা -র্গা র্গা -া । র্রা -া র্সা -না I [ধ]না -া র্সা -না । ধা -পা পা -স্মা I
স ব্ চা ও　য়া ০ দি ০　তে ০ চা •　হে • অ ০

I পা -না না -ধা । ধা -পা পস্মা -ধা I [ধ]পা -া পা -মা । -া -া -া -া I
ত ০ লে •　জ ০ লা০ ন্　জ ০ লি •　০ ০ ০ ০

I পা -র্সা -া -স্মা । পা -ধা -া -স্মা I পা -মা -া -া । -া -া মা মা I
না ০ ০ •　না • ০ •　না • • •　০ • ও রে

I মা মা মা -গা । গা -পা -া -া I { পা -ক্মা ধা -পা । না -া -র্সা -া I
জা গা য়ো ০ না ০ ০ ০ তু ০ রা ০ শা ০ ০ র্

I র্সা -া র্রা না । র্সা -া -া -া I র্সা -া র্সা -না । ধনা -া -া -ধা I
দুঃ ০ স হ ভা ০ ০ র্ দি ক্ না ০ মা ০ ০ ০

I ধা -র্সা -া -া । -া -া -া -া I র্সর্গা -া র্গা -া । র্গা -া -র্রা -া I
য়ে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ দি০ ক্ না ০ মা ০ ০ ০

I র্গা -র্পা -া -র্গর্রা । -র্সা -া -া -া } I র্সা -র্গা র্গা -র্রা । র্রা -র্সা -া -া I
য়ে ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ যা ক্ ভু ০ লে ০ ০ ০

I র্সা -না র্সা -র্গা । র্গা -র্রা র্রা -র্সা I র্সা -না -র্রা র্রর্সা । র্সা -া র্সা -না I
অ ০ কি ন্ চ ০ ন ০ জী ০ ০ ব০ নে ০ র ০

I ধা -র্সা -া না । ধা -পা -া -ক্মা I পা -র্সা -া -ক্মা । পা -ধা -া -ক্মা I
ব ০ ন্ চ না ০ ০ ০ না ০ ০ ০ না ০ ০ ০

I ধপা -মা -া -া । -া -া মা মা I মা মা মা -গা । গা -পা -া -া I
না ০ ০ ০ ০ ০ ও রে জা গা য়ো ০ না ০ ০ ০

I { সা -মা মা মা । মা -া মা মা I মা -া মা -া । -া -া -া -া I
আ ০ স্থ ক নি ০ বি ড় নি ০ দ্রা ০ ০ ০ ০ ০

I সা -মা মা মা । মা -া মা -গা I গা -পা -া -া । -া -া -া -া I
তা ০ ম সী তু ০ লি ০ কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I ধা না র্সা না । ধা -না র্সা না I ধনা -া ধপা -ক্মা । পা -র্সা না -ধা I
অ তী তে র বি ০ দ্রূ প বা ০ ণী০ ০ দি ক্ মু ০

I ধা -পা পা -া । হ্মা পা ধা পা I পা -হ্মা ধা [ধ]পা । পা -মা -া -া } I
ছা ॰ য়ে ॰ স্ম র ণে র প ৎ ত্র হ তে ॰ ॰ ॰

I { পা -হ্মা ধা -পা । না -া -ধা -নর্সা I র্সা -া [র্স]র্রা র্সা । র্সা -া র্সা র্সা I
স্ত ব্ ধ ॰ হো ॰ ॰ ॰ক্ বে ॰ দ ন গু ন্ জ ন

[-।]
I র্সা -র্গা র্গা র্গর্রা । [র্গ]র্রা -র্সা র্সা না I [ধ]না -া র্সা না । [ধ]না -া ধপা -হ্মা } I
সু প্ ত বি॰ হ ঙ্ গে র নী ॰ ড়ে র ম ॰ তো॰ ॰

I র্সা -র্গা র্গা -া । র্গা -া র্গা -র্পা I র্গা -র্রা র্রা -র্সা । -া -া -া -া I
আ ॰ নো ॰ ত ॰ ম ॰ স্বি ॰ নী ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I র্সা -া -র্গা র্গর্রা । র্রা -া র্সা র্সা I র্সা -না -র্রা র্সা । র্সা র্সা না -া I
শ্রা ॰ ন্ ত॰ দু ক্ খে র মো ॰ উ ন তি মি রে ॰

I ধা -না র্সা [র্স]না । ধপা -া -া -হ্মা I পা -র্সা -া -হ্মা । পা -ধা -া -হ্মা I
শা ন্ তি র দা॰ ॰ ॰ ন্ না ॰ ॰ ॰ না ॰ ॰ ॰

I [ধ]পা -মা -া -া । -া -া মা মা I মা মা মা -গা । গা -পা -া -া II II
না ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ও রে জা গা য়ো ॰ না ॰ ॰ ॰

সম্পাদকের নিবেদন

বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্য দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে কৃতজ্ঞ। ইতিহাস-বিস্মৃত জাতিকে তিনি অন্যান্য সাহিত্যকর্মের সঙ্গে উপহার দিয়েছেন সাহিত্যের ইতিহাস। এজন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি করেছেন, এবং প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছেন যে, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের ফল পাওয়া যায়ই।

দীনেশচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমরা তাঁকে নূতন ক'রে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যসাধনা সম্ভবত পৃথক জিনিস। দীনেশচন্দ্র সাহিত্যকে সাধনার ধন রূপে গ্রহণ করেছিলেন। যে কাজ তিনি ক'রে গিয়েছেন তার মধ্যেই এর প্রমাণ আছে।

সাহিত্যসৃজনের প্রতি তাঁর যেমন নিষ্ঠা ছিল, সাহিত্যমন্থনের কাজেও তাঁর উৎসাহ ছিল তেমনি প্রবল। মৌলিক রচনা তাঁর যেমন আছে, সাহিত্যের অনেক লুপ্তরত্ন ও গুপ্তরত্নও তিনি তেমনি উদ্ধার করেছেন।

এই সংখ্যায় দীনেশচন্দ্রের ইতিহাসচর্চা ও সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধে এ বিষয়ে অনেক তথ্য আছে।

রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র এক সময়ে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন। উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎও যেমন হয়েছে পত্রবিনিময়ও হয়েছে। কয়েকটি পত্র এই সংখ্যায় সংকলিত হল।

স্বী কৃ তি

নন্দলাল বসু -অঙ্কিত চিত্র শ্রীবিমলকুমার দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দীনেশচন্দ্র সেনের চিত্র শ্রীবিনয়চন্দ্র সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

হাংগেরীতে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত চিত্রগুলি দিয়েছেন শ্রীঅলক গুহ।

দুষ্প্রাপ্য 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' গ্রন্থের আখ্যাপত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আনুকূল্যে মুদ্রিত।

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায় বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৪ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪

সবিনয় নিবেদন,

আমি বিশ্বভারতী পত্রিকার (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪ থেকে বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫) চতুর্বিংশ বর্ষের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করি। চাঁদা মনিঅর্ডারে পাঠাইলাম। মনিঅর্ডার রসিদ সংখ্যা তারিখ ।

১ বার্ষিক চাঁদা ৪·০০ টাকা, পত্রিকা হাতে লইব।

২ সডাক বার্ষিক চাঁদা ৫·৫০ টাকা, সার্টিফিকেট অব পোস্টিং রাখিয়া পত্রিকা পাঠাইবেন।

৩ রেজিস্ট্রি ডাকব্যয় সহ বার্ষিক চাঁদা ৭·৫০ টাকা, পত্রিকা রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠাইবেন।

নাম

ঠিকানা

তারিখ

বিশেষ দ্রষ্টব্য : পুরাতন গ্রাহকেরাও গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করিয়া ২৪শ বর্ষের জন্য গ্রাহক করিয়া লইবার জন্য নির্দেশ দিলে ভালো হয়। ১ ২ ও ৩ এর মধ্যে একটি রাখিয়া অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিবেন।

পত্রিকা রেজিস্ট্রি ডাকে লইলে হারাইবার সম্ভাবনা কম।

পোস্ট-কার্ড

ডাকটিকিট

প্রকাশক

বিশ্বভারতী পত্রিকা

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

কলিকাতা ৭

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪ · ১৮৮৯ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

স্মৃতি

শিল্পী রামকিঙ্কর

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪ · ১৮৮৯ শক

চিঠিপত্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভ্রাতঃ

চিঠি পড়িয়া দেখিয়ো। তোমরা কোনোমতেই ব্যবস্থা করিতে পারিবেনা অথচ কাগজ রাখিতেই হইবে এ গ্রহ কেন? কত লোকের কাছ হইতেই যে নালিশ আসে তাহার ঠিকানা নাই।

আজও "সাহিত্য" বইখানা বাহির কেন হইলনা শৈলেশকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে খবর দিয়ো।

ডাক্তার মীরাকে দেখিয়া গেছে মোটের উপর ভালই আছে তবে কাল হইতে একটু জ্বরের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

যে কয়দিন মাহিনা না পাও বোলপুরে আসিয়া কাটাইয়া যাও। টাকা পাইলেই কলিকাতায় দৌড় দিয়ো। ইতি ১৯শে ভাদ্র ১৩১৪

তোমার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'River View'
Almora
Sept. 1, '07

Srijut Rabindranath Tagore
Editor, Bangadarsan
Dear Sir,

I am a new subscriber of the paper of which you are the distinguished editor. I have to trouble you with a complaint. I hope you will kindly take necessary steps. I have to trouble you because I don't know the name of the manager neither is it anywhere written in the paper.

When I first became a subscriber this year, I wrote to you to kindly ask the manager to send me the first number per V.P. post. I received the first number in time, but for the second number I had to write to the manager. After that I have not received any issue. Some days ago I wrote a postcard addressed to the manager but I have not heard anything in reply neither have I got the third & fourth issues which I should have received by this time. Will you kindly see that the আষাঢ় and শ্রাবণ issues are sent to me now and the other issues in due course, that this letter may be my last letter of complaints? This is simply due to mismanagement, I am sure I hope you will kindly excuse me for the trouble I am compelled to give you. I am, yours faithfully

Akhilnath Sanyal
Prof. Ramsay College,
"River View"
Almora

P.S. I am sorry I do not know my Subscriber No. but I hope there will be no difficulty in finding my name out as I hope I am the only subscriber from this place. I am a new subscriber.

A. Sanyal.

ওঁ

ভ্রাতঃ

"গুমো"র কোনো আশা আছে কি? সত্য করে বোলো— কারণ সুরেন আমাকে প্রায়ই তাগাদা করেন। সেখানে যদি বাংলা ভাড়া পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে তিনি গিয়ে কিছুদিন থেকে নিজেই চেষ্টা দেখতে পারেন। সেখানে আমরা চাষের জমি চাই নে— বাসের জমি চাই। চাষের জমি চার টাকা খাজনা দিয়ে নেওয়া আমার মত লোকেরও বুদ্ধিতে সঙ্গত ঠেকে না। যদি গুমোতে জমির অভাব ঘটে তবে গিরীন্দ্রবাবু আর কোনো ভাল জায়গায় আমাদের কি একটুখানি বাসযোগ্য জমিও জোগাড় করে দিতে পারবেন না? ইতি ২২শে আশ্বিন ১৩১৪

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক
BARABAZAR
14 Oc. 07

[জোড়াসাঁকো]

ভ্রাতঃ

কলিকাতায় শমী আসতে চায় না। বোলপুরেও তার একলা ঠেকচে। এই কারণে, মনে করচি তাকে দুই তিন দিনের মধ্যে মুঙ্গের পাঠিয়ে দেব। অসুবিধা হবেনা ত? জগদানন্দ তাকে পৌঁছে দিয়ে চলে আস্‌বেন। ভেবেছিলুম সুবোধের সঙ্গে তাকে দিল্লী পাঠাব কিন্তু দিল্লীতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব শুনে পিছতে হল। শমী এত অল্প জায়গা জোড়ে এবং এত নিরুপদ্রব যে তার আগমনে তোমাদের মুঙ্গের সহরের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা নেই। মীরা সেই রকমই আছে। এক একবার ভাবছি তাকে নিয়ে শিলাইদহে বোটে বেড়াতে যাব— কিছুই স্থির হয়নি। আপাতত আগামী কল্য বোলপুরে গিয়ে শমীকে রওনা করে দেবার ব্যবস্থা করব। গুমো এবং সরাইয়ার কথা স্মরণে রেখো। চাষ এবং বাস দুই জমাতে পারলে ভাল তবে কিনা সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। ইতি সোমবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক
BOLPUR
18 Oc. 07

ভ্রাতঃ

বিজয়ার নমস্কার যুগলে গ্রহণ করিবে ও ছেলেমেয়েদের আশীর্ব্বাদ দিবে।

শমীকে লইয়া স্থানাভাববশতঃ তোমাদের কোনো অসুবিধা হইবেনা ত? যদি হয় ত তাহাকে

অসঙ্কোচে এখানে পাঠাইবে অথবা তোমার সঙ্গে মানপুরেও লইয়া যাইতে পার।

নির্জ্জনতায় শান্তিনিকেতনের শান্তি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৪

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[জোড়াসাঁকো]

ভ্রাতঃ

বহরমপুরের গোলমাল শেষ করিয়া আসিলাম। কথা, কথা, কথা। এ বয়সে আর ত ভাল লাগে না। তবে মহারাজ মণীন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হইয়া সুখী হইয়াছি। এতদিন পরে এমন একজন ধনী দেখিতে পাইলাম যিনি ধনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। ইনি যেমন অন্তরের সহিত বিনয়ী তেমনি দেশের সদনুষ্ঠানে ইঁহার উৎসাহ একান্ত অকৃত্রিম।

ছোটনাগপুরের দিকে জমি পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হইতেছেনা। কারণ সেদিন একজনের কাছে শুনিলাম "গোমো"র জমি আর বড় বাকি নাই। অগত্যা ময়ুরভঞ্জে জমির জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। সেখানে জমি আছে কিন্তু স্বাস্থ্যকর হইবেনা। কি করা যাইবে— এত খরচ করিয়া কৃষি শিখাইয়া শেষকালে জমি অভাবে সমস্ত ব্যর্থ করা ত যায় না। সুরেন জমি দেখিতে ও দরখাস্ত করিতে ময়ুরভঞ্জে যাইবেন। ছোটনাগপুরে কিরূপ বুঝিতেছ?

মীরার শরীর ভালই আছে। আমি বহরমপুরের অনিয়মে প্রথমে অর্শ পরে সর্দ্দিতে আক্রান্ত। শীঘ্র বোলপুরে পলায়নের চেষ্টায় আছি।

তোমরা যুগলরূপে আমার প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ করিবে এবং ছেলেদের আশীর্ব্বাদ জানাইবে। ইতি ২২শে কার্ত্তিক ১৩১৪

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

ভ্রাতঃ

দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে তোমাদের যে মন্তব্য সঙ্গত বোধ হয় তাহা দিবে সেই সঙ্গে আমিও একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখিতে ইচ্ছা করি এইজন্য শৈলেশকে উক্ত প্রবন্ধ আমার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য লিখিলাম। প্রবন্ধের কোন অংশ বর্জ্জন বা শোধন করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না—প্রবন্ধের দায়িত্ব তোমার নহে।

আজকাল আমরা বোটের উপর থাকিয়া চরে রাঁধাবাড়া করিয়া খাইয়া বেশ ভালই আছি। যদি তোমার পক্ষে অসাধ্য না হইত তবে তোমাকে একবার এখানে সশরীরে হাজির করা যাইত— কিন্তু আলাদিনের প্রদীপ তোমার বা আমার হাতে নাই।

এবার বঙ্গদর্শনের জন্য একটি ছোট্ট লেখা পাঠাইয়াছি। প্রবাসীর জন্য কন্‌গ্রেস ভাঙার উপরে আমার একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য জারি করিয়াছি।

আমি এবার ১১ই মাঘে কলিকাতায় যাইব কিনা এখনো সম্পূর্ণ মন স্থির করি নাই। যদি যাই তবে আবার এখানে ফিরিতে হইবে— কারণ অন্তত মাঘের শেষ পর্য্যন্ত আমাকে এখানে কাটাইতে হইবে— অনেককাল পরে পদ্মার সহিত আমার পুনর্ম্মিলনের দীর্ঘ অবকাশ ঘটিয়াছে, যতদিন পারি এইখানে কাটাইয়া যাইব। ফাল্গুনে বোলপুরে হাজির হইব।

এখানে জমির খবর লইয়া দেখিলাম কোথাও একত্র সংলগ্ন পঞ্চাশ বিঘা জমি পাওয়াও অসম্ভব। এসব জায়গায় জমি পড়িয়া থাকেনা। ১৫।২০ বিঘা জমি লইয়া রথী সন্তোষের কোনো কাজই হইবেনা। অতএব এখানকার আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। মুঙ্গেরে সুরেন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভ্রাতার কাছে ময়ূর-ভঞ্জের জমির যে বিবরণ পাইয়াছিলাম তাহা আশাজনক নহে— তিনি নিজে সেখানকার জমি ছাড়িয়া দিয়া বেহারে কোথায় জমি লইয়াছেন। তুমি আর একবার জমির জন্য চেষ্টা করিয়া দেখিয়ো— বাংলার এ অঞ্চলে কোথাও জমি পাইবনা। ওখানেও যদি না পাওয়া যায় তবে ছেলেদের পক্ষে স্বাধীন কৃষিব্যবসায় করা একেবারে অসম্ভব হইবে। তোমরা আমার সাদর নমস্কার গ্রহণ করিবে। ইতি ১৯শে পৌষ ১৩১৪

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

ভ্রাতঃ

সুবোধ অত্যন্ত অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে এখানে ফিরিয়া আসিয়া কাজে যোগ দিতে অক্ষম এইরূপ আমাকে জানাইয়াছে— বোধ করি জয়পুরে অথবা দিল্লিতে কোনো কাজের আশা পাইয়া থাকিবে। সুতরাং আমি এখানে অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। এ সময়ে এখানে প্রধান কর্ম্মচারী কেহ না থাকিলে এ বৎসরের আদায় তহশিল একেবারে নষ্ট হইবে। অনিশ্চিতভাবে কাজ ফেলিয়া রাখা চলেনা। সুবোধের বয়স অল্প, নিষ্ঠাও নাই— কিসের জোরে হঠাৎ এত বড় শোক সম্বরণ করিবে?

গুমোর যে জমির কথা লিখিয়াছ সেখানকার বিঘার পরিমাণ কি? যদি standard বিঘা হয় তবে ৩ টাকা জমা বহন করা অসাধ্য। এ জমি আবাদী অথবা নূতন ভাঙিয়া চষিয়া তৈরি করিতে হইবে তাহাও জানা আবশ্যক। যদি হাজার বিঘা জমি লওয়া হয় তবে তিনটাকা জমায় মাসে আড়াইশো টাকা খাজনাই লাগিবে, এত খাজনা বহন করিয়া অন্যান্য খরচ বাদে লাভ করা সহজ হইবেনা বলিয়া মনে হয়। যদি ৫০০ বিঘাও লওয়া হয় তবু ১২৫ টাকা— সামান্য কথা নহে। কারণ মাসে ২০০।২৫০ টাকা যদি কোনোমতে লাভ হয় তবে সেই যথেষ্ট— তাও দীর্ঘকাল পরে হওয়া সম্ভব— ইতিমধ্যে যদি খাজনা দিতেই সব নিকাশ হইয়া যায় তবে কেবল দেনাই বাড়িতে থাকিবে। এক ত বিঘা প্রতি ৩০ টাকা পণ দিলে ১০০০ বিঘায় ৩০০০০ ত্রিশ হাজার টাকা দিতে হয়— তার ৬ পার্সেণ্ট সুদ ধরলেও মাসে একশো টাকার বেশি— ৩০০।৩৫০ টাকা মাসে দেওয়া সহজ ব্যাপার ত হবে না। আমাদের এখানে জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা— প্রায় ৩।৪ ফসল হয়— বিঘা ও দেড় বিঘার কাছাকাছি— এখানে বিঘাপ্রতি দেড় টাকা সতেরো আনা খাজনা দিতে

হয়। এর চেয়ে ভাল জমি সেখানে হওয়া অসম্ভব— অথচ সেখানে অত প্রচণ্ড দাম ও জমা হলে কি করে কাজ চল্‌বে? ঐ জমির rights কি তাও জানা চাই। এ বোধ হয় মৌরসী নয়।

চাষের জমি যা হয় হবে। গুমোর বাসের জমি অন্তত বিঘা দশ পনেরো একটু রমণীয় জায়গায় পাওয়া যায় কিনা খবর নিয়ো। সেই সঙ্গে চাষের জমি ১০০০ বিঘা না হোক ২০০।৩০০ বিঘার চেষ্টা দেখা যাক— একটু উর্ব্বরা দেখে জমি বেছে নেওয়া চাই। তুমি নিজে ধাঁ করে গিয়ে একবার দেখে এলে হয় না? অমনি সুরেনও যেতে পারে। আমি ত ফাল্গুনের পূর্ব্বে এখান থেকে নড়চিনে। কেবল ১১ই মাঘের কার্য্য সম্পাদনের জন্য দুই তিন দিনের মত কলকাতায় যাব।

এখানে মেয়েরা বেশ ভাল আছে। আমিও নানা কাজে ব্যাপৃত। শরীর মনও বেশ ভাল।··

তোমরা আমার নমস্কার গ্রহণ কোরো ও ছেলেদের আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ২রা মাঘ ১৩১৪

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[জোড়াসাঁকো]

ভ্রাতঃ

কলিকাতায় ফিরিয়াছি। আগামী কাল বোলপুরে যাইব। দিন দশেক সেখানে থাকিয়া বিদ্যালয়ের ছুটি দিয়া চলিয়া আসিব। সেখানে গুরুতর জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

গুমোর জমি আমাকে কি উপায়ে দেখানো হইতে পারে? সেখানে কি কোথাও আশ্রয় লইবার কোনো উপায় আছে? যাহাই হউক্ যদি সেখানে জমি পাওয়া যায় তবে কাজে লাগিবে সন্দেহ নাই। জমির সম্বন্ধে আমি ক্রমশই হতাশ্বাস হইয়া পড়িতেছি। ছেলেরা ফিরিয়া আসিলে কোথায় যে কাজ ফাঁদিবে তাহা ত জানিনা। বাংলাদেশে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় জমি পাওয়া অসম্ভব বলিয়াই বুঝিয়াছি। আমাদের নিজের জমিদারীতে কোনো আশা নাই। অন্যত্র ততোধিক। যদি জমি না পাওয়া যায় তবে রথীকে আমাদের জমিদারীতে প্রজাদের উন্নতি সাধনের কাজে নিযুক্ত করিয়া দিব।

বঙ্গদর্শনের নাগপাশে আমাকে আর জড়াইবার চেষ্টা করিয়োনা। কলম ছুঁইতে আর ভালই লাগেনা। কিছুকাল সকল কাজেই ইস্তাফা দিয়া বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচিতাম— কিন্তু কাজ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

কলিকাতায় আসিয়া অবধি একমুহূর্ত্ত বিশ্রামের অবকাশ পাই নাই— অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছি। তোমাকে চিঠি লিখিতেছি পার্শ্বে প্রবোধ বসিয়া বকিতেছে। তাহাকে তোমার নবকুমারীর জন্মলাভের সংবাদ দিয়াছি— সে এই শুভ ঘটনায় মিষ্টান্ন প্রত্যাশা করিতেছে। ইতি ২৮ শে চৈত্র ১৩১৪

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক
BOLPUR
15 SE. 08

ভ্রাতঃ

ভোলাকে এবার ছুটির সময় আমাদের সঙ্গে শিলাইদহে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। সে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। বৌঠাকুরানীর অভিমত কি? ছুটির সময় তিনি যদি ভোলাকে কাছে না পাইলে অভাব বোধ করেন তবে সে কথা ভোলাকে বুঝাইয়া লিখিয়ো— নতুবা আমাদের সঙ্গে গেলে হয়ত তাহার উপকার হইতে পারে। তোমাদের খবর অনেকদিন পাই নাই। ডুমকা কেমন লাগিতেছে? কাজ-কর্ম্মের অবস্থা কিরূপ? ছুটির পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে শারদোৎসব হইবে তাহারই আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া আছি। ইতি ৩১শে ভাদ্র ১৩১৫

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রে উল্লেখিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শৈলেশ॥ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার: শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রকাশিত হলে তার কার্যভার এঁর উপর পড়ে। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় শ্রীশচন্দ্র 'নিবেদনে' লিখেছিলেন— "এক্ষণে রাজকার্য্যোপলক্ষে আমি কলিকাতা হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছি, পূর্ব্ববৎ স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিব না। সেইজন্য অনুজ শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম।" ইতিপূর্বে শৈলেশচন্দ্র কলকাতায় পুস্তক প্রকাশের কাজ শুরু করেছিলেন।

মীরা॥ কবির কনিষ্ঠা কন্যা

সুরেন॥ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর: কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র

শমী॥ কবির কনিষ্ঠ পুত্র: আলোচ্য পত্রে শমীকে মুঙ্গেরে পাঠাবার প্রস্তাব চলেছে, কয়েক সপ্তাহ পরে এইখানেই শমীর মৃত্যু হয়।

জগদানন্দ॥ জগদানন্দ রায়. শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক

সুবোধ॥ সুবোধচন্দ্র মজুমদার: আশ্রমের অধ্যাপক

মহারাজ মণীন্দ্র॥ কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। বহরমপুরে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে' রবীন্দ্রনাথকে সভাপতিত্ব করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। বহরমপুরে এই অধিবেশন হয় ১৭-১৮ কার্তিক ১৩১৪

দ্বিজেন্দ্রবাবু॥ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

রথী॥ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্তোষ॥ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার: শ্রীশচন্দ্রের পুত্র· শান্তিনিকেতনের প্রথম ছাত্রবর্গের অন্যতম।

ভোলা॥ সরোজচন্দ্র মজুমদার: সন্তোষচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা

ভগিনী নিবেদিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অল্পদিনমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনরি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম, ইংরেজি, এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে কোনো-একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।

মোটের উপর তাঁহার সেই মতের সঙ্গে আমার মতে অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসংগত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় তো জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা তো সাধারণ শিক্ষকের কর্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটা রকমে কাজ চালাই। তাহাতে অন্ধকারে ঢেলা মারা হয়— তাহাতে অনেক ঢেলা অপব্যয় হয়, এবং অনেক ঢেলা ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহত করে। মানুষের মতো চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতরো পাইকারি ভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।

যদিচ আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা বেশ, আপনার নিজের প্রণালী মতোই কাজ করিবেন, আমি কোনো প্রকার ফরমাশ করিতে চাই না। বোধ করি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন অনুকূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, না, আমার এ কাজ নহে।

বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন— সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনরির মতো মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে, কোনো একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষ্যকে, তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিলেন।

তাহার পরে মাঝে মাঝে নানাদিক দিক দিয়া তাঁহার পরিচয়-লাভের অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর-একটি জিনিস ছিল, সেটি

তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন— মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, এক দিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর-এক দিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।

নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনো প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কী, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস আমরা যাহা কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দরদস্তুর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড়ো তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহৎজীবন; তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই; প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সেজন্য মানুষ যত প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন— নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না— নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছু না— ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।

এই যে এতবড় আত্মবিসর্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি ইহাকে আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়া ঘটিবে না। এই আত্মবিসর্জনকে অত্যন্ত অসংকোচে নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়া অচেতনভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড়ো একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কী বুদ্ধি, কী হৃদয়, কী ত্যাগ, প্রতিভার কী জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

যদি তাহা উপলব্ধি করি তবে আমাদের গর্ব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনও আমরা গর্ব করিতেছি।

তিনি যে আপনার জীবনকে এমন করিয়া দান করিয়াছেন সে দিক দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে আমরা যে পরিমাণে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি না, সে পরিমাণে এই ত্যাগস্বীকারকে আমাদের গর্ব করিবার উপকরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা বলিতেছি তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড়ো কম লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমাদেরই ধর্ম ও সমাজের মহত্ত্ব। এমনি করিয়া আমরা নিজের দিকের দাবিকেই যত বড়ো করিয়া লইতেছি তাঁহার দিকের দানকে ততই খর্ব করিতেছি।

বস্তুত তিনি কী পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে— অর্থাৎ আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন এ কথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন— তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুষেয় অটল বেড়া ভেদ করিয়া যেরূপ সংস্কারমুক্ত চিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমানকালে যাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড়ো করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু নির্বিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।

যেমনই হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড়ো ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে, হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।

তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে যেটা চক্ষে পড়ে সেটা এই যে, তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবল ভাবে কর্মী ছিলেন। কর্মের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছেই কেননা তাহাকে বাধার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়—সেই বাধার নানা ক্ষতচিহ্ন তাহার সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু ভাব জিনিসটা অক্ষুণ্ণ অক্ষত। এই জন্য যাহারা ভাববিলাসী তাহারা কর্মকে অবজ্ঞা করে অথবা ভয় করিয়া থাকে। তেমনি আবার বিশুদ্ধ কেজো লোক আছে তাহারা ভাবের ধার ধারে না, তাহারা কর্মের কাছ হইতে খুব বড়ো জিনিস দাবি করে না বলিয়া কর্মের কোনো অসম্পূর্ণতা তাহাদের হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না।

কিন্তু ভাবুকতা যেখানে বিলাসমাত্র নহে, সেখানে তাহা সত্য, এবং কর্ম যেখানে প্রচুর উদ্যমের প্রকাশ বা সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনামাত্র নহে, যেখানে তাহা ভাবেরই সৃষ্টি, সেখানে তুচ্ছও কেমন বড়ো হইয়া উঠে এবং অসম্পূর্ণতাও মেঘপ্রতিহত সূর্যের বর্ণচ্ছটার মতো কিরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশমান হয় তাহা ভগিনী নিবেদিতার কর্ম যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

ভগিনী নিবেদিতা যে-সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনোটারই আয়তন বড়ো ছিল না, তাহার সকলগুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম, সেখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড়ো আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারে সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকারে বড়ো করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ

করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড়ো করিয়া দেখাইতে হইলে যে-সকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয় তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

এই জন্যই এই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মতো একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নিচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না এও সেইরূপ। তাঁহার এই কাজটিকে তিনি বাহিরে কোনো দিন ঘোষণা করেন নাই এবং আমাদের কাহারও নিকট হইতে কোনো দিন ইহার জন্য তিনি অর্থসাহায্য প্রত্যাশাও করেন নাই। তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে।

তাঁহার শক্তি অল্প বলিয়াই যে তাঁহার অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র ইহা সত্য নহে।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, ভগিনী নিবেদিতার যে ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি নিজের দেশে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার যে-কোনো স্বদেশীয়ের নিকটসংস্রবে তিনি আসিয়াছিলেন সকলেই তাঁহার প্রবল চিত্তশক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট যে খ্যাতি তিনি জয় করিয়া লইতে পারিতেন সে দিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন নাই।

তাহার পর এ দেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া এখানেও তিনি যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবেন সে ইচ্ছাও তাঁহার মনকে লুব্ধ করে নাই। অন্য য়ুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন— তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই— তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে। কিন্তু শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। কারণ, দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা অপহরণ করিয়া লয়।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই। অথচ নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূর্বেই এ কথার আভাস দিয়াছি, তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত। তাঁহার এই পাশ্চাত্য-স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোনো অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না— কারণ, যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু— তৎসত্ত্বেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যাহা ভালো মনে করিতেন তাহাকেই জয়ী করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত জোর দিয়া লড়াই করিতেন, সেই জয়গৌরব নিজে লইবার লোভ তাঁহার লেশমাত্র ছিল না। দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতরকার সেই সত্যের আসন

হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই। এ দেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।

অথচ তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহার মধ্যে রুচিগত বা বুদ্ধিগত আভিজাত্যের অভিমান ছিল;— তিনি জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়াই যে তাহাদের নেতার পদের জন্য উমেদারি করেন নাই তাহা নহে। জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড়ো সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত— এ সম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্যবুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালোবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই "পীপ্‌ল"কে এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।

বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালোবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমনকি জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই— তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

আমরা যখন দেশ বা বিশ্বমানব বা ওইরূপ কোনো-একটা সমষ্টিগত সত্তাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন তাহাকে যে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া দেখি তাহার কারণ আছে। আমরা এইরূপ বৃহৎ ব্যাপক সত্তাকে কেবলমাত্র মন দিয়াই দেখিতে চাই, চোখ দিয়া দেখি না। যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটিরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমানরমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে— কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।

লোকসাধারণ ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের ধন ছিল বলিয়াই তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়া অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি তাহাদের সংস্রব চাহিতেন, তাহাদিগকে সর্বতোভাবে জানিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত মনকে তাহাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেন। তিনি তাহাদের ধর্মকর্ম কথাকাহিনী পূজাপদ্ধতি শিল্পসাহিত্য তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কেবল বুদ্ধি দিয়া নয় আন্তরিক মমতা দিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যাহা-কিছু ভালো, যাহা-কিছু সুন্দর, যাহা-কিছু নিত্য

পদার্থ আছে তাহাকেই তিনি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁজিয়াছেন। মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং একটি গভীর মাতৃস্নেহবশতই তিনি এই ভালোটিকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন। এই আগ্রহের বেগে কখনো তিনি ভুল করেন নাই তাহা নয়, কিন্তু শ্রদ্ধার গুণে তিনি যে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন সমস্ত ভুল তাহার কাছে তুচ্ছ। যাঁহারা ভালো শিক্ষক তাঁহারা সকলেই জানেন শিশুর স্বভাবের মধ্যেই প্রকৃতি একটি শিক্ষা করিবার সহজ প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, শিশুদের চঞ্চলতা, অস্থির কৌতূহল, তাহাদের খেলাধুলা সমস্তই প্রাকৃতিক শিক্ষাপ্রণালী; জনসাধারণের মধ্যে সেই প্রকারের একটি শিশুত্ব আছে। এই জন্য জনসাধারণ নিজেকে শিক্ষা দিবার ও সান্ত্বনা দিবার নানা প্রকার সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। ছেলেদের ছেলেমানুষি যেমন নিরর্থক নহে— তেমনি জনসাধারণের নানাপ্রকার সংস্কার ও প্রথা নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তা নহে— তাহা আপনাকে নানা প্রকারে শিক্ষা দিবার জন্য জনসাধারণের অন্তর্নিহিত চেষ্টা— তাহাই তাহাদের স্বাভাবিক শিক্ষার পথ। মাতৃহৃদয়া নিবেদিতা জনসাধারণের এই-সমস্ত আচার-ব্যবহারকে সেই দিক হইতে দেখিতেন। এইজন্য সেই-সকলের প্রতি তাঁহার ভারি একটা স্নেহ ছিল। তাহার সমস্ত বাহ্যরূঢ়তা ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির চিরন্তন গূঢ় অভিপ্রায় তিনি দেখিতে পাইতেন।

লোকসাধারণের প্রতি তাঁহার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা এক দিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর-এক দিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্মমভাবে কেহ ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না— অথবা যেখানে রাজার কোনো অন্যায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কত লোকের কাছে হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্যলোকের অসংগত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন; কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার 'পীপ্‌ল'দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা-কিছু ভালো তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধাদৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন। তাহার কারণ এ নয় যে সত্য গোপন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তিনি জানিতেন অশ্রদ্ধার দ্বারা ইহাদিগকে অপমান করা অত্যন্ত সহজ এবং স্থূলদৃষ্টি লোকের পক্ষে তাহাই সম্ভব কিন্তু ইহাদের অন্তঃপুরের মধ্যে যেখানে লক্ষ্মী বাস করিতেছেন সেখানে তো এই-সকল শ্রদ্ধাহীন লোকের প্রবেশের অধিকার নাই— এই জন্যই তিনি এই-সকল বিদেশীয় দিঙ্‌নাগদের "স্থূলহস্তাবলেপ" হইতে তাঁহার এই আপন লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, এবং আমাদের দেশের যে-সকল লোক বিদেশীর কাছে এই দীনতা জানাইতে যায় যে, আমাদের কিছুই নাই এবং তোমরাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার তীব্ররোষের বজ্রশিখার দ্বারা বিদ্ধ করিতে চাহিতেন।

এমন য়ুরোপীয়ের কথা শোনা যায় যাঁহারা আমাদের শাস্ত্র পড়িয়া, বেদান্ত আলোচনা করিয়া, আমাদের কোনো সাধুসজ্জনের চরিত্রে বা আলাপে আকৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তি লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছেন; অবশেষে দিনে দিনে সেই ভক্তি বিসর্জন দিয়া রিক্তহস্তে দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহারা

ভগিনী নিবেদিতা

১৮৬৭-১৯১১

শাস্ত্রে যাহা পড়িয়াছেন সাধুচরিতে যাহা দেখিয়াছেন সমস্ত দেশের দৈন্য ও অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করিয়া তাহা দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের যে ভক্তি সে মোহমাত্র, সেই মোহ অন্ধকারেই টি'কিয়া থাকে, আলোকে আসিলে মরিতে বিলম্ব করে না।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার যে শ্রদ্ধা তাহা সত্যপদার্থ, তাহা মোহ নহে— তাহা মানুষের মধ্যে দর্শন-শাস্ত্রের শ্লোক খুঁজিত না, তাহা বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া মর্মস্থানে পৌঁছিয়া একেবারে মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিত। এই জন্য অত্যন্ত দীন অবস্থার মধ্যেও আমাদের দেশকে দেখিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। সমস্ত দৈন্যই তাঁহার স্নেহকে উদ্বোধিত করিয়াছে, অবজ্ঞাকে নহে। আমাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, বেশভূষা, আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ একজন য়ুরোপীয়কে যে কিরূপ অসহ্যভাবে আঘাত করে তাহা আমরা ঠিকমতো বুঝিতেই পারি না, এই জন্য আমাদের প্রতি তাহাদের রূঢ়তাকে আমরা সম্পূর্ণই অহেতুক বলিয়া মনে করি। কিন্তু ছোট ছোট রুচি, অভ্যাস ও সংস্কারের বাধা যে কত বড় বাধা তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, কারণ নিজেদের দেশের ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন জাতির সম্বন্ধে আমাদের মনেও সেটা অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে। বেড়ার বাধার চেয়ে ছোট ছোট কাঁটার বাধা বড়ো কম নহে। অতএব এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতার বাঙালিপাড়ার এক গলিতে একেবারে আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া যে বাস করিতেছিলেন তাহার দিনে রাত্রে প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র বেদনার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল। একপ্রকার স্থূলরুচির মানুষ আছে তাহাদিগকে অল্প কিছুতেই স্পর্শ করে না— তাহাদের অচেতনতাই তাহাদিগকে অনেক আঘাত হইতে রক্ষা করে। ভগিনী নিবেদিতা একেবারেই তেমন মানুষ ছিলেন না। সকল দিকেই তাঁহার বোধশক্তি সূক্ষ্ম এবং প্রবল ছিল ; রুচির বেদনা তাঁহার পক্ষে অল্প বেদনা নহে ; ঘরে বাহিরে আমাদের অসাড়তা শৈথিল্য অপরিচ্ছন্নতা, আমাদের অব্যবস্থা ও সকল প্রকার চেষ্টার অভাব— যাহা পদে পদে আমাদের তামসিকতার পরিচয় দেয় তাহা প্রত্যহই তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেইখানেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা এই যে প্রতিমুহূর্তের পরীক্ষা, ইহাতে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন।

শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল— তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই ; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন— ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই-সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না ; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে ?

একদিন স্বয়ং মহেশ্বর ছদ্মবেশে তপঃপরায়ণা সতীর কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বী, তুমি যাঁহার জন্য তপস্যা করিতেছ তিনি কি তোমার মতো রূপসীর এত কৃচ্ছ্রসাধনের যোগ্য? তিনি যে দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিরূপ, তাঁহার যে আচার অদ্ভুত। তপস্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য হইতে পারে, তথাপি তাঁহারই মধ্যে আমার সমস্ত মন "ভাবৈকরস" হইয়া স্থির রহিয়াছে।

শিবের মধ্যেই যে-সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে তিনি কি বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্যদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল; এই জন্যই তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে যাঁহার রূপের অভাব দেখিয়া রুচিবিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে চলিয়া যায় তিনি তাঁহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।

আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই যে তপস্যা দেখিলাম তাহাতে আমাদের বিশ্বাসের জড়তা যেন দূর করিয়া দেয়— যেন এই কথাটিকে নিঃসংশয় সত্যরূপে জানিতে পারি যে মানুষের মধ্যে শিব আছেন, দরিদ্রের জীর্ণকুটিরে এবং হীনবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীর মধ্যেও তাঁহার দেবলোক প্রসারিত— এবং যে ব্যক্তি সমস্ত দারিদ্র্য বিরূপতা ও কদাচারের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া এই পরমৈশ্বর্যময় পরম-সুন্দরকে ভাবের দিব্য দৃষ্টিতে একবার দেখিতে পাইয়াছেন তিনি মানুষের এই অন্তরতম আত্মাকে পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং যাহা-কিছু আছে সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া বরণ করিয়া লন।[১] তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন, আরামকে তুচ্ছ করেন, সংস্কারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্তকালের জন্য দৃক্‌পাতমাত্র করেন না।

১৩১৮

[১] তদেতৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

নিবেদিতা : প্রজ্ঞাপারমিতা

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মহত্ত্বের উপলব্ধি আর-এক মহৎ-হৃদয়ের অনুভবসাপেক্ষ। সে অনুভব অন্য সবার হৃদয়ে সঞ্চার করতে পারাও আপন মহিমারই নিশ্চিত প্রমাণ। মনুষ্যত্বের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল ব্যক্তিমাত্রেরই এই বৈশিষ্ট্য— যা শ্রেষ্ঠতম, তাকে চিনতে পারা, তার দ্বারা নিজে আলোকিত হওয়া, সে-আলোকে নিখিল মানবপ্রাণকে উদ্ভাসিত করা।

শ্রদ্ধার এই শক্তি উপনিষদের নচিকেতার মতো আপন আত্মবিশ্বাসের অটল নির্ভরভূমিতে দাঁড়িয়ে পরম-জিজ্ঞাসার আলোকে সত্যকে যাচাই করে নেয়। তখনই প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা ঘটে। বিচিত্র পন্থায় এই সত্যানুসন্ধানের দ্বারা বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস গড়ে উঠেছে। সে ইতিহাসের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য— দুটি প্রান্ত, আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ড— আঠারো শতকের শেষার্ধে মিলিত হয়েছিল।

সে মিলনের প্রথম পর্বে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের পটভূমিকায় এক সুপ্রাচীন অভিজাত ঐতিহ্যের সম্মুখীন বিস্ময়াহত বিদেশীর সভ্যতাগর্ব অচিন্তনীয়। অবাধ শোষণের সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তখন একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ছিলাম আমরাই প্রথম, তাই অন্ধ অনুকরণের আবর্তে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শিক্ষিতসমাজ প্রধানতঃ ঋণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো ব্যতিক্রম সে যুগে ছিল। তবু অনুকরণের যুগ পেরিয়ে আত্মস্থ স্বীকরণের যুগ দেখা দিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। জাতি ধর্ম সাহিত্য সমাজ— সর্বত্রব্যাপ্ত যে স্বদেশপ্রাণতা এ যুগের মূলপ্রেরণা, তারই প্রতীকরূপে দেখা দিলেন এক দিকে রবীন্দ্রনাথ, আর-এক দিকে স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের আবির্ভাবের মাত্র চার বৎসর পরে, ২৮শে অক্টোবর ১৮৬৭, ভগিনী নিবেদিতার জন্ম আয়ার্ল্যাণ্ডের নোব্‌ল পরিবারে। তাৎপর্যের দিক থেকে পৃথক হলেও একই ইংল্যাণ্ডের অধীনতাসূত্রে কাছের আয়ার্ল্যাণ্ড ও দূরের ভারতবর্ষের কোথাও একটু মিল ছিল। বিশ্বসংস্কৃতির আপাত বিপরীত যে দুটি প্রান্তের সমন্বয় বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সাধনায় প্রতিভাত, উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিলগ্নে তা ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা।

রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ— ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ভারত-সংস্কৃতির যে বক্তব্য ইংল্যাণ্ড তথা য়ুরোপ-আমেরিকার মননশীলসমাজে তুলে ধরেছিলেন, নিবেদিতার মনস্বিতায় তার এক মিলিত ফলশ্রুতি ভারতের যথার্থস্বরূপ ও উপলব্ধির বাণী নিয়ে বিশ্বসভায় উপস্থাপিত। অবশ্য নিবেদিতার কাছে এই ভারতমন্ত্রের উদ্গাতা তাঁর আচার্য স্বামী বিবেকানন্দই প্রধানতম ও একতম। তবু নবীন ব্রাহ্মসমাজ ও প্রাচীন হিন্দুসমাজ মিলে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার যে পটভূমি সৃষ্টি করেছিল, নিবেদিতার জীবনে ও মননে তার মূল্য অপরিসীম।

ভারত-ইতিহাসের প্রতিটি পর্বে মানবচিন্তার বিপ্লব বা আমূল সংস্কারপ্রয়াস নানা ধর্মান্দোলনের

মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিবেকানন্দের ভাষায়—'ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এদেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এদেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।' —বর্তমান ভারত

ইতিহাসের এই শোভাযাত্রায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম আজ অবশ্য সংযোজনীয়। ভারতের জাতীয় বিপ্লব প্রথমে ধর্মের নামে আত্মপ্রকাশ করে— বিবেকানন্দের এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি নিবেদিতার ভারত-দর্শনের প্রধান সূত্র।

উত্তরকালে স্বামীজির সঙ্গে হিমালয়ভ্রমণের সময় নিবেদিতা বিবেকানন্দমানসে রামমোহন রায়ের প্রভাব সম্বন্ধে শুনেছিলেন— "...we heard a long talk on Ram Mohun Roy, in which he pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu. In all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Ram Mohun Roy had mapped out."[১] আচার্য রামমোহনের চিন্তাধারার তিনটি মূলসূত্র— বেদান্তস্বীকৃতি, স্বদেশপ্রেমপ্রচার এবং হিন্দু-মুসলমানে সমান ভালোবাসা বিবেকানন্দের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

প্রথম যৌবনে তরুণ নরেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মসাধকবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের 'যোগীর চক্ষু' মহর্ষির দৃষ্টিতে উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিনি বিধিবদ্ধ সভ্য ছিলেন। তবু ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গেই কলেজের শিক্ষাগুরু হেস্টিসাহেবের উল্লেখিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজারী সমাধিমান শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহসান্নিধ্য লাভে তাঁর মানসপরিবর্তন ঘটতে থাকে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ; বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ; পুরাকালের ব্রহ্মজ্ঞানী এবং ইদানীংকালের ব্রহ্মজ্ঞানী, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান— 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে বিবেকানন্দ-হৃদয়ে ঈশ্বরের নিশ্চিত অভিজ্ঞান তুলে ধরল। ভারতসংস্কৃতির সমন্বয়চেতনার আধুনিকতম প্রবক্তারূপেই বিশ্বসভায় তাঁর আত্মপ্রকাশ।

নিবেদিতার ভারতাত্মার অনুধ্যান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও মননালোকে। স্বভাবতঃই ভারতের চিরন্তন গ্রহণশক্তির প্রমাণ তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের পারস্পরিক প্রভাবে, মুসলমান রাজশক্তির ছত্রতলে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভারত-চেতনায় এবং বিশেষ করে সম্পূর্ণ বিদেশী ইংরেজ আমলে শ্রীরামকৃষ্ণের সকল পথ ও মতের পরমলক্ষ্যগত ঐক্যসাধনায় অনুভব করেছেন—"...the personality that the nineteenth century has revealed as the turning point of the national development is that of Ramakrishna Paramahamsa,[২] whose name stands as

১ *Notes of Some Wanderings With The Swami Vivekananda*: Nivedita: Ch. II.

২ এইখানে নিবেদিতার নিজস্ব পাদটীকা—Ramakrishna Paramahamsa lived in a temple-garden outside Calcutta from 1853 to 1886. His teachings have already become a great intellectual force.

another word for the synthesis of all possible ideas and all possible shades of thought. In this great life, Hinduism finds the philosophy of Sankaracharya clothed upon with flesh, and is made finally aware of the entire sufficiency of any single creed or conception to lead the soul to God as its true goal. Henceforth, it is not true that each form of life or worship is tolerated or understood by the Hindu mind, each form is justified, welcomed, set up for its passionate loving, for evermore···At last, then, Indian thought stands revealed in its entirety— no sect, but a synthesis; no church but a university of spiritual culture— as an idea of individual freedom, amongst the most complete that world knows."[৩]

'জাতীয় প্রগতির ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী রামকৃষ্ণ পরমহংসের মাধ্যমে এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল; এই নামটি যাবতীয় সম্ভাব্য আদর্শ ও সমস্ত ধরণের চিন্তাধারার সমন্বয়ের প্রতীক। হিন্দুধর্ম এই মহাজীবনে শাঙ্করদর্শনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি প্রত্যক্ষ করেছে, আর সেইসঙ্গে, যে কোনো একটি আদর্শ বা পন্থাই যে আত্মার ঈশ্বরোপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট, সেই সত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। এর পর থেকে হিন্দুধর্ম শুধু অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুই রইল না, সকল পন্থাকেই সঙ্গত জেনে গভীরতর প্রীতির সঙ্গে স্বাগত জানাল। সম্প্রদায় নয় সমন্বয়; বিশেষ কোনো উপাসনামন্দির নয়, বরং অধ্যাত্মসংস্কৃতির এক বিশ্ববিদ্যালয়; বিশ্ব-ইতিহাসে পূর্ণতম ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকাশরূপে ভারতীয় মননধারা অবশেষে আপন সমগ্রতায় প্রকাশিত হল।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার বিশ্বজনীনতা নিবেদিতার দৃষ্টিতে আধুনিক পৃথিবীর দ্বন্দ্বজটিল পরিবেশে মানবজাতির অন্তর্নিহিত ঐক্যসন্ধানের পরমসহায়করূপে প্রতিভাত হয়েছে। বিবেকানন্দের চিকাগো-বক্তৃতা এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যই জগতের প্রতি ভারতের বাণী—'একম্ সৎ'; সত্য এক। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম -প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নিবেদিতার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— It must never be forgotten that it was the Swami Vivekananda who, while proclaiming the sovereignty of the Advaita Philosophy as including that experience in which all is one without a second, also added to Hinduism the doctrine that Dvaita, Vishistadvaita, and Advaita are but three phases or stages in a single development, of which the last name constitutes the goal. This is part and parcel of the still great and more simple doctrine that the many and the one are the same Reality, perceived by the mind at different times and in different attitudes or as Shri Ramkrishna expressedt he same thing, "God is both with form and without form. And

৩ *The Web of Indian Life*: The Synthesis of Indian Thought অধ্যায়।

He is that which includes both form and formlessness." (এ কথা কখনোই ভুললে চলবে না যে, এক অদ্বয়সত্তার প্রবক্তা অদ্বৈতদর্শনের চূড়ান্ত অধিকার ঘোষণা করেও স্বামী বিবেকানন্দই হিন্দুধর্মে এই উপলব্ধিটুকু যোগ করে দিয়েছেন যে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত একটি ক্রমবিকাশেরই তিনটি বিভিন্ন স্তর মাত্র— এদের মধ্যে শেষোক্ত অদ্বৈতই চরম লক্ষ্যস্থল। পূর্বোক্ত কথাগুলি আসলে— বহু এবং এক যে একই সত্তা, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপলব্ধ একই সত্য—এই মহত্তর ও সরলতর ধর্মচেতনারই অঙ্গস্বরূপ। অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, "ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার। তাঁর মধ্যে সাকার ও নিরাকার দুইই রয়েছে।")

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতের সোপানপরম্পরায় ভারতের অধ্যাত্মসংস্কৃতি সাধারণতম মানুষ থেকে উচ্চতম প্রজ্ঞার অধিকারী সর্বশ্রেণীর মানব-ভাবনাকেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার মাধ্যমে আশ্রয় দিয়েছে। ধর্ম বা দর্শন এখন মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর করতলগত না থেকে জীবনের সমগ্র প্রকাশকেই অবলম্বন করেছে। যে বেদান্তচর্চা শুধু সাধকসমাজেরই চিন্তনীয় বিষয় ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণায় বিবেকানন্দ সে বেদান্তকে মুচি, মেথর, জেলে, চাষী, ছাত্র, অধ্যাপক, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান— সকল পথ ও মতের মানুষের আত্মোপলব্ধির সহায়ক করে তুলেছেন।

নিবেদিতার মতে এইখানে বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের, অতীত ও ভবিষ্যতের সমন্বয়তীর্থ হয়ে উঠেছেন। বহু ও এক যদি একই পরমসত্য হয়ে থাকে, তাহলে শুধুমাত্র উপাসনাই নয়, সব ধরণের কর্মপদ্ধতি, সমস্ত রকমের সংগ্রাম, যাবতীয় সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। "To him there is no difference between service of man and worship of God, between manliness and faith, between true righteousness and spirituality." (তাঁর [বিবেকানন্দের] কাছে মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায়, পৌরুষে ও বিশ্বাসে, সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোনো পার্থক্য নেই।)

গুরুর এ আদর্শ তাঁর মানসকন্যার মননে ও জীবনে পরিপূর্ণ রূপায়িত হয়েছিল সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দের মতই নিবেদিতার জীবনেও জ্ঞান ও ভক্তি তাঁর বিপুল কর্মযোগের প্রেরণা ও পরিপূরক।

বিবেকানন্দের রচনাবলীর ভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গুরুর আর-একটি বাণী বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন—"Art, science, and religion are but three different ways of expressing a single truth. But in order to understand this we must have the theory of Advaita." পরম সত্যের উপাসিকা তাঁর অনুপ্রাণনায় কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাধক, দেশপ্রেমিক, সন্ন্যাসী—সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে কি সেই সত্যই প্রমাণ করে যান নি?

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক সম্পর্কচ্ছেদের পর আত্মপরিচয় রূপে তিনি লিখতেন Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা)।[৪] সন্দেহ নেই,

৪ স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অনুযায়ী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ রাজনৈতিক কর্মধারা সম্পূর্ণ পরিহার করেছিলেন। অপর পক্ষে ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে রাজনৈতিক সংস্রব ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। তাই বাহ্যত: এই বিচ্ছেদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ অব্যাহত ছিল। তাঁর বিদ্যালয় পরিচালনায় যেমন সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষের সহায়তা সদাজাগ্রত ছিল, তেমনি বিবেকানন্দ-জীবন ও রচনাবলী সম্পাদনায় সঙ্ঘের মায়াবতী কেন্দ্রে থেকে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ একটি কাজ সম্পন্ন করেছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দময় তাঁর জীবনে এ বিচ্ছেদ একান্ত বহিরঙ্গ।

এই পরিচয়ই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়। সে পরিচয়ের এক দিকে পাঁচ হাজার বৎসরের ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ঘনীভূত উপলব্ধি, আর-এক দিকে বিশ্বকল্যাণে আত্মোৎসর্গের ত্যাগসুন্দর আদর্শ। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'— ভারতীয় সন্ন্যাসের এ আদর্শকে ব্রহ্মচারিণী (Sister কথাটির মূল তাৎপর্য তাই) নিবেদিতা তাঁর গুরু ও পরমগুরু বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের পন্থানুসরণে সম্পূর্ণ 'জগদ্ধিতায়' — জগৎকল্যাণের সাধনায় রূপান্তরিত করেছিলেন। আপন মুক্তির জন্য ব্যাকুল না হয়ে বিশাল বটের মতো বিশ্বমানবকে ছায়াদানের ব্রতে বিবেকানন্দকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। 'দয়া' নয়, 'সেবা'। বিবেকানন্দ সেই 'সেবা'কেই বলেছেন 'পূজা'। আর এই মহাপূজার অর্ঘ্যস্বরূপ তিনি ভারত ও সমগ্র জগতের কাছে তাঁর 'নিবেদিতা'কে উৎসর্গ করেছিলেন। বেলুড় মঠে (তখন মঠ বৃন্দাবন বাবুর বাগানবাড়িতে) মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌লের 'নিবেদিতা'-রূপান্তরের মুহূর্তে বিবেকানন্দ তাঁর হৃদয়ে ভগবান বুদ্ধের আদর্শটি চিরপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন— "যাও সেই বুদ্ধকে অনুসরণ করো— বুদ্ধত্বলাভের আগে যিনি পাঁচ শো বার অন্যের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রাণ আহুতি দিয়েছিলেন!" নিবেদিতার কাছে সেই দিনের সকালটি 'জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় প্রভাত'।[৫] এক জনমে তাঁর 'জন্ম-জন্মান্তর' ঘটে গেল।

ভারতীয় গুরুবাদের দর্শন পূর্ব পূর্ব মহামানবদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিচ ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারার নানা অবক্ষয়ের মতো গুরুবাদেরও ব্যবসায়িক বিকার নানা কারণে ঘটেছে, তবু জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের যে মূল্য, অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে সে মূল্য আরও বহুগুণ বেশি। অন্ততঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতার গুরুপরম্পরা ভারতীয় গুরুবাদের মহনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের সবচেয়ে আশ্বস্ত করে। আপন গুরুর কাছে নিবেদিতা যে ইষ্টমন্ত্র লাভ করেছিলেন, তার শরীরীসত্তা সমগ্র ভারতবর্ষ। নিবেদিতার ধ্যানদৃষ্টি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের সর্বত্র আপন অভীষ্টের অনুসন্ধান করে ফিরেছে এবং তাঁর সেই অনুসন্ধানের ব্যাকুলতা ও ভক্তি নিবেদিতা-সাহিত্যের মূল অবলম্বন।

ভারতবর্ষকে ভালোবাসার যে আনন্দ তিনি বিবেকানন্দমানসে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে ভালোবাসা জাতীয় গৌরব ও বেদনাবোধের অংশীদার হলেও আসলে তা বিশ্বমানবের কল্যাণে উৎসর্গিত ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনার বাণী। বৈদিক যুগের উষাকাল থেকে যে অমৃত ভারতবর্ষ আপন হৃদয়ে ও মনীষায় অনুভব করেছে, বিশ্ববাসীকে তার অংশভাগী করার জন্য ভারতের ব্যাকুলতা বেদ উপনিষদ, এবং বুদ্ধ শংকর রামানুজ নানক চৈতন্য রামকৃষ্ণ প্রমুখ সাধকবৃন্দের মাধ্যমে বারংবার উচ্চারিত। ভারতবর্ষের এই নিজস্ব বাণী বর্তমান মানবসভ্যতার সঞ্জীবনীমন্ত্রস্বরূপ। বিশ্বসভ্যতার ধাত্রী এই ভারতবর্ষকে উপলব্ধির প্রয়োজন পাশ্চাত্যের প্রশ্নমুখর বর্তমানের পক্ষেই সবচেয়ে বেশি।

প্রতীচ্যের পক্ষ থেকে নিবেদিতার অসাধারণ মনীষা সেই উপলব্ধির ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে এসেছিল বলেই ভারতবর্ষও নিজেকে অনেক পরিমাণে চিনতে শিখেছে। আমাদের আজকের ভারত-অনুধ্যান জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁরই আত্মনিবেদনে অনেকখানি অনুপ্রাণিত।

বিদেশিনী নোবলের পক্ষে ভারতোপলব্ধির সাধনায় এই অসাধারণ সিদ্ধি তাঁর স্বকীয় অসাধারণত্বের পরিচায়ক হলেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারাই এ বিষয়ে তাঁর পথ নির্দেশ করেছে। প্রসঙ্গত একটি

৫ ২৫শে মার্চ, ১৮৯৮

বিশেষ দিনের বিবেকানন্দ-নিবেদিতার আলাপচারি স্মরণীয়। জোড়াসাঁকোয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে নিবেদিতার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দও চলেছেন। যাবার আগে স্বামীজি নিবেদিতাকে একটি মৃত্যুদৃশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, পূর্বদিন এই মৃত্যুঘটনায় নিবেদিতা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ওই ঘটনার পটভূমিকায় নিবেদিতার মনে এক নিগূঢ় সত্যের উদ্ভাসন ঘটেছিল— "religions are only languages, and we must speak to a man in his own language."[৬] (ধর্মসম্প্রদায়গুলি শুধু বিভিন্ন ভাষা মাত্র, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে আমাদের তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে হবে।) কথাটি শোনা মাত্র বিবেকানন্দের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, বললেন, "হ্যাঁ। আর শ্রীরামকৃষ্ণই শুধু সেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। একমাত্র তাঁরই এ কথা বলার সাহস ছিল যে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে হবে।"[৭]

নিবেদিতার চিন্তা ও বিবেকানন্দের সমর্থন প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র উপদেশ নয়, প্রধানতঃ ধর্মজীবন যাপনের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন সমন্বয়ধর্মের আদর্শ তাঁর মানসকন্যার অন্তরে সঞ্চার করে চলেছিলেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর হিমালয়-ভ্রমণ ও য়ুরোপ-যাত্রার স্মৃতি এ দিক থেকে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁর শিক্ষয়িত্রীজীবনের সাধনায় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতিও কত সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন সে কথাও তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ। সুতরাং ভারতের প্রাণ-স্পন্দনস্বরূপ ধর্মচেতনার প্রতিটি স্তর সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধান ও স্বীকরণের সাধনার সূত্রপাত হল। "I set myself therefore to enter into Kali-worship, as one would set oneself to learn a new language, or take birth deliberately, perhaps in a new race."[৮] ('লোকে যেমন করে নতুন কোনো ভাষা শেখে, অথবা হয়তো স্বেচ্ছায় নতুন কোনো জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, ঠিক তেমনি ভাবে আমি এই কালী-উপাসনার গভীরে প্রবেশ করতে চাইলাম।')

মানবসভ্যতার এই নূতন অথচ চিরপুরাতন ভাষাটি আয়ত্ত করতে প্রতিদিনের অভ্যাসে ও ধারণায় অতীত জীবনধারার কত শত পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছেন, তবু বিরামহীন সংগ্রামে প্রতীচ্যের কাছে প্রাচ্যবাণী প্রচারের এই ব্রত তিনি আমরণ উদ্‌যাপন করেছেন। এর ফলে তাঁর সাহিত্যকৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক বিচারের একটি সার্থক নিদর্শনে পরিণত। সেই সঙ্গে ভারতীয় চিন্তা ও চর্যার ব্যাখ্যায় তাঁর নিজস্ব দানও স্মরণীয়। কারণ, গুরুর কাছে প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ভাষাটি আবিষ্কারের রহস্য তাঁর অধিগত ছিল। মানবমনের সেই চাবিকাঠিটি ভারতীয় সাধনার ঐতিহ্যে নূতন আলোকপাতে সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় ধ্যানধারণার শিব ও শক্তি -কল্পনা সম্বন্ধে তাঁর অপূর্ব ব্যাখ্যা স্মরণীয়—As the Purush, or Soul, He is Consort and Spouse of Maya, Nature, the fleeting diversity of sense. It is in this relation that we find Him beneath the feet of Kali, His recumbent posture signifies inertness, the Soul untouched and indifferent to the external. Kali has been executing a wild dance of carnage…. Suddenly She has stepped unwittingly on the body of her Husband. Her foot

---

৬, ৭ *The Master as I saw Him*: The Swami and Mother Worship অধ্যায়।

৮ তদেব

is on his breast. He has looked up awakened by that touch, and they are gazing into each other's eyes.

…Her mass of black hair flows behind her like the wind, or like time, "the drift and passage of things." But to the great third eye even time is one, and that one, God. She is blue almost to blackness, like a mighty shadow. Deep into the heart of that Most Terrible, He looks unshrinking, and in the ecstasy of recognition. He calls Her Mother. So shall ever be the union of the soul with God.[৯]

('পুরুষ বা আত্মারূপে তিনি প্রকৃতি বা মায়ার—ইন্দ্রিয়জগতের বিচিত্র প্রকাশলীলার সহচর, স্বামী। এই সম্বন্ধেই আমরা তাঁকে কালীর চরণতলে দেখতে পাই। তাঁর প্রশান্ত ভঙ্গিমাটি নিষ্ক্রিয়তার প্রতীক। আত্মা বহির্জগতের প্রতি উদাসীন, অসম্পৃক্ত। কালী এক ভয়ঙ্কর সংহারনৃত্যে মত্ত ছিলেন।…সহসা অতর্কিতে তিনি তাঁর স্বামীর বুকে পা রেখেছেন। সেই স্পর্শে সচকিত শিব কালীর দিকে চোখ মেলে চাইলেন, স্থিরনেত্রে দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে রইলেন।

…মায়ের পুঞ্জ কৃষ্ণ কেশরাশি ঝড়ের মতো পিছন দিকে উড়ে চলেছে, অথবা 'সমস্ত বস্তুপ্রবাহ বহনকারী' সময়ের মতো ছুটে চলেছে। কিন্তু পরম ত্রিনয়নের দৃষ্টিতে কালও এক অখণ্ড, আর সেই একই ঈশ্বর। মায়ের নীলিমা ঘনকৃষ্ণের কাছাকাছি—এক বিশাল ছায়ার মতো। সেই মহা ভয়ঙ্করীর হৃদয়-গভীরে তিনি নির্নিমেষে চেয়ে আছেন। আর সেই উপলব্ধির সমাহিত আনন্দচেতনায় তিনি তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। আত্মা ও ঈশ্বরের এই তো চির-অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।')

নীলকণ্ঠের দিব্যদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত কালীর এই ধ্যানমূর্তি নিবেদিতামানসে মানবজীবনের চিরন্তন বেদনাসত্যের প্রতীকে পরিণত—"After all, has anyone of us found God in any other form than in this—the Vision of Siva? Have not the great intuitions of our life all come to us in moments when the cup was bitterest? Has it not always been with sobs of desolation that we have seen the Absolute triumphant in Love?"[১০] ('শেষ অবধি শিবের এই ধ্যানদৃষ্টিতে ছাড়া আর কোনো উপায়ে কি কেউ ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে? আমাদের জীবনের যত মহত্তম উপলব্ধি— তারা কি বেদনার পাত্রটি তিক্ততম রসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার মুহূর্তেই ধরা দেয় নি? সর্বরিক্ততার বুক-ভাঙা কান্নার মুহূর্তেই কি আমরা প্রেমের বিজয়ী-মূর্তিতে পরমতমের দর্শন লাভ করি নি?')

কালীপ্রতীকের এই ব্যাখ্যায় সহজেই বিবেকানন্দের The Cup, 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' এবং Kali, the Mother কবিতা তিনটি মনে পড়ে। বিশেষতঃ শেষোক্ত কবিতার শেষ ক'টি চরণ—

Who dares misery love,
And hug the form of Death,—

---

৯ *Kali the Mother*: The Vision of Siva.

১০ তদেব

Dance in destruction's dance
To him the Mother comes.[১১]

(সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।)[১২]

তবু নীলকণ্ঠ শিবের দিব্যদর্শন সম্ভূত কালীকল্পনার ব্যাখ্যাটি নিবেদিতার একান্ত নিজস্ব। স্বামীজির সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গেই একদিন নিবেদিতা প্রশ্ন করেছিলেন, "Perhaps, Swamiji, Kali is the Vision of Shiva! Is She?" ('স্বামীজি, কালী সম্ভবতঃ শিবের দিব্যদর্শন! তাই কি?')। মুহূর্তের জন্য বিবেকানন্দ নিবেদিতার দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর বললেন, "Well! Well! Express it in your own way, Express it in your own way." ('বেশ, বেশ, তোমার নিজের মতো করে প্রকাশ করো, তোমার নিজের মতো করে প্রকাশ করো।')[১৩] পরমসত্যের সাধনায় প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্য বিবেকানন্দ স্বীকার করতেন। নিবেদিতাকে এই স্বাধীন শিক্ষার দ্বারাই তিনি সবচেয়ে বেশি রূপান্তরিত করেছেন।

জগৎ ও জীবনের রহস্য-অনুসন্ধানে মানুষ বিভিন্ন দেশে ও কালে বিভিন্ন প্রতীক সৃষ্টি করেছে। পুরাতন লোকসংস্কৃতি, ব্রত-আচার-পার্বণ থেকে সেই প্রতীকরহস্যগুলি উপলব্ধি করতে না পারলে কোনো জাতির অন্তরঙ্গ ইতিহাস অনুধাবন করা যায় না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা ভারতের সেই প্রাণলোকের পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন তাঁর ***Kali the Mother, The Web of Indian Life, Footfalls of Indian History, Studies from an Eastern Home*** এবং অন্যান্য গ্রন্থসমূহে। ভারতবর্ষের নিজস্ব বাণী তাঁর কাছে ভারতের নানা প্রতীকচেতনার মাধ্যমে ধরা দিয়েছে। ***Kali the Mother*** গ্রন্থে এই প্রতীক-বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় তাঁর আর্ষ দৃষ্টি স্মরণীয়—"Our daily life creates our symbol of God. No two ever cover quite the same conception···yet we know how the tongue of each people expresses some one group of ideas with especial clearness, and ignores others altogether. Never do we find an identical strength and weakness repeated and always if we go deep enough, we can discover in the circumstances and habits of a country, a cause for its specific difference of thought or of expression."[১৪] ('দৈনন্দিন জীবন আমাদের ঈশ্বরের প্রতীক সৃষ্টি করে চলেছে। এই প্রতীকের নিহিতার্থ কখনো এক নয়।···তবু আমরা জানি, প্রত্যেকটি মানুষের ভাষাই কেমন করে বিশেষ এক ধরণের ভাবধারাকে প্রকাশ করে, অথচ অন্য জাতীয় ভাবধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়। একই ধরণের সবলতা বা দুর্বলতা কখনো পুনরাবৃত্ত হয় না। আর আমরা যদি আরো গভীরে সন্ধান করি, তাহলে বিশেষ কোনো ভাবনা বা প্রতীকের পটভূমিতে দেশবিদেশের পরিবেশ বা জীবনযাত্রার ধারাগুলি আবিষ্কার করতে পারি।')

---

১১ *Poems :* Swami Vivekananda. ১২ মৃত্যুরূপা মাতা— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-অনূদিত।

১৩ *The Master As I Saw Him :* The Swami and Mother Worship.

১৪ *Kali the Mother :* প্রথম প্রবন্ধ Concerning Symbols.

কিন্তু এই 'দেশ-দেখা-চোখ' আমাদের আপন দেশেই বিরল, কোনো বিদেশী ধর্মপ্রচারকের কাছে তো প্রত্যাশার অতীত। ভারত-পরিক্রমার সময়ে নিবেদিতা ভারতের নিজস্ব পুরাণ ও প্রতীকগুলির অর্থ উপলব্ধির আলোকে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বুঝতে চেয়েছেন। স্বভাবতঃই অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত একটু দ্রুত, প্রবল প্রীতির আগ্রহে অযোগ্যকেও যোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট। কিন্তু যে শ্রদ্ধার আলো চোখে না থাকলে কোনো ইতিহাস-দর্শনই সত্য হয় না, নিবেদিতার দৃষ্টিতে সেই আলো সঞ্চারিত হয়েছিল বলেই জাতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের একটি অখণ্ড ভাবমূর্তি তাঁর রচনাবলীতে ফুটে উঠেছে।

নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতে যীশুখৃষ্টের আদর্শ আপনা থেকেই প্রচারিত হয়েছে, বিদেশী মিশনরিদের সে সম্বন্ধে ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে খৃষ্টধর্মপ্রচার যদি সম্ভব না হয়, তাহলে এ জাতীয় প্রচারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের বিমুখতাই স্বাভাবিক। বিদেশী মিশনরিদের উদ্দেশে ধর্মপ্রচারের যে আদর্শ তিনি উপস্থাপিত করেছেন, সে আদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাঁরই জীবন। *Lambs Among Wolves* পুস্তিকাটিতে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—"Let them love the country as if they had been born in it, with no other difference than the added nobility that a yearning desire to serve and save might give. Let them become loving interpreters of her thought and custom, revealers of her own ideals to herself even while they make them understood by others. When a man has the insight to find and to follow the hidden lines of race-intention for himself, others are bound to become his disciples, for they recognise in his teachings their own aspirations."

('এমন ভাবে তাঁরা [মিশনরিরা] এ দেশকে ভালোবাসতে শিখুন, যেন এ দেশই তাঁদের জন্মভূমি ; আর কোনো পার্থক্য নয়, শুধুমাত্র সেবা ও ত্রাণের জন্য এক বিপুল আগ্রহের মহিমা তাঁদের থাকুক। এ দেশের চিন্তা ও চর্যাকে তাঁরা গভীর ভালোবাসার দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করুন, বাইরের পৃথিবীর কাছে সে ব্যাখ্যা যেন এই দেশবাসীর কাছেও তাদের আত্মপরিচয় উজ্জ্বলতর করে তোলে। কেউ যদি একটি জাতির অন্তরতম অভীপ্সার বাণী উপলব্ধি ও অনুসরণ করতে পারেন, তাহলে সে জাতির আর সবাই আপন আদর্শের মহত্তম প্রকাশ তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়ে তাঁর অনুগামী হতে বাধ্য।')

সংক্ষেপে এই হল ভগিনী নিবেদিতার জীবনবেদ।

বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা জাতীয় আত্মাভিমান যখন ধর্মপ্রচারের ছদ্মবেশে দেখা দেয় তখন নিবেদিতার ওই আদর্শ অসম্ভব ও অবাস্তব মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ কোনো মতবাদের দ্বারা বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করা নয়, মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করাই যাঁদের সাধনা, তাঁরাই নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা উপলব্ধি করবেন।

জাতীয় সত্তার সঙ্গে এই একাত্মতার সাধনায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্তরসত্য তাঁর কাছে কতখানি ধরা দিয়েছিল তার অসংখ্য উদাহরণের একটি মাত্র প্রথমে পাঠকসমাজের সামনে উপস্থিত করা যেতে পারে। বৌদ্ধযুগের অবসানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ের যুগে ভারতবর্ষে শিব মুখ্য দেবতাদের অন্যতম হয়ে দাঁড়ালেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিবেদিতা তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন—"In

tracing out the evolution of the Shiva-image, we are compelled to assume its origin in the Stupa. And similarly, in the gradual concretising of the Vedic Rudra into the modern Mahadeva, the impress made by Buddha on the national imagination is extraordinarily evident."[১৫] ('আমার ধারণা শিব-প্রতীকের বিবর্তন অনুসরণ করলে [বৌদ্ধ] স্তূপ থেকে এর উৎপত্তির ধারণা অবশ্য স্বীকার্য। ঠিক তেমনি বৈদিক রুদ্রের আধুনিক মহাদেবে ক্রমরূপান্তরে জাতীয় ধ্যানধারণায় বুদ্ধের প্রভাব অবশ্য লক্ষণীয়।')

শিব ও বুদ্ধ— উনিশ শতকের নবজাগরণে ভারতবাসীর এই দুই অন্তরতম দেবতার নবপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা— তিনজনেরই ধ্যান ও কল্পনায় নানাভাবে ঘুরে ফিরে শিব ও বুদ্ধ প্রসঙ্গ এসেছে। ভারতাত্মার অন্তরতম উপলব্ধির সন্ধানী এই ত্রয়ী তীর্থপথিকের রচনাবলীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এঁদের দেশপ্রেম ও ভগবৎপ্রেমের অপূর্ব সম্মেলনে। এঁদের কাছে ভারতবর্ষ শুধু স্বদেশ বা ভৌগোলিক সীমামাত্র নয়, নিখিল বিশ্বের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির তীর্থভূমি।

ভারতীয় চিন্তাধারার বিবর্তনে শ্রীকৃষ্ণের দান সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। ভারত-সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয়লাভে উন্মুখ ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতেও আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের জাতীয় জীবনে মনুষ্যমহিমার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, পুরাণ ও ইতিহাসের সমন্বিত প্রতীক, মহাভারত-নাট্যের সূত্রধার, ভারতীয় প্রজ্ঞার সংহত রূপায়ণ ভগবদ্‌গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের মহিমোজ্জ্বল প্রকাশ— If we dip into its history we shall think it a strange medley. So many parts were never surely thrust upon a single figure! But through it all we note the predominant Indian characteristics— absolute detachment from personal ends, a certain subtle and humorous insight into human nature.[১৬] শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস যদি আমরা গভীরভাবে অনুধাবন করি তাহলে এক বিচিত্রতম মিশ্রণ দেখতে পাব। এত অসংখ্য বৈশিষ্ট্য আর কোনোকালে একটিমাত্র ব্যক্তিত্বে আরোপিত হয় নি। কিন্তু এ-সব বৈচিত্র্যের অন্তরালে ভারতীয় চেতনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য— ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এক অনাসক্তির আদর্শ এবং মানবচরিত্রের মর্মস্থলে প্রবেশের এক সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য লাভ করেছে।

গীতা ও বাইবেল— শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুখৃষ্ট— মানব-অন্তরে পরমের অন্বেষণে তীর্থযাত্রায় এক অনন্তকরুণার সিন্ধুতীরে এসে দাঁড়িয়েছেন— The voice that speaks on the field of Kurukshetra is the same voice that reverberates through an English Childhood from the shores of the Sea of Galilee. We read the gracious words, "Putting aside all doctrines, come there to me alone for shelter— I will liberate thee from all sins, do not then grieve. Fixing thy heart on Me, thou shalt by My grace, cross over all difficulties," and we drop the book, lost in a dream of one who cried to the weary and heavy laden, "Come unto Me."[১৭]

---

১৫ *Footfalls of Indian History*: Buddhism and Hinduism

১৬, ১৭ *The Web of Indian Life*: The Gospel of the Blessed one.

যে শরণাগতি সকল দেশের ভগবৎ-সাধনার গোড়ার কথা, নিবেদিতা-হৃদয়ে তা বৈষ্ণব ও সাধনাদর্শকে পরম ঐক্যে মিলিত করেছে। আসলে যীশুর আদর্শ ভারতীয় ভক্তিযোগের খুব কাছাকাছি বলেই নিবেদিতার পক্ষে ভারতীয় ভক্তিচেতনার উপলব্ধি এত সহজ হয়ে উঠেছে। বিজয়ী জাতির সহজাত অহংকার তাঁর মন থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়ে তাঁর মধ্যে যে চিরন্তন মানুষটি জেগে উঠেছিল, ধর্ম সমাজ সম্প্রদায় ও জাতির বেড়া উত্তীর্ণ হয়ে তা সত্যের অমৃতরূপকে নিমেষে উপলব্ধি করেছে।

বাঙালী ঘরের সরস্বতীপূজা দেখে নিবেদিতার মনে হয়— Man has had many dreams of Divine Wisdom, but surely few so touching as this Saraswati in Bengal.[১৮] ('দিব্যজ্ঞানের কত-না রূপমূর্তি মানুষের কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। তবু বাংলাদেশের সরস্বতীর মতো হৃদয়স্পর্শী কল্পনা একান্ত বিরল।')

দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কথা স্মরণ করে তিনি ভাবেন— There was a wonderful fitness in the fact that in the fulness of time it was on the full moon of Phalgun, the day of the Holi festival, that Chaitanya, apostle of rapture, lover of the poor and lowly, the national saint and the preacher of democracy, was born here in Bengal.[১৯]

('পরমানন্দের মূর্তবিগ্রহ, সাম্যের প্রচারক, পতিত ও দরিদ্রের প্রেমিক, জাতীয় মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য যে দোলযাত্রার ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনটিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন— এ ঘটনার মধ্যে এক অপূর্ব নাটকীয় অনিবার্যতা নিহিত।')

রামায়ণ-মহাভারতে চিরস্পন্দমান ভারতহৃদয় তাঁর অনুভবে— What philosophy by itself could never have done for the humble, what the laws of Manu have done only in some measures for the few, that the epics have done through unnumbered ages and are doing still for all classes alike. They are the perpetual Hinduisers, far they are the ideal embodiments of that form of life, that conception of conduct, of which laws and theories can give but the briefest abstract, yet towards which the hope and effort of every Hindu child must be directed.[২০]

('দর্শন যা কখনো সাধারণ মানুষের জন্য করতে পারত না, মনুর অনুশাসন যা মুষ্টিমেয়ের জন্য সম্ভব করে তুলেছিল, অনন্তকাল ধরে এবং আজ অবধি এই মহাকাব্যটি সর্বশ্রেণীর মানবের জন্য তাই সাধন করে চলেছে। হিন্দুর ধ্যানধারণার তারা চিরন্তন প্রকাশ। ভারতীয় জীবনাদর্শ ও আচার-আচরণের যে

---

১৮ *Studies from an Eastern Home* : The Saraswati Puja.

১৯ তদেব : Dol-Jatra.

২০ *The Web of Indian Life* : The Indian Sagas.

আদর্শ শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে সূত্রাকারে প্রকাশিত, এ দুই মহাকাব্যে তারই পরিপূর্ণ বাণীমূর্তি। প্রতিটি হিন্দু সন্তানের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার এরা নিয়ামক।')

ছাত্রদের কাছে ভারতীয়তাবোধের প্রথম পাঠরূপে রামায়ণ-মহাভারতের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি তিনি একান্ত আবশ্যক মনে করতেন। শুধুমাত্র অতীত গৌরবের জন্যই নয়, সেবা ও সাধনার দ্বারা নবযুগের মহত্তর কীর্তিসৌধস্থাপনের স্বপ্নও তিনি তরুণপ্রাণে সঞ্চার করতেন। *Studies from An Eastern Home* গ্রন্থের ভূমিকায় স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ও তাঁর গুণগ্রাহীবন্ধু শ্রীর‍্যাটক্লিফ এক তরুণসভায় রামায়ণ সম্বন্ধে নিবেদিতার বক্তৃতাংশ উল্লেখ করেছেন—'The Ramayana is not something that come once for all from a society that is dead and gone ; it is something springing ever from the living heart of a people. Our word to the young Indian today is : Make your own Ramayana, not in written stories, but in service and achievement for the motherland.'

('রামায়ণ শুধুমাত্র এক বিগত মৃত সভ্যতার অতীত কাহিনী মাত্র নয়। এক জীবন্ত জাতির প্রতিদিনের জীবন থেকে এই রামায়ণ উৎসারিত হয়ে চলেছে। আজকের তরুণ ভারতের কাছে আমাদের বক্তব্য, শুধুমাত্র লিখিত কাহিনীতে নয়, সেবা ও সাধনায় নিজেদের রামায়ণ তোমরা নিজেরা সৃষ্টি করে তোলো।')

কিন্তু শুধুমাত্র শাস্ত্র শিল্প বা সাহিত্য নয়, নিবেদিতার কাছে ভারতের মহিমার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল এ দেশের দরিদ্র নিরক্ষর সরল অথচ গভীরতম জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত নরনারী। সন্দেহ নেই, সাধারণের মধ্যে এই অসাধারণকে প্রত্যক্ষ করার প্রেরণামন্ত্রও বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী থেকেই সঞ্চারিত। তবু, মানুষকে গড়ে তোলা ও মানবমনের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করার সাধনায় তিনি যে তাঁর কর্মজীবনের প্রথম থেকেই শিক্ষয়িত্রীব্রত উদ্‌যাপন করেছেন, সে কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মানুষকে তিনি জীবনের সর্বস্তর থেকে আবিষ্কার ও প্রকাশ করতে পারতেন—এ তাঁর সহজাত প্রতিভা। উপযুক্ত গুরুর সান্নিধ্যে এসে সে প্রতিভা উজ্জ্বলতর হয়েছে।

জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী অবলা বসুর স্মৃতিচারণে লক্ষণীয়, নিবেদিতা তাঁর আলাপ-আলোচনায় কখনো 'Indian Women' বা 'Indian need' বলতেন না, বলতেন, 'Our Women' বা 'Our need'[২১] জগদীশচন্দ্রের আগ্রহে লিখিত[২২] রবীন্দ্রনাথের 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধটিতেও কবি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন, "তিনি যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না।"

শ্রদ্ধার দূরত্বে নয়, আত্মার আত্মীয়তায় নিবেদিতার মহত্ত্বের পরিমাপ। বৈষ্ণব কবিরা হয়তো একেই বলবেন 'রাগাত্মিকা ভক্তি'— জন্মজন্মান্তরের আত্মীয়তা।

শিক্ষা— বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন নিবেদিতার এ দেশে আসার প্রধান উপলক্ষ্য। কিন্তু এ দেশের যুগযুগান্তরের ভাবধারায় গঠিত নিরক্ষর অথচ গভীরতর অর্থে মহত্তম চিন্তার অধিকারিণী এমন এক

---

২১ *Studies from An Eastern Home*: শ্রীর‍্যাটক্লিফের ভূমিকা 'In memoriam' থেকে।

২২ 'নিবেদিতা সম্বন্ধে প্রবাসীতে কিছু লেখবার জন্যে জগদীশ আমাকে অনুরোধ করেছিলেন— আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম' [পত্রাবলী : রবীন্দ্রনাথ। শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত · শারদীয় দেশ পত্রিকা ১৩৭৩]

নারীসমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে, যাঁদের কাছে তিনিই শিক্ষার্থিনী হয়ে দাঁড়ালেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদাদেবী, শ্রীরামকৃষ্ণ-মাতৃরূপা গোপালের মা, সাধিকা যোগীন মা (প্রধানতঃ এঁরই মুখে পুরাণ-কাহিনী শুনে নিবেদিতার *Cradle Tales of Hinduism*-এর অমর কাহিনীগুচ্ছের সৃষ্টি) প্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণীদের জীবনে, আচরণে, কথোপকথনে তিনি ভারতীয় নারীসমাজের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেন, তার দ্বারা ভারতীয় আদর্শে শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে তোলার মূলভিত্তিটি সুদৃঢ় হয়েছিল।[২৩] প্রাচ্যের আত্মবিলোপ ও পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য— জননী ও সহধর্মিণী— এ দুটিভাবেরই উপযোগিতা উপলব্ধির পটভূমিতে তিনি আধুনিক ভারতীয় নারীর জাগরণ কল্পনা করেছেন— When the women see themselves in their true place, as related to the soil on which they live, as related to the past out of which they have sprung; when they become aware of the needs of their own people, on the actual colossal scale of those needs; when the mother-heart has once awakened in them to beat for land and people, instead of family, village and homestead alone, and when the mind is set to explore facts in the service of that heart— then and then alone shall the future of Indian womanhood dawn upon the race in its actual greatness; then shall a worthy education be realised; and then shall the true national ideal stand revealed[২৪]

('ভারতীয় নারী যখন তাদের নিজস্ব স্থানটি অধিকার করবে— যে দেশে তাদের জন্ম, যে অতীত থেকে তাদের আবির্ভাব, যে বিপুল জাতীয় জীবনের কর্তব্য তাদের সম্মুখীন— সে-সব কিছু সম্বন্ধে যখন তারা সচেতন হয়ে উঠবে, শুধুমাত্র আপন আপন বাড়িঘর, গ্রাম ও পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে যখন সমস্ত দেশ ও জনসাধারণের জন্য তাদের মাতৃহৃদয় স্পন্দিত হবে, আর সে হৃদয়ের অনুভব কর্মে পরিণত করার মানসিকতা তাদের মধ্যে দেখা দেবে— একমাত্র তখনই ভারতীয় নারীর মহিমময় ভবিষ্যৎ এ জাতির জীবনে প্রতিভাত হবে, এক মহান শিক্ষাদর্শের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ ঘটবে, যথার্থ জাতীয় জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ প্রকাশ তখনই প্রত্যক্ষগোচর হবে।')

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, নিবেদিতাপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন সারদাদেবী। নিবেদিতার ভারতীয় ধ্যান-ধারণায় সারদাদেবীর স্থান শ্রীরামকৃষ্ণের সমতুল্য। পবিত্রতা ও প্রশান্তির মূর্তবিগ্রহ সারদাদেবী তাঁর কাছে—'To me it has always appeared that she is Sri Ramkrishna's final word as to the ideal of Indian womanhood.'[২৫] বাস্তবিক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের স্বাভাবিক সংস্কারে বিকশিতা সারদাদেবী যে উদার অসাম্প্রদায়িকতায় তাঁর এই বিদেশিনী কন্যাকে সব ছুঁৎমার্গের ঊর্ধ্বে আপনবক্ষে টেনে নিয়েছিলেন, নিবেদিতার ভারতবর্ষ-উপলব্ধিতে তা সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছিল। গুরুর কাছে তিনি ভারতের সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর যেসব কাহিনী

২৩, ২৫ *The Master As I Saw Him* : The Holy Women পরিচ্ছেদ।

২৪ *The Web of Indian Life* : The Oriental Woman প্রবন্ধ।

শুনেছিলেন, সারদাদেবীর মধ্যে ভারতীয় নারীর সেই মাধুর্য নম্রতা ও মহত্তম আদর্শে জীবনযাপনের প্রত্যক্ষ রূপমূর্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। শুধু অতীত ভারতবর্ষ নয়, ভবিষ্যৎ ভারতের নারী-জীবনের প্রেরণারূপেও এই মহীয়সী নারীর জীবন ও সাধনা তাঁর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের এই অন্তঃপুরবাসিনীদের সান্নিধ্যে এসেই নিবেদিতা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছেন— The Indian home thinks of itself as perpetually chanting the beautiful psalm of custom. To it, every little act and detail of household method and personal habit is something inexpressibly precious and sacred, an eternal treasure of the nation, handed down from the past, to be kept unflawed, and passed on to the future.[২৬]

ভারতীয় জীবনধারার এই সামগ্রিক ছন্দটি অনুধাবন করাই নিবেদিতার ভারত-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। বিদেশী ও স্বদেশী এমন অনেক সমালোচককে আমরা জানি যাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করতে যান বলেই অসহিষ্ণু ব্যস্ততায় নেতিবাদী সিদ্ধান্তে এসে পৌছান। *The Web of Indian Life* গ্রন্থের ভূমিকায় সে কথা মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'Those who have no ear for music, hear sounds but not the song'.[২৭] অনেক কাল কোনো দেশবিশেষে বাস করলেই সে দেশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের অধিকার জন্মায় না। সে দেশের প্রাণছন্দটি অনুভব করার ক্ষমতা যাঁর আছে, তিনিই সংগৃহীত তথ্যস্তূপের অন্তরালে নিহিতার্থের সন্ধান দিতে পারেন। 'গানের কান যাদের তৈরি হয় নি, তারা আওয়াজ শোনে, গানটি শুনতে পায় না।'

ভারততীর্থের সন্ধানী মধুকরদের সঙ্গে সহজেই নিবেদিতার প্রাণের ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, জগদীশচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকার, ওকাকুরা, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, আনন্দকুমার স্বামী, হ্যাভেল, র‍্যাটক্লিফ, দীনেশচন্দ্র, নন্দলাল, অসিত হালদার— চিরন্তন ভারতের অন্বেষণে দেশ ও দেশান্তরের আরো অসংখ্য যাত্রীদল নিবেদিতার চিত্তপ্রাঙ্গণে মিলিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এই মনীষীসমাবেশের দিক থেকে দেখলেও নিবেদিতার প্রেরণাশক্তি অপরিমেয় বিস্ময় ও গৌরবের বস্তু।

উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ধর্ম জাতীয়তা সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক থেকে বাঙালী ও ভারতবাসীর চিত্তলোকে অক্ষয় প্রভাব বিস্তার করেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শুধু উনিশ শতকের মহান পুরুষদেরই অন্যতম নন, তিনি স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের শাখাপ্রশাখায় হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যবধানের রেখাটি স্পষ্টতর হয়ে উঠলেও মহর্ষির নিজস্ব ধ্যানের জগৎটিতে প্রাচীন ঐতিহ্যের মূল্য বিশেষভাবে স্বীকৃত। তা ছাড়া স্বদেশী-সংস্কৃতির

২৬ *The Master As I Saw Him* : The Holy Women অধ্যায়।

২৭ *The Web of Indian Life* : The Sister Nivedita : Introduction : Rabindranath Tagore. বইটির প্রথম প্রকাশ মে ১৯০৪। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার তারিখ ২১শে অক্টোবর ১৯১৭। বইটির চতুর্থ মুদ্রণ হয় অক্টোবর ১৯১৪ এবং পুনরায় মুদ্রণ জুলাই ১৯১৮। সুতরাং এই পঞ্চম মুদ্রণের আগে ভূমিকাটি লিখিত।

যে সাধনা ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডলে যাত্রা শুরু করেছিল, নিবেদিতার সঙ্গে তার প্রাণের মিল সহজেই ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সরলাদেবী— ঠাকুর-পরিবারের এই তিনজনের সঙ্গে নিবেদিতার বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। 'ভারতী'-সম্পাদিকা সরলাদেবী বিবেকানন্দের কাছে প্রতীচ্য জগতে ভারতের বাণী প্রচারের জন্য বিশেষভাবে যোগ্যরূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের জন্য পাশ্চাত্যের নিবেদিতা ও পাশ্চাত্যের জন্য ভারতের সরলাদেবীকে উপস্থাপিত করার পরিকল্পনাও তাঁর মনে এসেছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের সে-আহ্বানে নানা কারণে সরলাদেবী সাড়া দিতে পারেন নি। অবশ্য বিবেকানন্দের চিন্তাধারা তাঁর জীবনে যে কী গভীর পরিবর্তন এনেছিল সে কথা 'জীবনের ঝরাপাতা'[২৮] গ্রন্থে পরম আন্তরিকতায় বিধৃত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পর একদিন মহর্ষির আহ্বানে নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের অপরূপ আতিথ্যের স্মৃতি নিবেদিতার মনে জাগরূক ছিল। মহর্ষির সঙ্গে সেদিন তাঁর নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।[২৯]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় (১৮৯৮) থেকেই এ দুই মনীষী পরস্পরের মহত্ত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের দিনটিতে রবীন্দ্রনাথের আকৃতি কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।[৩০] অন্যান্য মিশনারি সম্প্রদায়ের মতো তাঁকেও প্রথমে সাধারণ প্রচারকারিণী মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবু, প্রথম দর্শনেই এমন কোনো বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা দিয়ে থাকবে যে জন্য নিজের মেয়ের শিক্ষার ভার তিনি নিবেদিতার হাতে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা বাইরে থেকে কোনো শিক্ষা চাপিয়ে দিতে রাজী হন নি। জাতিগত ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।[৩১] কন্যার ক্ষেত্রে এ অনুরোধ পালিত না হলেও নিবেদিতার শিক্ষাদর্শের কিছু প্রভাব তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্রের ক্ষেত্রে হয়তো কার্যকরী হয়েছিল। ১৯০৪ সালে কলকাতা থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা তাঁর চিঠিতে লক্ষণীয়— 'বুধগয়ায় আমার যাওয়া ঘটে কিনা সন্দেহস্থল। পিতার শরীর অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। যাই হোক ছেলেদের নিয়ে তোমরা যেয়ো। সিস্টার নিবেদিতার ও জগদীশের সংসর্গে ও আলাপ আলোচনায় তাদের বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করচি। নিবেদিতা ওদের জন্য উৎসুক হয়ে আছেন। তিনি ওদের ইতিহাসশিক্ষার ভার নিয়েছেন— সেইজন্যে এই উপলক্ষ্যে তিনি ওদের সঙ্গে আলাপ করে নিতে চান। বুধগয়ায় বসে তিনি ওদের ইতিহাসচর্চার ভূমিকা স্থাপন করে দিতে পারেন।'[৩২]

নিবেদিতার নানা পরিকল্পনার মধ্যে Boys' Home একটি— এই ছাত্রাবাসের ছাত্রেরা ছ মাস আবাসিক শিক্ষালাভ করবে, আর ছ মাস দেশভ্রমণের দ্বারা শিক্ষালাভ করবে। প্রথম ছ মাসের পরিকল্পনা তখনি কাজে পরিণত হয় নি, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুসারে ১৯০৩এর এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে 'বিবেকানন্দ হোমে'র যে ছাত্রদল কেদারনাথের

২৮ একুশ অধ্যায় : 'সম্পাদকীয় জীবন— স্বামী বিবেকানন্দ' : পৃ ১৬০-১৬২ : জীবনের ঝরাপাতা।

২৯ নিবেদিতার পত্র— ১৫।২।৯৯ : ভগিনী নিবেদিতা : প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।

৩০ *Sister Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda:* Pravrajika Atmaprana পৃ ২৩৮।

৩১ পরিচয় : রবীন্দ্রনাথ : 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধ।

৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩।

উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করে রথীন্দ্রনাথ সেই ছাত্রদলে ছিলেন।[৩৩] "When father heard from Sister Nivedita that one of the monks from Belur Math— Sadananda Swami was going to lead one such group to the shrine of Kedarnath in the Western Himalayas, he made up his mind to send me along with them. Father thought that this sort of a hiking trip would be a good priliminary training for the life of hardship he intended me to take up, as a pupil of Brahmacharya Asrama at Santiniketan"[৩৪]

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে একটি বিদ্যালয় গড়ে তুলতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।[৩৫] কিন্তু বাগবাজারে তাঁর নিজস্ব কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অন্যত্র কিছু করা নিবেদিতার পক্ষে সম্ভব হয় নি। 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার যে প্রবল ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, সেদিক থেকে হয়তো তাঁর স্বাধীন কর্মক্ষেত্র নির্বাচনই শ্রেয়তর হয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে ও বিশ শতকের গোড়ায় ধীরে ধীরে যে স্বদেশী মনোভাবের সূচনা দেখা দিয়েছিল, রথীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সে ভাবধারার আন্দোলনে পরিণতির কারণ হিসাবে প্রধানতম দুটি ব্যক্তিত্ব— ভগিনী নিবেদিতা ও কাউণ্ট ওকাকুরা। ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনে নিবেদিতার দান সম্বন্ধে রথীন্দ্রনাথের মন্তব্য এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— "She had the zeal of a convert and was more of an Indian than any native-born. Inspired by the patriotic feelings of her guru the Irish blood in her did not let her remain passive. Her dynamic personality drove her to become a torchbearer of the cause of India's freedom and her rehabilitation in spiritual and cultural status."[৩৬]

সমসাময়িক যুগের শিক্ষা, জাতীয়তা, বিজ্ঞানসাধনা, স্বদেশী শিল্প, স্বাধীনতা-আন্দোলন— এমনি নানা বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথের সমপ্রাণতা ছিল। বিভিন্ন সময়ে নানা উপলক্ষ্যে দুজনের দেখাসাক্ষাৎ ঘটলেও পরস্পরের সান্নিধ্যে তাঁরা সবচেয়ে বেশি দিন ছিলেন শিলাইদহে ও বুদ্ধগয়ায়। ১৮৯৯এর ১৬ই জুন রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিবেদিতার শ্রদ্ধাবিজড়িত প্রীতির যে নিদর্শন মেলে, তখন অবধি তাঁদের স্বল্পকালীন পরিচয়ের কথা মনে থাকলে তা নিবেদিতার অশেষ গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক।[৩৭] জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব নিবেদিতার কাছে রবীন্দ্রসান্নিধ্য আরো আগ্রহের বিষয় করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এই ত্রয়ীব্যক্তিত্বের সমাহার চিরস্মরণীয়। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনায় নিবেদিতার অমিত উৎসাহের কারণও বর্তমান পৃথিবীতে ভারতবর্ষের নিজস্ব মহিমার আত্মপ্রকাশ।[৩৮] বসুবিজ্ঞানমন্দিরের সম্মুখভাগে কল্যাণদীপ হস্তে যে নারীমূর্তি প্রজ্ঞালোক বিকীর্ণ করছেন, তিনি নিবেদিতারই কল্পরূপ।

৩৩, ৩৪ প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার পূর্বোল্লেখিত নিবেদিতাজীবনী পৃ ১৬০ এবং শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *On the Edges of Time* পৃ ৪৪ এবং 'হিমালয়ভ্রমণ' পরিচ্ছেদ— পিতৃস্মৃতি দ্রষ্টব্য। ৩৬ *On the Edges of Time* পৃ ৬৮-৬৯।

৩৫ ভগিনী নিবেদিতা : প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা পৃ ২৭৪।

৩৭, ৩৮ চিঠিপত্র : রবীন্দ্রনাথ ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ ১৪৫-১৫৩ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত নিবেদিতার পত্র।

কবির চেতনায় নিবেদিতার পুণ্যপ্রভাব দেখা দিয়েছে আর-এক ভাবে। 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি। নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই।" স্বদেশীযুগের কবিতা ও সংগীতে রবীন্দ্রনাথের ভারত-তন্ময়তা ও বিশেষভাবে বাংলাদেশের জননীমূর্তির উদ্দেশে অন্তরের আকুলতানিবেদনের অন্যতম প্রেরণা ভগিনী নিবেদিতা।

সাধারণতঃ 'কালী-প্রতীকে'র প্রতি রবীন্দ্রমানসে বিশেষ কোনো আকর্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু স্বদেশীযুগের পরিমণ্ডলে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' গানটির চিত্রকল্পে যখন দেখি—

> ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
> দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।· ·
> তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি,
> তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী !

তখন নিবেদিতার কালী-অনুধ্যানের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে। ভারতবাসীর চিত্তলোকে দেশজননীর কালিকামূর্তিতে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁরই নিজস্ব।

অবশ্য রবীন্দ্রসাহিত্যে নিবেদিতার প্রেরণা সবচেয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে। সমগ্র যুগচেতনার প্রকাশরূপে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসটি মহাকাব্যোপম। আর সে উপন্যাসের নায়ক সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে জাত আইরিশ রক্তের সন্তান 'গোরা'। সমগ্র জীবন ও চেতনা দিয়ে 'হিন্দু' হতে চেয়েও শেষ অবধি তার জন্মসূত্রে সে হিন্দুসমাজের বহিভূত হল। কিন্তু আনন্দময়ীরূপে ভারতবর্ষ তাকে আপন বুকে টেনে নিলেন।

বিবেকানন্দ-শিষ্য নিবেদিতা যে ভারতবর্ষের অনেক মন্দিরে—এমনকি তাঁর গুরুর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের উপাসিতা দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করতে পারতেন না— সে বেদনাদায়ক সত্য আমাদের চরম লজ্জার কথা। তবু, কোনো ক্ষোভ, কোনো অভিমান এই ভারতপ্রাণার হৃদয়কে মুহূর্তের জন্য বিমুখ করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ হয়তো হিন্দু-সমাজের তদানীন্তন এই সংকীর্ণতা স্মরণ করেই নিবেদিতাকে গল্পটি বীজাকারে শোনাবার সময় গোরার সঙ্গে সুচরিতার মিলন ঘটতে দেন নি। প্রসঙ্গতঃ পিয়ার্সনকে লেখা গোরা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণীয়— 'You ask me what connection had the writing of *Gora* with Sister Nivedita. She was our guest in Shilida and in trying to improvise a story according to her request I gave her something which came very near to the plot of *Gora*. She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. You won't find it in *Gora* as it stands now—but I introduced

it in my story which I told her in order to drive the point deep into her mind'.[৩৯]

সংরক্ষণশীলতা যেমন নিবেদিতাকে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে দেয় নি, তেমনি আর-এক দিক থেকে সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে চিরন্তন ভারতবর্ষ নিবেদিতাকে আপন কন্যারূপে গ্রহণ করেছে।

নিবেদিতাচরিত্রে যে যোদ্ধভাব— 'বলবান আক্রমণের বাধা' এবং অপরের মনকে পরাভূত করার উৎসাহ রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, তা গোরা-চরিত্রের অন্যতম মূল উপাদানে পরিণত। হিন্দুঐতিহ্যের প্রতিটি অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্তের সমর্থনে গোরার অনন্যসাধারণ যুক্তিশাণিত সংলাপও নিবেদিতার আলাপচারির ভঙ্গিমায় প্রভাবিত। ব্রাহ্মসমাজ যে ভারতীয় ঐতিহ্যেরই আধুনিক রূপ— তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সমগ্র হিন্দুসমাজ ও চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়— আদি ব্রাহ্মসমাজের এই দূরদৃষ্টি নিবেদিতার গোরা-চরিত্রে রূপান্তরের মাধ্যমে আমাদের অখণ্ড জাতীয়তাবোধকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

প্রসঙ্গতঃ গোরার অজস্র উক্তির মধ্য থেকে একটিমাত্র উপস্থাপিত করি— "আমাকে আপনি একটা গোঁড়া ব্যক্তি বলে মনে করবেন না। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়া লোকেরা, বিশেষত যারা হঠাৎ নতুন গোঁড়া হয়ে উঠেছে, তারা যে ভাবে কথা কয় আমার কথা সে ভাবে গ্রহণ করবেন না। ভারতবর্ষের নানাপ্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল। সেই ঐক্যের আনন্দেই, ভারতবর্ষের মধ্যে যারা মূঢ়তম তাদের সঙ্গে এক দলে মিশে ধুলোয় গিয়ে বসতে আমার মনে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ হয় না। ভারতবর্ষের এই বাণী কেউ-বা বোঝে কেউ-বা বোঝে না— তা নাই হল— আমি আমার ভারতবর্ষের সকলের সঙ্গে এক; তারা আমার সকলেই আপন; তাদের সকলের মধ্যেই চিরন্তন ভারতবর্ষের নিগূঢ় আবির্ভাব নিয়ত কাজ করছে সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহমাত্র নেই।"

গোরার প্রবল কণ্ঠের এই কথাগুলি ঘরের দেয়ালে, টেবিলে, সমস্ত আসবাবপত্রেও যেন কাঁপিতে লাগিল। (২০শ অধ্যায়, গোরা)

এই বক্তব্য ও বক্তার প্রবল ব্যক্তিত্ব— দুইই নিবেদিতা-চরিত্র-সম্ভব। ভারতবর্ষের অন্তরতম পরিচয়-লাভে পরমাসিদ্ধির কথা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ এর কারণ বিশ্লেষণ করেছেন *The Web of Indian Life*-এর ভূমিকায়— "She had won her access to the inmost heart of our society by her supreme gift of sympathy. She did not come to us with the impertinent curiosity of a visitor, nor did she elevate herself on a special high perch with the idea that a bird's eye view is truer than the human view because of

৩৯ Visva-Bharati Quarterly, August-October 1943 পিয়ার্সনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র (১৯২২)। চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ খণ্ডে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের এক বা একাধিক গল্প নিবেদিতা অনুবাদ করেছিলেন। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের অনুবাদটি প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া আরো গল্পের অনুবাদ তিনি করেছিলেন মনে করার কারণ আছে।

its superior aloofness. She lived our life and came to know us by becoming one of ourselves." ।

জাতিহিসাবে আমাদের দোষ-ত্রুটি কোথায়, তা নিবেদিতার অজানা ছিল না। কিন্তু সে দোষ-ত্রুটির বিবরণ জাতির সামগ্রিক পরিচয়কে ছাপিয়ে উঠত না। "And because she had a comprehensive mind and extraordinary insight of love she could see the creative ideals at work behind our social forms and discover our soul that has living connexion with its past and is marching towards its fulfilment." ।

প্রেমের এই অন্তর্দৃষ্টিবলেই ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় জীবনধারা সম্বন্ধে মৌলসত্যের (vital truths) বাণী উচ্চারণ করতে পেরেছেন। এ অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ধীরে ধীরে খুলে গেছে। ভারতবর্ষে আসার প্রথম দিকে তিনি প্রধানতঃ সেবিকা। পাশ্চাত্যের সংস্কার, এমনকি ব্রিটিশ পতাকার প্রতি অন্ধ আনুগত্য পর্যন্ত তাঁর মনে বহুদিন সক্রিয় ছিল। তার পর বিবেকানন্দের প্রেরণায় সেই জাতীয়তাবাদের অবলম্বন হয়ে উঠল ভারতবর্ষ। আসলে, ভারতবর্ষকে মাতৃভূমিরূপে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেই তিনি স্বাদেশিকতার সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে এলেন।

গোরা-চরিত্রের একটি মূলসূত্র তার জন্মরহস্য। কেউ কেউ এ রহস্যকে উপন্যাসটির প্রধান দুর্বলতা মনে করেছেন। কিন্তু এ রহস্য জীবনসত্যেরই রূপকমাত্র। সত্য যে বিশেষ দেশ কাল ও সমাজের দ্বারা বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত হতে পারে না, তারই নিশ্চিত প্রমাণ নিবেদিতা এবং নিবেদিতাপ্রণোদিত গোরা-চরিত্র।

গোরার ভারত-অনুসন্ধান আমাদের জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমানবিকতার স্তর-পরম্পরা। জাতি ও বিশ্বের এই সংযোগসূত্রটি আমরা ভগিনী নিবেদিতার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ইতিহাসের দরবারে জাতির যে নিজস্বের পরিচয়পত্রটি সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, সেই জাতীয়তাবোধের প্রেরণাই ভারতীয় শিক্ষাধারায় নিবেদিতা সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন।

Hints on National Education in India গ্রন্থের Paper on Education IV অধ্যায়ে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য— "Education in India to-day has to be not only national but Nation-making···The centre of gravity must lie for them outside the family, we must demand from them sacrifices for India, bhakti for India, learning for India. The ideal for its own sake. India for India. This must be as the breath of life to them." ।

এই একান্ত জাতীয়তাবাদী আদর্শের যুগপ্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তিনি জানতেন, "In the last and final court, it may be said, humanity is one and the distinction between native and foreign purely artificial."[৪০] চূড়ান্ত বিচারে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে মানবতা এক ; আর দেশী ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্যবোধ একান্ত কৃত্রিম।

নিবেদিতার মতো আর ক'টি জীবনে এ মহান সত্য প্রমাণিত হয়েছে !

---

৪০ 'The Place of Foreign Culture in a true Education' : *Hints on National Education in India.*

৫

নিবেদিতা চরিত্রের দুটি দিগন্ত— এক দিকে তাঁর নিরন্তর সংগ্রাম, আর-এক দিকে তাঁর পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। সে আত্মনিবেদনের একটি প্রকাশে তিনি 'লোকমাতা'— ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর অসাধারণ মমতা। তাঁর জাতীয়তাবোধ হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ— সর্বধর্মসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করেই এক অসাম্প্রদায়িক ভারতচেতনায় সার্থক। আর-এক দিকে গুরুর প্রতি নিষ্ঠায়, সত্যের জন্য সর্বস্বত্যাগে, অধ্যাত্ম উপলব্ধির অতল গভীরতায় তিনি ধ্যানমগ্না তপস্বিনী। বুদ্ধ ও যীশু, মেরী ও কালী, শিব শক্তি, ব্রহ্ম ঈশ্বর— দেশে দেশে কালে কালে মানবপ্রাণে পরমপ্রকাশের সব প্রতীকগুলি তাঁর অন্তরে এসে মিলিত হয়েছে।

বুদ্ধগয়ায় নিবেদিতার সহযাত্রী রবীন্দ্রনাথ 'ফুজি' নামে গরিব জাপানী জেলেটির মুখে প্রতি সন্ধ্যায় বোধিদ্রুমতলে যে আবৃত্তি শুনতেন—

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়, নমো নমো গোতমচন্দিমায়।
নমো নমো নন্তগুণণ্ণবায়, নমো নমো সাকিয়নন্দনায়॥

পরবর্তীকালে 'নটীর পূজা'য় সে শ্লোকটি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু শুধু কি ফুজির ওই আবৃত্তি? তারই পাশাপাশি নিবেদিতার বুদ্ধ ও ভারতের প্রতি আত্মনিবেদনও কি তাঁর অন্তরের রসলোকে শ্রীমতীর আত্মনিবেদনের গানে পরিণত হয় নি!— 'বন্দনা মোর ভংগীতে আজ সংগীতে বিরাজে'। শ্রীমতীর ওই অনন্যশরণ সাধনার বাস্তব প্রতিরূপ তিনি তো নিবেদিতার জীবনেই দেখেছিলেন।

নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের মানসঐক্যের আর-একটি সূত্র তাঁদের কবিচেতনায়। দূরতম অতীত ও ভবিষ্যতে প্রসারিত রোমান্টিক কবিচৈতন্য দুজনেরই মনোধর্ম। নিবেদিতার গদ্যরচনায় কাব্যস্পন্দন তো ক্ষণে ক্ষণেই চোখে পড়ে, অভিধা ও ব্যঞ্জনায় সম্পূর্ণ কবিতাও তিনি বেশ কিছু লিখে গেছেন। ভারতবর্ষ ও বিবেকানন্দ—তাঁর কবিতার প্রধানতম বিষয়। *Footfalls of Indian History*-গ্রন্থের সূচনায় তাঁর ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে কবিতাটির অংশবিশেষ প্রথমে উদ্ধৃত করি—

We hear them, O Mother!
Thy footfalls,
Soft, soft, through the ages
Touching earth here and there,
And the lotuses left on Thy footprints
Are cities historic,
Ancient scriptures and poems and temples,
Noble strivings, stern struggles for Right.

৪ঠা জুলাই, ১৯০২— তারিখটি নিবেদিতা কোনো দিন ভোলেন নি— তাঁর গুরু ও ইষ্ট বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের তারিখ।[৪১] বিবেকানন্দ-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি লিখেছিলেন ৪ঠা জুলাই

৪১ একটু আকস্মিক যোগাযোগ মনে হলেও এ কথা স্মরণীয় যে, ৪ঠা জুলাই তারিখেই (১৮৯৮) হিমালয়-পরিভ্রমণের সময় বিবেকানন্দ আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসটির উদ্দেশে তাঁর বিখ্যাত To the fourth of July কবিতাটি লেখেন।

তারিখে পাঁচ বৎসর পরে। বান্ধবী ম্যাকলাউডের কাছে তাঁর প্রাণের অভিব্যক্তি 'To me he was all love.'। মৃত্যু সেই প্রেমেরই আর-এক মূর্তি।

"Then can I not watch and pray beside him while he sleeps, or wait to join him in that self-same silence ?"[৪২]

"And of that Knowledge, the Knowledge of the Beloved,
presence and absence are but two diffrnt modes."[৪৩]

কম্পমান হোমশিখার মতো তাঁর প্রেমস্তোত্র—

"Love all transcendent,
Tenderness unspeakable,
Purity most awful,
Freedom absolute,
Light that lightest everyman,
Sweetest of the sweet, and
Most Terrible of the terrible,
To thee our salutation,
Thee we salute. Thee we salute,
Thee we salute."[৪৪]

যে অন্তরতম আকুলতা ওই মৃত্যুমুহূর্তটিকে ঘিরে অনুক্ষণ গুঞ্জরিত হত, তারই কিছু অনুরণন তিনি রেখে গেছেন *An Indian Study of Love and Death*-এর কবিতাগুচ্ছে। উৎসর্গপত্রে তাঁর না-বলা বাণীর বেদনা স্বল্পতম ভাষায় সংহত— Because of Sorrow— আর নীচে লেখা নামের আদ্যাক্ষর N.

কবি ও শিল্পীর দৃষ্টিতে নিবেদিতা সতী ও উমায় রূপান্তরিত। তাঁর সাধনা প্রেম আত্মত্যাগ— ভারতীয় মানসের মহত্তম কবিকল্পনার কথাই বারংবার মনে করিয়ে দিয়েছে।

"শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে, তিনি কি বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন ? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্যদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল।"— বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

"সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রুপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল।·· সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর।"— 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের এই বর্ণনারই ভাষান্তর তাঁর অনন্য ছবি 'উমা'।

৪২, ৪৩, ৪৪ *An Indian Study of Love and Death* (১৯০৫)

নিবেদিতার প্রয়াণ-উপলক্ষ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর শ্রদ্ধানিবেদনের অর্ঘ্য সাজিয়েছেন—

তপস্যার পুণ্যতেজে করেছিলে অসাধ্য সাধন,
জ্বেলেছিলে স্বর্ণদীপ অন্ধকারে ; নব উদ্বোধন
করেছিলে জীর্ণ বিল্বমূলে মাতৃরূপা শকতির ;
স্মরিয়া সে সব কথা আজ শুধু চক্ষে বহে নীর।
এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়,
চলে গেলে অল্প আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়,—
দেহ রাখি' শৈলমূলে ;— শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী ;
ওগো দেবতার দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী। —নিবেদিতা : কুহু ও কেকা

সতী ও উমার মতো নিবেদিতার মানসপটভূমিতেও হিমালয় সমাহিত ধ্যানের প্রতীক। ভারতের সেই যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত সাধনারই আর-এক রূপায়ণ ভারতীয় শিল্পকলায়। হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথ-আনন্দ-কুমারস্বামী-নন্দলালের সমবেত প্রতিভায় পুনরুজ্জীবিত ভারতশিল্পের পীঠভূমি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। আর এ শিল্পের প্রাণময়ী প্রেরণাশক্তি ভগিনী নিবেদিতা। সমসাময়িক যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়েও এক অর্থে এই ভারতশিল্প-আন্দোলন আমাদের জাতীয় সত্তার জাগরণে অনেক বেশি সহায়ক হয়েছিল। তার কারণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবলোকে নিবেদিতা ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি মূলসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতশিল্পের নিজস্ব ভঙ্গিমায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তো নিজেই অপূর্ব মূর্তি গড়তে পারতেন, ছবি আঁকতে পারতেন। তাঁর অধ্যাত্মসাধনায় ভারতীয় চিত্তে পৌরাণিক রূপকল্পের নবপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে বিভিন্ন ধর্মমন্দিরের স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব সমন্বয়ে ফুটে উঠেছে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের মানসচিত্র। রামকৃষ্ণ মিশনের সর্পবেষ্টিত প্রতীকচিহ্নটি বিবেকানন্দের শিল্পসৃষ্টির অভ্রান্ত সাক্ষ্য— "চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি— কর্মের, কমলগুলি— ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি— যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়— চিত্রের ইহাই অর্থ।" —স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

ভারতশিল্পের অধ্যাত্মবাণীর প্রেরণা ভগিনী নিবেদিতায় হৃদয়ে আর-একটি প্রতীকের সৃষ্টি করেছিল— বিশ্বকল্যাণে উৎসর্গিতপ্রাণ দধীচিমুনির অস্থিনির্মিত বজ্র। এ বজ্রপ্রতীক তাঁর গ্রন্থাবলীতে প্রতীকচিহ্নরূপে ব্যবহৃত, তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় পতাকার কেন্দ্রস্বরূপ।

গ্রীক ও পাশ্চাত্যশিল্পকলার অনুকরণচিন্তা থেকে ভারতীয় শিল্পী-মানসকে মুক্ত করে তিনি যে ভারতীয়তার আদর্শ শিল্পীদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের পরে সে আদর্শের মহত্তম প্রকাশ নন্দলালের শিল্পসৃষ্টিতে। শুধুমাত্র ইতিহাস পুরাণে নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত সংগ্রামে সর্বস্তরের প্রকাশে ভারতশিল্পের নিজস্ব সিদ্ধির পরিচায়ক নন্দলালের বিচিত্র শিল্পসাধনা।

ভারতশিল্পের যাত্রারম্ভ থেকে এই শিল্পাদর্শে এদেশের ও বিদেশের শিল্পজিজ্ঞাসুদের শিক্ষিত করে তোলার ব্রত নিবেদিতা গ্রহণ করেছিলেন। মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশিত তাঁর এই জাতীয় শিল্পব্যাখ্যার আংশিক উদাহরণ নন্দলালের 'সতী'-চিত্র-পরিচায়িকা থেকে উদ্ধৃত—

"Had the painter of this picture been a European, we should unquestionably have had the subject presented to us as a fine-looking woman, drawn to her full height, and facing the spectators in a mingling of beauty and triumph. Nothing can be more significant of the distinctive character of Indian feeling, however, that the way in which Mr. Nanda Lall Bose has here set himself to approach the idea. We see before us a woman, beautiful indeed, and adorned like a bride, with her whole mind set on the moment of triumph, yet without the slightest consciousness of her own glory. The form is pure sattva, without one particle of rajas, as the Indian thinker might express it. The spirelike flames leap up. She kneels throned on a summit of fire. Yet there is no fear. No farewell song is mingled with her praying. Her eyes see nothing— neither the flames beneath, nor the loved one she is leaving— nothing at all, save the sacred form of him who she is about to rejoin. Her mind is quiet, flooded with peace. The moment is one of union. She knows nothing of separation."[৪৫]

এ শুধু চিত্র-পরিচয় নয়, ভারতাত্মার অন্তরময় অনুভব। আর-এক অর্থে এ তাঁরই আত্মপরিচয়। যে জীবনসাধনায় তিনি এ প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন, তা মৃত্যুর অন্ধকার বিদীর্ণ করে অমৃতের শাশ্বত অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। গুরুর কাছে তো তিনি শুনেছিলেন, "সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালোবাসা।· · মৃত্যু অনিবার্য জেনে নিজেকে সর্বতোভাবে তিলে তিলে অন্যের জন্য উৎসর্গ করতে হবে।"

দেহাবসানের কিছুদিন আগে দীনেশচন্দ্র সেনের কাছ থেকে নিবেদিতা 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র একটি প্রস্তরমূর্তি চেয়ে এনেছিলেন। এ মূর্তি যার কাছে থাকবে, তার অকল্যাণের সম্ভাবনা— এই সংস্কারবশে দীনেশচন্দ্র মূর্তিটি প্রথমে দিতে চান নি।

নিবেদিতা ঐতিহাসিকের মুখে এই অন্ধসংস্কারের কাহিনী শুনতে চান নি। তিন মাস পরে তাঁর অকালপ্রয়াণে[৪৬] কেউ কেউ অন্ধসংস্কারেরই জয় হয়েছে ভেবে ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু নিবেদিতার অনন্ত আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ শেষবাণী— 'The frail boat is sinking, but I shall yet see the sunrise'—যখন তাঁর জীবন থেকে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, তখন ভারত-ইতিহাসের এই প্রজ্ঞাপারমিতার দিব্যকণ্ঠ আমাদের আশ্বস্ত করে। এমন মৃত্যু আছে যা জীবনের সর্বোত্তম প্রকাশ।

---

৪৫ *Civic and National Ideal:* Nivedita

৪৬ ১৩ই অক্টোবর ১৯১১

কাব্যের স্বরূপ

প্রবাসজীবন চৌধুরী

একটি বিশেষ প্রকারের আনন্দদান করাই কাব্যের প্রত্যক্ষ ও প্রধান ধর্ম। এই সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে, এই আনন্দদান যে বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে এবং যে মানসব্যাপার দ্বারা সম্পাদিত হয় তারাও কাব্যের স্বরূপ-নির্ণয়ে বা লক্ষণ-বিচারে বিবেচিত হয়। আনন্দদানই কাব্যের সর্বাধিক লক্ষণীয় বিষয়। কারণ, আনন্দলাভ আমাদের সবচেয়ে প্রিয়। কোনো মনুষ্যনির্মিত বস্তুর উদ্দেশ্য কি তাও আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য। যেহেতু কাব্যের এই আনন্দসৃষ্টিকারিতা সর্বাগ্রে আমাদের চোখে পড়ে, সেহেতু এই গুণটির দ্বারাই আমাদের কাছে কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপিত। অবশ্য কাব্যের এই প্রাথমিক সংজ্ঞাটি—যা এখন বীজ-আকারে আছে, ক্রমে ক্রমে তা মূল শাখা-প্রশাখা-পল্লবে প্রসারিত হবে। কারণ এই সংজ্ঞাটির সংজ্ঞা—আবার তার সংজ্ঞা—এইভাবে অনেক তত্ত্বের সারিতে টান পড়বে যেই আমরা কাব্যকে বিশদরূপে জানতে অগ্রসর হব। বিশেষ ধরণের আনন্দদান যা কাব্যের প্রত্যক্ষ ও প্রধান ধর্ম বলা হল তারও স্বরূপ এবং লক্ষণ -নির্ণয় করতে হবে এবং সেগুলির গুণধর্মও বিচার করতে হবে। তা না হলে যদি বলা হয় যে, কাব্য তাই যা একটি বিশেষ ধরণের আনন্দ দেয় এবং সেই বিশেষ ধরণের আনন্দ সেই বস্তু যা কাব্য হতেই পাওয়া যায় তা হলে স্পষ্টই দেখা যায় শব্দের আবর্তেই শুধু ঘোরা হয়, বাস্তবিক কোনো জ্ঞান হয় না। কাব্যের যা বৈশিষ্ট্য তার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন এবং এই ব্যাখ্যার বা সংজ্ঞা-নিরূপণ ব্যাপারের শেষ ধারণাগুলি আমাদের সাধারণ জ্ঞান-সাপেক্ষ ও সার্বিক হতে হবে। তা না হলে আমাদের কাব্য-মীমাংসায় পৌঁছনো সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় কথা ॥ প্রথমেই কাব্যের আনন্দকে সাধারণ আনন্দ হতে পৃথক বলে জানতে হবে। নয়তো কাব্যের সঙ্গে সাধারণ আমোদ-প্রমোদ বা ক্রিয়া-কলাপের কোনো প্রভেদ থাকে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ[১] এবং কোলরিজ[২] কাব্যের আনন্দ দিয়েই তার লক্ষণ বিচার করেছেন। কিন্তু তাঁরা কাব্যের আনন্দকে অন্যান্য আনন্দ হতে পৃথক করে দেখেন নি বা দেখান নি এবং সেইজন্যই দুই রকমের সমালোচনার হাতও এড়াতে পারেন নি। প্রথমতঃ, যেমন টলস্টয়ের মতে কাব্যের কাজ যদি আনন্দদানই হয় তবে তাকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে কোনো গৌরবের বস্তু বলে মনে হবে না। তা ছাড়া কাব্য এমন কি করে, যার জন্য সে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হতে পারে? ব্যসন হতেও তো আমরা আনন্দলাভ করে থাকি। দ্বিতীয়তঃ, দুঃখমূলক নাটক বা ট্র্যাজেডি যে ধরণের আনন্দ আমাদের দেয় তাকে তো সাধারণ অর্থে

১ "The end of poetry is to produce excitement in co-existence with an overbalance of pleasure." —Wordsworth · *Preface to Lyrical Ballads,* 1800.

২ "It is that species of composition which is opposed to science by proposing for itself its immediate object pleasure, not truth." Coleridge : *On Poesy or Art,* (1818) in Biographia Literaria (Oxford. 1907)। তেমনই Dryden বলেন : "Delight is the chief aim." *Essay on Dramatic Poesy* (1668)। আরও অনেকে, যেমন Horace ও Philip Sidney বলেন : শিক্ষা ও আনন্দ - দান উভয়ই কাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানেও কাব্যের আনন্দঘন অংশটুকুর বৈশিষ্ট্য বলা হল না — অধিকন্তু মনে রাখতে হবে যে কাব্যনীতি শিক্ষার বাহন নয়।

আনন্দ বলা যায় না। কেননা তা হলে বলতে হয় যে আমরা যখন নায়কের দুঃখে অশ্রুবিগলিত হই তখন আমরা মিথ্যাচার করি; আসলে আমরা আমোদই পাই এবং পরের দুঃখে আমোদ পাওয়াটা আমাদের স্বভাব। কিংবা বলতে হয়, যে-ট্র্যাজেডি হতে কোনো আনন্দই পাওয়া যায় না তা কাব্য নয়। অতঃপর এই বিপর্যয় নিবারণ করবার জন্যই অ্যারিস্টটল[৩] বললেন যে, ট্র্যাজেডির একটি বিশেষ আনন্দ (proper pleasure) আছে। যদিও অ্যারিস্টটল এই বিশেষ আনন্দটির ব্যাখ্যা করেন নি। কাণ্টও এক বিশেষ ধরণের আনন্দ দ্বারা শিল্পের লক্ষণ-নির্দেশ করেছেন— সে আনন্দ ইন্দ্রিয়জনিত সুখ, জ্ঞানভিত্তিক বা নীতিমূলক আনন্দ হতে বিলক্ষণ। সুতরাং কাব্যের আনন্দের প্রকৃতি একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লংগাইনাস[৪] এক মহান তুরীয়ানন্দরূপে দেখেছেন এবং অভিনবগুপ্ত[৫] এ আনন্দকে 'অলৌকিক-চমৎকার' বলেছেন, আর মম্মট[৬] এ আনন্দকে বলেছেন 'সদ্যপরানিবৃত্তিঃ'। কাব্যসৃষ্টি ও কাব্যসম্ভোগ যে মানস-ক্ষেত্রে সম্ভব হয় তা সাধারণ নয় বলেই ভারতীয় আলংকারিকগণ মনে করেন। চিত্তের এই উচ্চস্তরে সাধারণ স্বার্থ-বুদ্ধি এবং কামনা-বাসনা লোপ পায় ও কবি বা কাব্যরসিক কাব্যবর্ণিত ভাবাদি দ্বারা অভিভূত না হয়ে তাদের সম্যক্ উপলব্ধি করেন এবং ঐ সঙ্গে আপনার নৈর্ব্যক্তিক চৈতন্য-স্বরূপকেও উপলব্ধি করেন। তার এই আত্মোপলব্ধির সঙ্গে জড়িত হয় একটি অলৌকিক আনন্দ— যাকে 'পরাব্রহ্মাস্বাদ সচিব'[৭] বা 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরা'[৮] বলা হয়েছে— কারণ এই মুক্ত-স্বভাব আত্মা ভাবাদি দ্বারা চালিত না হয়ে তাদের কেবল মনন করে তৃপ্ত হয়। অতঃপর আমরা দেখি যে কাব্যের স্বরূপকে ভারতীয় কাব্য-দর্শনে 'রস' সংজ্ঞা-দ্বারা বোঝানো হয়েছে[৯] এবং এই রসকে নিজের সম্বিতের আস্বাদ বলা হয়েছে— যে সম্বিতের উপর কাব্যে বর্ণিত ও চিত্তে জাগরিত ভাবগুলি চিত্রিত হয়ে থাকে[১০]। আনন্দঘন আত্মার আস্বাদ বিশুদ্ধ আনন্দদায়ক হবারই কথা এবং কাব্যের ভাবাদি সেই বিশিষ্ট অলৌকিক আনন্দকে 'চিত্রতাকরণ' করে মাত্র, অর্থাৎ তার বৈচিত্র্য সম্পাদন করে[১১]।

তৃতীয় কথা ॥ এই আনন্দ-দ্বারা কাব্যকে মানুষের অন্যান্য অনেক রচনাকার্য হতে পৃথক করা সম্ভব; যথা, তার কারুশিল্প ও ফলিত বিজ্ঞান হতে। কারুশিল্প ও ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আনন্দই রচনার প্রত্যক্ষ ও প্রধান লক্ষ্য নয়— বরং মানুষের প্রয়োজন-সিদ্ধিই সেই লক্ষ্য। কিন্তু কাব্যকে অন্যান্য ললিতকলা হতে কোন্ লক্ষণ দ্বারা পৃথক করা যায়? সেসব ক্ষেত্রেও অলৌকিক আনন্দ-প্রদানই প্রত্যক্ষ ও প্রধান

---

৩ Bywaterএর অনুবাদ *Aristotle on the Art of Poetry* (1920) pp. 52, 79, 95।

৪ *Longinus on the Sublime* অনুবাদক Saintsbury। তাঁর *Loci Critici* দ্রষ্টব্য।

৫ ধ্বন্যালোকলোচন ৩/৩৩ : অভিনবগুপ্ত-রচিত। আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকের ভাষ্য।

৬ কাব্যপ্রকাশ ৪।২৭-২৮

৭ ধ্বন্যালোকলোচন ২।৪

৮ সাহিত্য-দর্পণ : বিশ্বনাথ-রচিত ৩।৩৫

৯ ভরত : নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৪
অভিনবগুপ্ত : ধ্বন্যালোকলোচন ১।৪, ২।৩
সাহিত্য-দর্পণ ১।৩ "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং"

১০ নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৫। সাহিত্য-দর্পণ ৩।৩৫

১১ অভিনব-ভারতী ৬।৩৫ (অভিনবগুপ্ত রচিত ভারতের নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য)।

উদ্দেশ্য। এখানে বলা যায় যে, কাব্যের মাধ্যম বা আধার ভাষা— অন্যান্য ললিতকলার তা নয়। সংগীতে ভাষার প্রয়োগ হয়, কিন্তু তার নিজস্ব ও প্রধান মাধ্যম ধ্বনি ও তার স্বর তাল লয় ইত্যাদি। চিত্র ও নৃত্যকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম। এইসব বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে এইসকল শিল্পকলা মানবহৃদয়ের নানা ভাব প্রকাশ করে এবং সেগুলিকে রসিক-চিত্তে এমন ভাবে সংক্রামিত করে যে তাদের এইসব ভাবের রসানুভূতি হয়, যেমন কাব্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং অনুরূপ আনন্দেরও উপলব্ধি হয়। কিন্তু কাব্যকে সাহিত্যকলার অপর কয়েকটি শাখা হতে কোন্ লক্ষণ দ্বারা প্রভেদ করা যায়? তারাও তো ভাষার মাধ্যমেই অলৌকিক আনন্দ-প্রদান করে। এখানে কি ছন্দমিল-আদির সাহায্যে কাব্যকে নাটক উপন্যাস গল্প ও রম্যরচনা হতে পৃথক করব? কিন্তু, যেমন শেলী বলেছেন[১২]— এইরকম ভেদ মনে করা অযৌক্তিক ও স্থুল বুদ্ধির পরিচায়ক। কারণ কাব্য তো গদ্যেও লেখা হয়ে থাকে এবং কাব্যমাত্রকেই যে ছন্দমিলের আশ্রয় নিতে হবে এমন কথা আজকের কবিরা তো মানবেনই না। তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, এমন-একটি রচনাকে কাব্য বলব যার ভাবসম্পদ খুব ঘন এবং সেইজন্য সেটি আবেগপ্রধান। এইজন্য কাব্যের ভাষা পদ্য হতে চায়, কারণ তা ভাব-প্রকাশের তাগিদে সংগীতের সাহায্য নিতে চায়। শব্দের কেবল অর্থ-জ্ঞাপনের কাজটিতে কবি সন্তুষ্ট নন, তিনি শব্দের ধ্বনিরও সাহায্য নেন তাঁর ভাব-প্রকাশের কাজে। তাই বিষয়-অনুসারে বিবিধ ছন্দের সৃষ্টি ক'রে শব্দ-চয়নে শব্দের ধ্বনির দিকে কান রাখেন। কেবল অর্থের দিক দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের— 'ভোরের প্রথম আলো, জলের ওপারে' বা 'তরুণী রজনীগন্ধা, উন্নমিতা, একান্ত কৌতুকী'— এমন কোনো গভীর ভাবাবেগ জাগায় না। কিন্তু এই পংক্তি দুটি পাঠ বা শ্রবণ করলে চিত্ত আকুল হয়ে ওঠে এক অব্যক্ত সুষমায়। এইজন্য কাব্যের অনুবাদ অসম্ভব।

চতুর্থ কথা॥ কাব্যের এই বিশিষ্ট আনন্দরসটি দিয়েই কাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করতে হবে— সৌন্দর্য দিয়ে নয়। সৌন্দর্য সম্বন্ধেও সঠিক ধারণা চাই। সুন্দর বলতে অনেক কথাই আমাদের চিন্তায় উপস্থিত হয়। কাব্য সুন্দরকে প্রকাশ করে এ কথা বললে সাধারণতঃ মনে হবে কাব্যে রমণীয় বস্তুরই প্রতিফলন হয় এবং তা মনোহরণ করে— যেমন মনোহরণ করে কোনো অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা বা রূপবতী নারী। কিন্তু মনোহারিতা বা রমণীয়তাই কাব্যের লক্ষণ হতে পারে না, কারণ কাব্যে মানবহৃদয়ের নানান ভাবের রূপায়ণ হয় এবং ভয়ংকর ও বীভৎস রসেরও কাব্য হয়। সুতরাং কাব্যকে যদি সৌন্দর্যের ধারণা দিয়ে পরিচয় দিতে হয় তা হলে সৌন্দর্যের সাধারণ ধারণাটিকে একটু বদলে নিতে হবে। যথার্থ সৌন্দযবোধ তখনই ঘটে যখন আমরা যে-কোনো ভাবকে— তা আপাতরমণীয় হোক বা না-হোক— নিবিড় অনুভূতি-দ্বারা উপলব্ধি করি এবং তার গভীর সত্যটিকে জানি। এই জানার সঙ্গেসঙ্গেই আপন আনন্দস্বরূপ চৈতন্যকেও জানতে পারি। কারণ, এই প্রকারে কোনো ভাবকে জানার সময়ে চৈতন্যপুরুষ নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক ভাব ধারণ করে— অর্থাৎ তখন সে তার সাধারণ জীবজগতের নানান বিক্ষেপ হতে নিষ্কৃতি পেয়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধেই সচেতন হয়। এই আত্মোপলব্ধি যখন হয় তখনই হয় রসানুভূতি, এবং একেই যদি সৌন্দর্যানুভূতি বলা যায় তা হলে সেই অর্থে কাব্য সৌন্দর্যকে প্রকাশ বা রূপায়ণ করে।

---

১২ "The distinction between poets and prose writers is a vulgar error." *Defence of Poetry*, 1821

রবীন্দ্রনাথও সৌন্দর্যের প্রচলিত অর্থে কাব্যের আনন্দকে গ্রহণ করেন নি বরং এইরূপ এক পরিবর্তিত অর্থে সৌন্দর্য তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল।[১৩] যেহেতু সৌন্দর্যের এই উন্নত সংজ্ঞা চলিত নয় সেজন্য সাধারণতঃ এই ধারণাটি কাব্যের সংজ্ঞা-নিরূপণে ব্যবহৃত হয় না। ভারতীয় কাব্য-দার্শনিকগণও তা করেন নি। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও বড়ো একটা করেন নি।

আনন্দের সংজ্ঞাটির বেলায় এরকম সংকটের সম্মুখীন হতে হয় না; কারণ আনন্দের যে স্তরভেদ আছে তা সকলের বিদিত এবং কাব্যানুশীলনের আনন্দ যে জাগতিক ক্রিয়াকর্মের লৌকিক আনন্দ হতে ভিন্ন তা প্রায় সকল কাব্যামোদীই অনুভব করেন।

পঞ্চম কথা॥ এই বিশিষ্ট এবং অলৌকিক আনন্দটি যেমন সাধারণ লৌকিক আনন্দ থেকে পৃথক বস্তু, তেমনই আবার তা জ্ঞানের আনন্দ (যা বিজ্ঞান ও দর্শন অনুশীলনে লাভ হয়) হতেও ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু এ কথাও সত্য যে কোনো কাব্যে বিশুদ্ধ কাব্যিক আনন্দের সঙ্গে এই দুই প্রকার আনন্দও অল্পবিস্তর মিশ্রিত থাকে। তবুও কাব্যের কাব্যত্ব তার এই বিশিষ্ট আনন্দদানের শক্তিসামর্থ্যেই। আবার এও দেখা যায় যে, কাব্যকে লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নামানো হয় এবং এর দ্বারা জনশিক্ষা বা অন্যান্য উপকারিতার কথাও বলা হয়। আজকাল ললিত ও ফলিত কলার পরিপাটি পৃথকীকরণকে অনেকেই সুনজরে দেখেন না, যেমন দেখেন নি আনাতোল ফ্রাঁস ও জন ডিউই। কারণ ফলিত কলা বা কারুশিল্পের মধ্যেও নিরাসক্ত মনের অবকাশ থাকে, শুধু প্রয়োজনসিদ্ধির তাগিদ ও তৃপ্তি নয় এবং সকল ললিতকলা চারু-শিল্পেরও কিছু কিছু উপযোগিতা থাকে। অন্ততঃ তা থাকা স্বাভাবিক ও উচিতও বটে। কবি বা শিল্পী মানুষকে কেবল বিশুদ্ধ মননের বিষয়বস্তু উপহার দেন না, ঐ সঙ্গে তাকে কিছু বলেন বা শিক্ষা দেন। কাব্যের বা ললিতকলার মধ্যে কিছু নিহিত বাণী থাকে, সে বাণী এ নয় যে শান্ত সমাহিত সৌন্দর্যই মানুষের একমাত্র কাম্য (যা কবি কীট্‌স বলেছিলেন) বরং এমন-কিছু যা মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবন-যুদ্ধে বাস্তবিক সাহায্য করে। অবশ্য এই বাণীটি সরাসরিভাবে কাব্যকলায় পাওয়া যায় না, আভাসে-ইঙ্গিতেই হয় তার প্রকাশ এবং রসবোধের অন্তর্গত হয়েই সে মানুষের কাছে আসে। এ কথা স্বীকার করেও বলা যায় কাব্যের কাব্যত্ব তার বিশুদ্ধ রস-পরিবেশনে এবং যেখানে এইরূপ ব্যবহারিক কিংবা বুদ্ধিমূলক কিংবা নীতি-ধর্মানুপ্রাণিত মূল্যবোধ কাব্যের কাব্যিক মূল্যবোধকে অপ্রধান করে দেয়, সেখানে কাব্য আর কাব্য থাকে না। কাব্যের মধ্যে ব্যবহারিক মনোভাবের এবং জ্ঞান নীতি ও ধর্মের প্রেরণার দৃষ্টান্ত যেমন অজস্র তেমনই আবার এই ভাবগুলির আধিক্যে কাব্যের রসভঙ্গ এবং অধঃপতনের দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

ষষ্ঠ কথা॥ কাব্যের স্বরূপনির্ণয়ে অনেকে কাব্যের শব্দপ্রয়োগ-কৌশলকে আশ্রয় করেছেন। ধ্বনিবাদীরা— যেমন ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন[১৪] মনে করেন যে শব্দ এমন রূপে কাব্যে প্রয়োগ করা হয় যে তাদের বাচ্যার্থের মধ্য দিয়ে এবং তাকে ছাড়িয়ে একটি ব্যঞ্জনার্থ প্রকাশিত হয়, যা কাব্যের প্রধান অর্থ হয়ে চিত্তকে একটি চমৎকারিতার আস্বাদ দেয়। শরীরের লাবণ্য যেমন শরীরের অবয়ব দ্বারাই প্রকাশিত হয়েও তা শরীরকে অতিক্রম করে একটি স্বতন্ত্র ভাববস্তু রূপে প্রতিভাত হয়—কাব্যের ধ্বনিকে সেই

১৩ দ্রষ্টব্য সাহিত্যের পথে।

১৪ ধ্বন্যালোক ১।১।৫

ভাবেই বুঝতে হবে। এখন এই চমৎকারিত্বের মূলে আছে শব্দের এইরূপ ব্যঞ্জনাশক্তি, বিশুদ্ধ ধ্বনিবাদ তাই বলে। কিন্তু আনন্দবর্ধন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ধ্বনিত অর্থ তিন প্রকার— বস্তুমাত্র, অলংকার এবং রসাদি, এবং এদের মধ্যে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ— কাব্যের পরমার্থ[১৫]। এখন কাব্যের এই ভালোমন্দের বিচার যদি কেবল ধ্বনির ভালোমন্দের বিচারে না হয়ে অন্য-কিছুর সাহায্যে হয় তা হলেই ধ্বনিকে আর 'কাব্যের আত্মা' বলা যায় না। সুতরাং ধ্বনিকার তাঁর 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরীতি' সূত্রের যথার্থ মূল্য দেন নি। বাস্তবিক বিচারেও দেখা যায় যে যদিও ভাবকে রসে উন্নীত করতে হলে— অর্থাৎ কাব্যানন্দের উপযোগীরূপে প্রকাশ করতে হলে—শব্দের বাচ্যার্থের চেয়ে তাদের ব্যঞ্জনার্থেরই বেশি সাহায্য নিতে হয় তবুও এই রসই সেই কাব্যানন্দের স্বরূপ; শব্দের ব্যঞ্জনা ব্যাপারটি নয়। ব্যঞ্জনা ব্যাপার একটি বিশেষ ধরণের আনন্দ দেয় বটে তবে তা কাব্যানন্দের সমগোত্রীয় হয় না এবং এই আনন্দ অনেক রচনায় থাকলেও তা যথার্থ কাব্য বলে বিবেচিত হয় না বরং কেবল শব্দপ্রয়োগের কৌশল হিসাবেই প্রশংসা লাভ করে থাকে। যেখানে কোনো ভাবের প্রকাশ মুখ্য নয়— বরং কোনো বক্তব্য বিষয়, সংবাদ বা আদেশ প্রদানই মুখ্য— সেখানে রচনা কাব্যপদবাচ্য নয়। উদাহরণতঃ একটি শ্লোকের উল্লেখ করা যায় যার বাচ্যার্থ হল: 'হে তপস্বি! তুমি এখন নির্ভয়ে যেখানে সেখানে যাইতে পারো; এখানে যে কুকুরটি ছিল তাহাকে গোদাবরীতটবাসী সিংহ বধ করিয়াছে!' এর ব্যঙ্গ্যার্থ হল: 'হে তপস্বি! তোমার এখন যেখানে সেখানে যাওয়া মানে সিংহের কবলে পড়া।' শ্লোকটি কাব্যস্তরে উঠতে পারে না, তবে একটি কৌশলী বক্রোক্তিরূপে আমাদের আমোদ দেয়। কাব্য আমোদ বা কলাকৌশলের ব্যাপার নয়, বরং গভীর অনুভূতি ও রসোপলব্ধির বস্তু— যার দ্বারা রসিক-চিত্ত ভাবের সত্য-রূপটিকে এবং সেই সঙ্গে আপন চৈতন্য-স্বরূপকে আস্বাদ করে। গভীর রসসৃষ্টি সম্ভব হয় শব্দের ধ্বনির মাধ্যমেই। কারণ কোনো ভাবকে পরিস্ফুট করতে হলে শুধু তার উল্লেখে কোনো কাজ হয় না, তাকে তার অন্তর্গত সঞ্চারীভাব ও উপযুক্ত বিভাব এবং অনুভাব সাহায্যে প্রকাশ করতে হবে এবং এখানে শব্দার্থ দ্বারা কেবল সেই-সকল বস্তু ও ভাবগুলিরই প্রকাশ সম্ভব— যারা কাব্যের সেই মুখ্য বা স্থায়ী ভাবটিকে জাগরিত করে এবং প্রাণপূর্ণ করে তোলে। যথা, শৃঙ্গার রসের বেলায় শব্দার্থ দ্বারা কোনো নায়ক বা নায়িকার সাধ-বাসনা আশা-নিরাশা হর্ষ-বিষাদ আকাঙ্ক্ষা-বিতৃষ্ণা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবগুলিকে প্রকাশ করা যায়— কিছু এগুলির নাম নিয়ে আর কিছু স্থান কাল ও নায়ক-নায়িকার পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গের হাব-ভাব হাস্য-লাস্য ও অশ্রুবর্ষণ প্রভৃতির বর্ণনা দিয়ে— যা ঐ ভাব-গুলিরই দ্যোতক। সুতরাং শব্দের ধ্বনি রসসৃষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু তাই বলে ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বললে ভুল হয়, কারণ রসই কাব্যের আত্মা এবং ধ্বনি তার কায়ামাত্র। ধ্বনি যদি রসসৃষ্টির উপায় না হয়ে অন্য কাজে ব্যবহৃত হয় তা হলে সে রচনা কাব্য হয় না— কুশল রচনার নিদর্শন হিসাবেই গণ্য হয়।

ধ্বনিবাদীদের মতো রীতিবাদীরা রীতিকে, আলংকারিকেরা কাব্যালংকারকে ও বক্রোক্তিবাদীরা বক্রোক্তিকে বা কাব্য-বিন্যাসের কৌশলকে কাব্যের আত্মা বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এখানেও এ কথা বলেই এঁদের মতবাদ খণ্ডন করা যায় যে, এঁদের নিরূপিত লক্ষণগুলি অব্যাপ্তি-দোষে 'দুষ্ট'; কারণ কোনো রচনারীতি অলংকার বা বক্রোক্তি অভাবেও উৎকৃষ্ট কাব্য হতে পারে এবং ওগুলি কাব্যের

১৫ ধ্বন্যালোক ১।৪-৫

অপরিহার্য উপাদান নয়। রসই কাব্যের আত্মা এবং সেই রসে ঔচিত্য-অনুসারে কবি কাব্যে উপযুক্ত রীতি, বক্রোক্তি ও অলংকারের প্রয়োগ করেন। এগুলি সেই রসেরই সুষ্ঠু প্রকাশের উপায়। রসই নিজেকে কাব্যে প্রস্ফুটিত করার জন্য এই-সকল উপায় সৃজন করে এবং এদের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করে। রসের তাগিদে কাব্যের অন্তরাত্মা হতে না এলে এরা সব বহিরঙ্গ-হিসাবে কাব্যশরীরে ভারস্বরূপ লেগে থাকে— কাব্যের অন্তর্গত হয়ে সুন্দরী নারীর শোভন সজ্জা ও ভূষণের মতো তার রূপলাবণ্যকে প্রকাশ করে না। সুতরাং দেখা যায় যে কাব্যকর্মে এই-সকল ব্যাপারকে কাব্যাত্মা রসের অধীন ও উপায়-হিসাবেই দেখা উচিত— স্বতন্ত্র ভাবে নয়।

সংশোধন : বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৩

পৃ ২৩৮ শেষ অনুচ্ছেদের চতুর্থ ছত্র : 'পূর্ববর্তী স্বরের স্থানটি' স্থলে 'পূর্ববর্তী স্বরের পরবর্তী স্থানটি'।

নগেন্দ্রনাথ বসু ১৮৬৬ - ১৯৩৮

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে, ইনি সেই সব 'জায়েন্ট'দের একজন যাঁরা জাতি গঠন করেন। এটা অত্যুক্তি নয়। জাতীয়-জীবনের একটি ক্ষেত্রে পথিকৃতের গৌরব তাঁর প্রাপ্য। কোষগ্রন্থ পূর্বেও ছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে কোষগ্রন্থ সংকলন করে জনসাধারণের নিকট জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। গান্ধীজি অবশ্য হিন্দী বিশ্বকোষ দেখে তাঁর মন্তব্য করেছিলেন। হিন্দী বিশ্বকোষ সংকলনে অনেক বিশেষজ্ঞের সহায়তা পেয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ। কিন্তু বাংলা বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ মূলতঃ তাঁর একক সাধনার ফল। কিশোর বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোষগ্রন্থ সংকলনের প্রেরণাকে অবলম্বন করে তাঁর জীবন বিকাশ লাভ করেছে। আর সেই জীবনের ইতিহাসও বিচিত্র।

বাংলা ১২৭৩ সালের (ইং ১৮৬৬) ২৩শে আষাঢ় শুক্রবার ছাতুবাবুর ভবন সংলগ্ন তারিণীদেবীর ৭৫নং বীডন স্ট্রীট ভবনে নগেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কর্তা-মা তারিণীদেবী কোটিপতি রামদুলাল সরকারের তৃতীয়া কন্যা; এঁর স্বামী কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহারাজ নবকৃষ্ণের দৌহিত্র। এঁদের একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণি। অনেক খুঁজে কালীকৃষ্ণ মেয়ের বিয়ে দিলেন তারিণীচরণ বসুর সঙ্গে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন তারিণীচরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ক্ষেত্রমণির তিন কন্যা এবং নীলমাধব ও নীলরতন দুই পুত্র। নগেন্দ্রনাথের পিতা নীলরতন কৈলাসচন্দ্র ঘোষের কন্যা পবিত্রকুমারীকে বিয়ে করেন। সিনিয়র স্কলার কৈলাসচন্দ্রের বিদ্বান হিসাবে সে যুগে বিশেষ খ্যাতি ছিল। নীলরতনের নগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ—এই দুই পুত্র এবং এক কন্যা। পবিত্রকুমারীর বয়স যখন মাত্র এগারো বছর আট মাস তখন নগেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। যেদিন তাঁর জন্ম সেদিনই পিতামহী হাজার টাকা দান করেছিলেন এবং সবাইকে বলেছিলেন যে, এই পুত্রসন্তানই বংশের মুখোজ্জ্বল করবে। অন্নপ্রাশনের উৎসবে ব্যয় হয়েছিল ষোলো হাজার টাকা।

নগেন্দ্রনাথের জন্মের পর কয়েক বছর পর্যন্ত পরিবারে অর্থের প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু ছিল না সুখ ও শান্তি। খুব অল্প বয়সে মার মৃত্যু হয়। বাবা ও জ্যেঠামশাই মদ ধরেছিলেন প্রথমযৌবনে। স্ত্রীর শোকে পিতা উন্মাদ। পিতামহী ক্ষেত্রমণির পক্ষে বিপুল সম্পত্তির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব ছিল না। কর্মচারীদের প্রবঞ্চনায় লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ঋণের দায়ে বিক্রি হয়ে গেল। বসতবাড়ি পর্যন্ত নিলামে উঠল। আদালতের পেয়াদা এসে তাঁদের বের করে বাড়ি দখল করবে এমন খবর যখন পাওয়া গেল তখন পিতামহী সবাইকে নিয়ে অন্যত্র গিয়ে উঠলেন। কিছুদিন বাগবাজার অঞ্চলে থাকবার পর ছাতুবাবুর বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া গেল।

নগেন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেন নরম্যাল স্কুলে। সেখান থেকে এসে ভর্তি হলেন ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারিতে। অষ্টম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত এখানে পড়লেন। তার পর একদিন হঠাৎ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কাশী পালিয়ে যাবার মতলব আঁটলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলিকাতায় এক বন্ধুর

নগেন্দ্রনাথ বসু

১৮৬৬-১৯৩৮

বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন দুদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাশী যাওয়া না হওয়ায় বাড়ি ফিরে আসতে হল।

মামাবাড়ি ছিল বিদ্যাচর্চার আবহাওয়া। মামা তাঁকে নিজের বাড়ি এনে ভর্তি করিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর মশায়ের মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিট্যুশনে। এখানে তৃতীয় শ্রেণীতে (ক্লাস এইটে) পড়বার সময় পারিবারিক জীবনে দেখা দিল চরম বিপর্যয়। পিতা উন্মাদ; একমাত্র বোন স্বামী হারিয়ে শিশুকন্যা নিয়ে এসে উঠেছে পিতৃগৃহে; বৃদ্ধা পিতামহী এতদিন দাসদাসী পরিবৃত হয়ে থাকতেন, নিজের হাতে কোনো কাজ করবার দরকার হয় নি কখনো। আজ তিনি সকলকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াচ্ছেন। মামাবাড়ির অবস্থা সচ্ছল: নগেন্দ্রনাথ সেখানে সুখেই ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর একদিন মনে হল, পরিবারের সবাই এত দুঃখে আছে, হয়তো দুবেলা নিয়মিত ভাত জোটে না এমন অবস্থা, অথচ তিনি সেই দুঃখের পরিবেশ থেকে দূরে নিশ্চিন্ত মসৃণ জীবন যাপন করছেন। এই আত্মপরতার বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি ঠাকুমার কাছে ফিরে এলেন সকলের সঙ্গে দুঃখের ভাগ নেবেন বলে।

সকলের সঙ্গে জীবন জড়াতে গিয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তার বদলে শুরু হল ব্যক্তিগত রুচি ও অভিপ্রায় অনুসারে পড়া। আর চলল সাহিত্যচর্চা। যখন চৌদ্দ বছরের কিশোর তখনই তিনি গুরু হিসাবে পেয়েছিলেন তাঁদের ভাড়াটিয়া কবি নন্দলাল সরকারকে। নন্দলাল 'কনোজের যুদ্ধ' নামক কাব্যের লেখক। কবিতা রচনার পাঠ এঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন নগেন্দ্রনাথ। সাহিত্য-চর্চায় আর-এক জন সঙ্গী ছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তৌফী। ব্যোমকেশের মধ্যস্থতায় এক ধনীপুত্রের আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেল একটি মাসিক পত্রিকা বের করবার। সম্পাদক নন্দলাল সরকার, পত্রিকার নাম 'তপস্বিনী'। এ পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ 'অক্ষিচাঁদ' নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন।

ছাতুবাবুর বাড়ির সামনেই ছিল বেঙ্গল থিয়েটার। দোতলার বারান্দা থেকে অভিনয় কিছু কিছু দেখা যেত। সুতরাং নগেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক কারণেই নাটক ও অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। 'কর্ণবীর' নামে ম্যাকবেথের অনুবাদ করলেন তিনি; খানিকটা ছাপা হল 'তপস্বিনী' পত্রিকায়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কর্ণবীরে'র পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হয় এবং কিছুকাল পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'তপস্বিনী' বেশি দিন চলে নি। এর পরে 'ভারত' নামে আর-একটি পত্রিকা শুরু হল। এই পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথের হ্যামলেটের অনুবাদ ছাপা হয়েছিল। দর্জিপাড়ার থিয়েট্রিক্যাল ক্লাবের জন্য তিনি পার্শ্বনাথ, শংকরাচার্য, লাউসেন, হরিরাজ প্রভৃতি নাটক রচনা করেছিলেন। নন্দলাল সরকারের চেষ্টায় 'কর্ণবীর' (ম্যাকবেথ) নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটারে। কয়েক হাজার টাকার টিকিটও বিক্রি হয়েছিল। কিন্তু পরিচালক জীবনকৃষ্ণ সেন টাকা আত্মসাৎ করবার উদ্দেশ্যে চাতুরী করে দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্তির পরই একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে দেওয়ায় অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। দর্জিপাড়ার ক্লাব মহাসমারোহে 'পার্শ্বনাথ' নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। কিন্তু কলিকাতার জৈনসম্প্রদায় আপত্তি করায় এর অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়।

'হরিরাজ' হ্যামলেট ও 'রাজতরঙ্গিণী'র কাহিনীর সংমিশ্রণে রচিত। নগেন্দ্রনাথের এক মঞ্চাভিজ্ঞ বন্ধু নিজের অভিরুচি অনুযায়ী পাণ্ডুলিপির আমূল পরিবর্তন করে স্টার থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্য অমৃতলাল বসুকে দেখতে দেন। অমৃতলালের পছন্দ হয় নি। তখন নগেন্দ্রনাথের বন্ধু নিজেই উদ্যোগী

হয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয় করেন। অভিনয় জনপ্রিয় হওয়ায় নাটকটি ছাপানো হয়। মূল পাণ্ডুলিপির এত বেশি অদল-বদল করা হয়েছিল যে নগেন্দ্রনাথ নামপত্রে নিজের বা অন্য কারো নাম দেন নি। প্রখ্যাত অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই নাটকে প্রধান অংশ গ্রহণ করতেন। নাটকের জনপ্রিয়তা হয়েছিল তাঁর জন্যই। 'হরিরাজে'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর অমরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলেন নামপত্রে লেখক হিসাবে নিজের নাম ছাপিয়ে। প্রকৃত লেখক নগেন্দ্রনাথ বসুর নাম একটি সংস্করণেও ছাপা হয় নি।

নাটক রচনা করে শখ মিটতে পারে, কিন্তু জীবিকার্জনের উপায় হয় না। তাঁদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। মাতামহের চেষ্টায় রেলি ব্রাদার্সের গুদামে নগেন্দ্রনাথ চাকরি পেলেন। টিঁকে থাকলে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। কিন্তু মাত্র ছয় দিন কাজ করবার পর তাঁর এ কাজ ভালো লাগল না। কাজ ছেড়ে দিয়ে জুটিয়ে নিলেন এক ছাত্র। বেতন বারো টাকা। সাত টাকা দিতেন ঠাকুমাকে ; আর পাঁচ টাকা মাইনে দিয়ে নিজে সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করলেন।

মাত্র সতেরো বছর বয়সে নগেন্দ্রনাথ এক বিরাট কোষগ্রন্থ সংকলনের পরিকল্পনা রূপায়িত করতে উদ্যোগী হলেন। কোষগ্রন্থের নাম 'শব্দেন্দু মহাকোষ'। এর পরিকল্পনাটি নগেন্দ্রনাথ নিজে এই ভাবে বিবৃত করেছেন: "শব্দেন্দু মহাকোষের তিনটি স্তম্ভ। প্রথম স্তম্ভে ইংরেজি আদ্য বর্ণমালা অনুসারে ইংরেজি শব্দ, তাহার ইংরেজি ও বাংলা অর্থ, প্রধান প্রধান ইংরেজি গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ এবং যে যে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও দার্শনিক শব্দের বিস্তৃত পরিচয় আবশ্যক, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ; দ্বিতীয় স্তম্ভে অকারাদি বর্ণানুক্রমে বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সকল প্রধান শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় বিবরণ; এবং তৃতীয় স্তম্ভে অকারাদি বর্ণানুক্রমে বাংলা, সংস্কৃত ও যে সকল বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে, সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ, প্রমাণ, প্রয়োগ এবং পর্যায় শব্দ বিস্তৃত ভাবে সংকলিত হইয়াছে।"

এই প্রচেষ্টায় নগেন্দ্রনাথের অংশীদার ছিলেন গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী সুরেশচন্দ্র বসু। সংকলনের সকল দায়িত্ব নগেন্দ্রনাথের ; ছাপা কাগজ বাঁধাই ইত্যাদির ব্যয় সুরেশচন্দ্রের। সংকলনের কাজ খুবই কঠিন। কঠোর পরিশ্রম করে প্রথম এক শত পৃষ্ঠা একা সংকলন করলেন। নানা বই দেখবার জন্য প্রায়ই তাঁকে মেটকাফ হলে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে কাজ করতে হত। কিন্তু এত পরিশ্রম বেশি দিন সইল না। শিরঃপীড়ায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তবু কাজ না করে উপায় নেই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কোষগ্রন্থের এক-একটি খণ্ড পর পর ছাপা হচ্ছে। সংকলন বন্ধ হলে প্রেস বসে থাকবে, গ্রাহকরা অধৈর্য হয়ে উঠবে। সুতরাং বেদনায় যখন অস্থির তখনও মাথায় বরফ চাপিয়ে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থায় একা কাজ করা যখন একান্তই অসম্ভব হয়ে উঠল তখন দুজন সহকারী নিযুক্ত করা হল।

এমনি করে 'শব্দেন্দু মহাকোষে'র চার শো পৃষ্ঠা ছাপা হয়ে গেল। তখন গ্রাহকসংখ্যা প্রায় দু হাজার। কোষগ্রন্থ সুসম্পন্ন হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। কিন্তু এই সময় 'শব্দেন্দু মহাকোষে'র মালিকানা নিয়ে গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সুরেশবাবু ছাপা বন্ধ করে দেন। নগেন্দ্রনাথের এত বড় দায়িত্ব একা বহন করবার মতো সাধ্য ছিল না। তাঁর এত আশা এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

এই সময়ে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র সুপণ্ডিত আনন্দকৃষ্ণ বসুর সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে নগেন্দ্রনাথের পরিচয় হল। আনন্দকৃষ্ণ আরবী ফারসী লাটিন গ্রীক সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজিতেও তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নাকি তাঁর কাছ থেকেই ইংরেজি শিখেছিলেন। ভাষা শেখার দিকে নগেন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল বরাবরই। জর্মন ফরাসী ও ফারসী ভাষা শিখতে শুরু করেছেন তখন। আনন্দকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হলেন।

রাধাকান্ত দেব বঙ্গলিপিতে 'শব্দকল্পদ্রুম' ছাপিয়েছিলেন। দেশের সর্বত্র এই বিরাট কোষগ্রন্থের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু লিপির বাধা এর ব্যাপক প্রচলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। নাগরী লিপিতে 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশের জন্য অনুরোধ আসতে লাগল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। রাধাকান্ত তখন পরলোক গমন করেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের কেউ এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারলেন না। বরদাপ্রসন্ন বসু ও হরিচরণ বসু 'শব্দকল্পদ্রুমে'র স্বত্ব ক্রয় করে নাগরীলিপিতে প্রকাশের আয়োজন করলেন।

সে সময় নগেন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। উপার্জন অত্যাবশ্যক। আনন্দকৃষ্ণের সুপারিশে 'শব্দকল্পদ্রুমে'র নতুন প্রকাশকরা তাঁকে কাজে নিযুক্ত করলেন। বেতন পঁচিশ টাকা। পূর্ব সংস্করণে যেসব শব্দ বাদ গেছে সেগুলি সংগ্রহ করে পরিশিষ্টে সংকলন করা হল তাঁর প্রধান দায়িত্ব। বৈদিক দার্শনিক জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনেক সংস্কৃত শব্দ পূর্ব সংস্করণে নেই। অপ্রকাশিত পুঁথি পড়ে সেগুলি সংকলন করতে হবে। এর জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুঁথি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে বহু পুঁথি ছিল। সেগুলি দেখবার অবাধ অধিকার পেলেন নগেন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে সুযোগ পেলেন গ্রন্থাগারের মুদ্রিত বই পড়বার। প্রথম থেকে ঐ পর্যন্ত যত বাংলা বই ছাপা হয়েছিল তার একটি করে কপি গ্রন্থাগারে ছিল। সুতরাং নগেন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পটভূমিকার সঙ্গে পরিচিত হবার এক অপূর্ব সুযোগ পেয়েছিলেন ঐ গ্রন্থাগারে।

কোষগ্রন্থ সংকলনের কাজ নগেন্দ্রনাথ আগেও করেছেন। সুতরাং চাকরি নতুন হলেও কাজটা নতুন নয়। আর এটা তাঁর মনের মতো কাজ। তা ছাড়া এ কাজে আর-একটা সুবিধা পেলেন। 'শব্দকল্পদ্রুমে'র প্রকাশকদের নিজস্ব ছাপাখানা ছিল। হরিচরণ বসুর আগ্রহে এই ছাপাখানায় তাঁর নাটক 'ধর্মবিজয় বা শংকরাচার্য' ছাপা হয় ১২৯৫ সালে। নাটকটির বেশ ভালো সমালোচনা হল। একদিন দুপুরে তিনি ছাপাখানায় বেঞ্চের উপরে শুয়ে বিশ্রাম করছেন, এমন সময় নাট্যকার অমৃতলাল বসু সেখানে কোনো কাজে এসে উপস্থিত হলেন। হরিচরণবাবু নগেন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত নাটকটির এক কপি তাঁর হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি দেখেছেন?

অমৃতলাল ভূমিকাটি পড়লেন। নাটকের আখ্যানবস্তু কোন্ কোন্ হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ভূমিকায় তার বিবরণ ছিল। নাট্যকারের পাণ্ডিত্য দেখে অমৃতলাল মন্তব্য করলেন যে, লেখক নাটক লিখে শুধু সময় নষ্ট করবে; অথচ যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় পুরাতত্ত্বের আলোচনা করলে তার যথেষ্ট উন্নতি হবে।

অমৃতলাল জানতেন না নাট্যকার সেখানে উপস্থিত। কিন্তু তাঁর উপদেশ মন্ত্রের মতো কাজ করল। নগেন্দ্রনাথ তখনই পুরাতত্ত্বচর্চার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এর পর থেকে নিয়মিতভাবে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে ভারতের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রামাণ্য গ্রন্থ পড়েছেন দিনের পর দিন।

কিছুকাল পরে এক অলৌকিক ঘটনায় নগেন্দ্রনাথের জীবনের সাধনা এক নতুন সার্থক পথ খুঁজে পেল। 'শব্দকল্পদ্রুমে'র শব্দ সংগ্রহের জন্য পুঁথির খোঁজে তিনি একবার এসেছেন বহরমপুরে। পুঁথির সন্ধান করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'শব্দকল্পদ্রুমে'র জন্য গ্রাহকও সংগ্রহ করতেন। খ্যাতনামা পণ্ডিত রামদাস সেনের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার দেখতে গিয়ে স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষিত ও সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। 'শব্দকল্পদ্রুমে'র গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধ করায় তাঁরা বললেন, এই গ্রন্থ খুবই মূল্যবান, সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে অধিকতর উপযোগী 'বিশ্বকোষ'। দুঃখের বিষয় একটি খণ্ড বেরিয়েই 'বিশ্বকোষ' বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলার শিক্ষিত-সমাজের এতে অপূরণীয় ক্ষতি হল। আপনি 'বিশ্বকোষ' বের করবার চেষ্টা করুন না কেন?

নগেন্দ্রনাথ হকচকিয়ে গেলেন : আমি করব? আমার সম্বল আর যোগ্যতা কই?

রাত্রিতে তিনবার স্বপ্ন দেখলেন। জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে জগজ্জননী আবির্ভূতা হয়ে আদেশ করলেন, কলকাতা যাও, বিশ্বকোষ বের করো।

— কিন্তু মা, আমি কি পারব?

মা আবার আদেশ করলেন, পারবে, আমি তোমার সহায়।

বহরমপুরে কয়েক দিন থাকবার কথা ছিল। কিন্তু স্বপ্নাদেশ লাভ করে সবকিছু বদলে গেল। সংকল্প স্থির হয়েছে। 'বিশ্বকোষ' নতুন করে বের করবার চেষ্টা করবেন। সুতরাং আর বিলম্ব নয়। পরদিনই কলিকাতা যেতে হবে।

কবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর অনুজ 'কঙ্কাবতী'র লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মিলিতভাবে 'বিশ্বকোষ' সংকলনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের নাম বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। ইংরেজিতেও তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে দক্ষ অফিসার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। ১২৯৩ সালে উপক্রমণিকা সহ ২২ সংখ্যায় (fascicule) 'বিশ্বকোষে'র প্রথম খণ্ড বের হয়। এই খণ্ডে শুধু 'অ' বর্ণ সম্পূর্ণ হয়েছিল। নামপত্রে রঙ্গলাল এবং ত্রৈলোক্যনাথ দুজনেরই নাম ছিল। 'বিশ্বকোষে'র ছাপার কাজ যাতে সুষ্ঠুরূপে হতে পারে সে জন্য রঙ্গলাল চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত রাহুতা গ্রামে নিজেদের বাড়িতে একটি ছাপাখানা করেছিলেন।

সংকলনের প্রধান দায়িত্ব ছিল রঙ্গলালের উপর, বৈষয়িক দিকটা পরিচালনা করতেন ত্রৈলোক্যনাথ। 'বিশ্বকোষে'র কাজ কিছু দূর অগ্রসর হবার পর ত্রৈলোক্যনাথকে সরকারী কাজে ইংলণ্ড যেতে হয়। তাঁর অনুপস্থিতি 'বিশ্বকোষ' বন্ধ হয়ে যাবার একটি অন্যতম কারণ। যেসব গ্রাহক অগ্রিম চাঁদা দিয়েছিলেন, 'বিশ্বকোষ' বন্ধ হওয়ায় তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে ত্রৈলোক্যনাথ টাকাকড়ি নিয়ে বিলেত পালিয়ে গেছেন।

রঙ্গলাল একা 'আ' বর্ণের 'আমিক্ষীয়' শব্দ পর্যন্ত সংকলন করে ছেপেছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ('আ') ১ হতে ৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গ্রাহকদের দেওয়া হয়েছে। ৮১ থেকে ১১২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছাপা হলেও নানা কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। সুতরাং 'আমিক্ষীয়' শব্দ পর্যন্ত এসে রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথের প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে গেল ১২৯৩ সালে।

এর কিছুকাল পরে ত্রৈলোক্যনাথ দেশে ফিরে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

এক দিন উনিশ বছরের এক তরুণ তাঁর আপিসে এসে উপস্থিত। 'বিশ্বকোষ' নতুন করে বের করবে, অনুমতি চায়। ত্রৈলোক্যনাথ প্রথমে কান দিলেন না তার কথায়। এমন অনভিজ্ঞ তরুণের কাজ নয় বিশ্বকোষ সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করা। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ নাছোড়বান্দা। একে একে বললেন 'শব্দেন্দু মহাকোষ' সংকলনের কথা; জানালেন 'শব্দকল্পদ্রুমে'র নতুন সংস্করণের সংকলনের দায়িত্ব অনেকটা তাঁর উপরে। ধীরে ধীরে ত্রৈলোক্যনাথ নগেন্দ্রনাথের কর্মক্ষমতায় আস্থাবান হলেন। সাফল্যের পথে যত অন্তরায় তার ব্যাখ্যা করে বললেন, বেশ, তুমি যদি সত্যি পার তবে আমার স্বত্ব তোমাকে লিখে দিচ্ছি।

রঙ্গলালও তাঁর স্বত্ব লিখে দিলেন নগেন্দ্রনাথকে।

'বিশ্বকোষে'র মালিকানা তো পেলেন, কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে? স্থির হল, সংকলনের সকল দায়িত্ব নগেন্দ্রনাথের একার; ছাপার দায়িত্ব গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসের উপেন্দ্রচন্দ্র বসুর। কিছুদিন 'শব্দকল্পদ্রুমে'র কাজও নগেন্দ্রনাথকে করতে হয়েছে 'বিশ্বকোষ' সংকলনের সঙ্গে। পঁচিশ টাকার চাকরিটি গেলে সংসার অচল হবে।

'বিশ্বকোষে'র দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠা থেকে নগেন্দ্রনাথের সম্পাদনা আরম্ভ। ১২৯৫ সালে (১৮৮৮ খ্রীঃ) তিনি এই কাজ শুরু করেন। গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির উপরেই 'বিশ্বকোষে'র ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। মাত্র শ-খানেক গ্রাহক ছিল। কিন্তু নতুন গ্রাহক করতে গেলে এ পর্যন্ত যতদূর ছাপা হয়েছে তা দেওয়া চাই। পুরনো ফর্মাগুলি রাহুতা গ্রামে পড়ে আছে। দাম প্রায় তিন হাজার টাকা। নতুন করে ছাপতে গেলে অনেক বেশি টাকা লাগবে। নগেন্দ্রনাথের অনুরোধে ত্রৈলোক্যনাথ সমস্ত ফর্মা হাজার টাকায় দিতে রাজী হলেন। অনেক কষ্টে নগদ পাঁচ শ টাকা দিতে পারলেন; এক বছরে শোধ করবার প্রতিশ্রুতিতে হ্যাণ্ডনোট দিলেন বাকি টাকাটার জন্য।

বছর পার হয়ে গেল। বিশ্বকোষ থেকে পাঁচ শ টাকা পাওয়া গেল না ঋণ শোধ করবার জন্য। নিরুপায় হয়ে ঠাকুমার সর্বশেষ অলংকারখানি বন্ধক দিয়ে পাঁচ শ টাকা দিলেন ত্রৈলোক্যনাথকে। আর পাঁচ শ টাকা গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসের উপেনবাবুকে দিয়ে নগেন্দ্রনাথ 'বিশ্বকোষে'র একমাত্র স্বত্বাধিকারী হলেন।

স্বত্বাধিকারী, কিন্তু কোনো আর্থিক লাভ নেই। তবু নগেন্দ্রনাথ বিশ্বকোষকেই করলেন তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। চব্বিশ বছরের একাগ্র সাধনায় এই বিরাট কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। একক প্রচেষ্টায় এমন ব্যাপক সংকলনের কাজ এর পূর্বে ভারতে হয় নি।

নগেন্দ্রনাথের জীবনের সকল কর্মপ্রচেষ্টাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিশ্বকোষের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বকোষের জন্য প্রবন্ধ রচনার তাগিদেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন। যে সব প্রসঙ্গের উপর সন্তোষজনক বইপত্র পাওয়া যায় নি তাদের সম্বন্ধে লেখার জন্য তিনি ঘুরে ঘুরে প্রাচীন পুঁথি ও অন্যান্য মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এইসব প্রবন্ধের জন্যই তাঁর বহুমুখী-গভীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কঠোর জ্ঞানসাধনার প্রতিদান তিনি পেয়েছিলেন নানাভাবে। এর মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা অন্যতম।

দেশবাসী নগেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের যোগ্য মর্যাদা দিতে বিলম্ব করে নি। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চন্দ্রবর্মার বিজয়লিপির পাঠোদ্ধার সম্পর্কে এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ পান। তার পর

থেকে সভ্য হিসাবে সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নাগরী লিপির উংপত্তির উপর তাঁর একটি মৌলিক রচনা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রেও তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন (১৩০২)। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথকে টেক্সটবুক কমিটির সভ্য নির্বাচিত করা হয়। ঐ বছরই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির ফিললজিক্যাল কমিটিরও সভ্য মনোনীত হন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে প্রথমাবধি নগেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পরিষদের সেই প্রথম দিকের অনিশ্চিত জীবনের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন নগেন্দ্রনাথ। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরিষদ পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। বিশ্বকোষের অনেক প্রবন্ধের খসড়া এখানে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলা পুথি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনা করে প্রকাশ করবার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন একজন পথিকৃং। এই-সব সম্পাদিত-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন পরিষদ, ছাপা হয়েছে তাঁরই বিশ্বকোষ প্রেসে।

পরিষদ পত্রিকা ছাড়া নগেন্দ্রনাথ কিছুদিন কায়স্থ পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে নগেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে উত্তরবঙ্গের পণ্ডিতসমাজ তাঁকে 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' উপাধিতে ভূষিত করেন। এ ছাড়া তিনি 'সিদ্ধান্তবারিধি' 'তত্ত্বচিন্তামণি' ও 'শব্দরত্নাকর' উপাধিও লাভ করেছিলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রত্নতত্ত্বের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল বলেই কয়েক বছরের জন্য তিনি এ কাজ গ্রহণ করেছিলেন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে বহু পুরাকীর্তির সচিত্র বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন একটি ইংরেজি গ্রন্থে।

১২৯৪-৯৫ সাল থেকে ১৩১৮ সাল পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথের অক্লান্ত সাধনার ফলে মোট ২২ খণ্ডে এবং ১৭,০০০ পৃষ্ঠায় বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ সম্পূর্ণ হয়। সংকলনের কাজ অবশ্য ত্রৈলোক্যনাথ এবং রঙ্গলাল কিছুকাল আগে থেকেই আরম্ভ করেছিলেন। প্রথম খণ্ড রাহুতার বিশ্বকোষ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে ১২৯৩ সালে প্রকাশিত হয়; সর্বশেষ খণ্ড কলিকাতার বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৮ সালে। প্রথম খণ্ডের কোনো কোনো কপিতে প্রকাশের তারিখ আছে ১৩০৯। এটা পুনর্মুদ্রণের তারিখ। রাহুতায় ছাপা কপি শেষ হয়ে যাবার পর নগেন্দ্রনাথ ঐ বছর নতুন করে ছেপেছিলেন।

বিশ্বকোষে কি পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে প্রথম সংস্করণের নামপত্রে বলা হয়েছে: "যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুংপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হাকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা; শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।"

বাংলা ভাষায় কোষগ্রন্থ রচনার ইতিহাস শুরু হয়েছে ফেলিক্স কেরির 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮১৯) দিয়ে। তার পর থেকে নানা ধরণের কোষগ্রন্থ সংকলনের প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বকোষের মতো এরূপ বিরাট, নির্ভরযোগ্য এবং সফল উদ্যম এর পূর্বে হয় নি। তবে, আধুনিক কোষগ্রন্থের আদর্শের সঙ্গে পার্থক্যটাও সহজেই চোখে পড়ে। কোষগ্রন্থ ও অভিধানের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সে সম্বন্ধে বিশ্বকোষের

সংকলকরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না। তাই বিশ্বকোষকে তাঁরা বলেছেন "অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান"। অভিধানে যে-সব সাধারণ শব্দের অর্থ পাওয়া যায় তাদের ব্যাখ্যাও বিশ্বকোষের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শব্দার্থের দিক থেকে বিশ্বকোষ যে সমৃদ্ধ তার উল্লেখ করে নগেন্দ্রনাথ বলেছেন : "শব্দ-কল্পদ্রুম অথবা বাচস্পত্য অভিধানে অধিকাংশ বৈদিক শব্দই নাই ; বিশ্বকোষে সেই-সকল বৈদিক শব্দ প্রমাণ প্রয়োগ, ভাষ্য টীকা সহ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

শব্দার্থ সংকলনকে প্রাধান্য দেবার ফলে অনাবশ্যকরূপে বিশ্বকোষের আকার বড় হয়েছে অথচ অনেক প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের উপযুক্ত আলোচনা সম্ভব হয় নি। অবশ্য এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম দিকেও অভিধানের মতো শব্দার্থ দেওয়া হত।

যদিও নাম বিশ্বকোষ, তথাপি ভারতীয়-বিদ্যার উপরেই এই গ্রন্থে জোর দেওয়া হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে বলেছেন : "ব্রিটানিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহাকোষ সমূহে ভারতবাসীর অবশ্যজ্ঞাতব্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় নানা বিষয় লিপিবদ্ধ হয় নাই, ভারতবাসীর সেইসব অভাব পূরণের দিকে লক্ষ রাখিয়াই বিশ্বকোষ সংকলিত হইয়াছে।"

আকর-গ্রন্থ হিসাবে বিশ্বকোষের মূল্য এই কারণেই। ভারতীয়-বিদ্যার বিভিন্ন শাখার বিচ্ছিন্ন ও স্বল্পপরিচিত তথ্যগুলি সংকলন করে একটি সংহত ও ধারাবাহিক রূপ দেবার কৃতিত্ব বিশ্বকোষের। শুধু সংকলন নয় ; পূর্বে যেসব প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কোথাও আলোচনা হয় নি সেসব প্রসঙ্গের উপর লেখার জন্য নগেন্দ্রনাথকে মৌলিক গবেষণা করতে হয়েছে। বিশ্বকোষের অনেক প্রবন্ধে এখন কিছু কিছু তথ্যগত ত্রুটি চোখে পড়ে। তা ছাড়া প্রথম মধ্য ও শেষ দিকের রচনাগুলির মধ্যে যে সামঞ্জস্যের অভাব আছে সে কথা নগেন্দ্রনাথই বলেছেন। কোষগ্রন্থের প্রসঙ্গ নির্বাচনে যে অব্‌জেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন কোথাও কোথাও তারও একটু অভাব দেখা যায়। সম্পাদক যেসব বিষয় সম্পর্কে বিশেষরূপে আগ্রহশীল সেইসব বিষয়ের প্রসঙ্গগুলির বিস্তার কিছু বেশি।

বিশ্বকোষ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবার সময় থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতসমাজ অনুরোধ করেন হিন্দী সংস্করণ সংকলনের জন্য। বাংলা সংস্করণ শেষ করে হিন্দী সংস্করণের কথা ভেবেই নগেন্দ্রনাথ বলেছেন : "বিশ্বকোষ কেবল বঙ্গবাসীর নহে, সমগ্র ভারতবাসীর ; যাহাতে এই বিশ্বকোষ সমগ্র ভারত-বাসীর অধিগম্য হয় তজ্জন্য ভারতবর্ষের সমগ্র বিদ্বৎসমাজ আমার সহায় হইবেন, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।"

হিন্দী সংস্করণের কাজ বাংলা বিশ্বকোষ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হবার কয়েক বছর পরে শুরু হয়েছিল। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের আগ্রহে নগেন্দ্রনাথ এই দুরূহ কাজে হাত দেন।

হিন্দী বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। পঁচিশ খণ্ডে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। হিন্দীভাষী পণ্ডিতদের কাছ থেকে নগেন্দ্রনাথ সংকলনের কাজে সহায়তা পেয়েছিলেন। মোটামুটি ৭৬৮ পৃষ্ঠার পঁচিশটি বাঁধানো খণ্ডের মূল্য ছিল ৩১৭ টাকা। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রকাশক বলেছেন : "হিন্দী বিশ্বকোষ হিন্দীকা ব্রিটেনিকা হৈ, চিত্র আর মানচিত্রো সে সুশোভিত হোতা হৈ। ইসকা তুলনা করনে বালা বড়া গ্রন্থ ভারতীয় কিসী ভী ভাষা মে নহী হৈ। হিন্দী সংসার মে য়হী এক ঐসা মহাকোষ হৈ জো হিন্দী ভাষাকো সজীব আর রাষ্ট্রীয়তাকে গুণো সে পরিশোভিত কর সকতা হৈ।"

হিন্দী সংস্করণকে বাংলা বিশ্বকোষের অনুবাদ মনে করলে ভুল করা হবে। বাংলা সংস্করণের ভুলত্রুটি সংশোধন করা ছাড়া মৌলিক রচনাও যোগ করা হয়েছে।

হিন্দী বিশ্বকোষের কয়েক খণ্ড দেখে মহাত্মা গান্ধী সম্পাদকের পাণ্ডিত্য ও কর্মক্ষমতায় মুগ্ধ হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে যোগ দিতে এসে গান্ধীজি নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কোনো খবর না দিয়েই গান্ধীজি ১৮ই পৌষ (১৩৩৫) রাত্রি আটটায় বিশ্বকোষ লেনে নগেন্দ্রনাথের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। নগেন্দ্রনাথ তখন হাঁপানী হৃদ্‌রোগ ও নেফ্রাইটিসে ভুগছিলেন। তথাপি তাঁর মনের জোর ও সুদৃঢ় আশাবাদ গান্ধীজির হৃদয় স্পর্শ করেছিল। হিন্দী বিশ্বকোষ সংকলনের উদ্যোগে নগেন্দ্রনাথের পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতি হবার আশঙ্কা। কিন্তু তার জন্য নগেন্দ্রনাথের ভাবনা নেই। গান্ধীজিকে তিনি বললেন, এই কাজই আমার সাধনা, এর মধ্য দিয়েই আমি ভগবানের সেবা করি। কর্মই আমার জীবন। গান্ধীজি লিখেছেন, "I was thankful for this pilgrimage, which I should never have missed. As I was talking to him I could not but recall Doctor Murray's labours on his great work···nations are made of such giants"।

গান্ধীজির বিশ্বকোষ লেনে এই 'তীর্থযাত্রা'র বিবরণ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি সংখ্যার "ইয়ং ইণ্ডিয়ায়" বেরিয়েছিল।

১৯শে পৌষ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে কাশীতে তাঁর থাকবার এবং কাজের সুবিধা করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই সুযোগ গ্রহণ করা নগেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

১৩৩৮ সালে আশ্বিন মাসে হিন্দী বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হয়। ১৩৪০ সালের বৈশাখ থেকে আরম্ভ হল বাংলা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৪২ সালের শ্রাবণ মাসে। এ কাজে নগেন্দ্রনাথের প্রধান অবলম্বন ছিলেন পুত্র বিশ্বনাথ। হিন্দী বিশ্বকোষ সংকলনের কাজ থেকেই তার শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ১৩৪১ সালের চৈত্র মাসে বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়। পুত্র-শোকাতুর নগেন্দ্রনাথ অপটু দেহ সত্ত্বেও চার খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন। ১৩৪৫ সালের ২৪শে আশ্বিন নগেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন।

বাংলা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ যে সম্পূর্ণ হতে পারে নি এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সম্পূর্ণ হলে নগেন্দ্রনাথের আজীবন অভিজ্ঞতার ফল এর মধ্যে পাওয়া যেত। প্রথম সংস্করণের সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণের কয়েক খণ্ড তুলনা করলেই পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন চোখে পড়ে। প্রসঙ্গ নির্বাচন, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ও বিন্যাস, মুদ্রণপারিপাট্য ইত্যাদি বিষয়ে নগেন্দ্রনাথ প্রভূত উন্নতি বিধান করেছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, বাংলা দেশের প্রায় সকল পণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত এঁদের নামের তালিকা থেকে উপলব্ধি করা যাবে বিশ্বকোষ বাঙালী মনীষার এক মিলিত প্রচেষ্টার ফল হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত।

নগেন্দ্রনাথের আর-একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'। বিশ্বকোষের মতো এর

ব্যাপক ব্যবহার না হলেও বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য দলিল এই গ্রন্থ। ১৩০৩ সালে নড়াইল-হাটবাড়িয়া জমিদার গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের উৎসাহে নগেন্দ্রনাথ এই কাজে ব্রতী হন। বহু কুলগ্রন্থ ইতিহাস শিলালিপি তাম্রশাসন ইত্যাদির সাহায্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈশ্য জাতির কুলবিবরণ তেরো খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন নগেন্দ্রনাথ। তিনি কায়স্থের কুলগৌরব সম্বন্ধে বিশেষরূপে সচেতন ছিলেন। কায়স্থ-সমাজের উন্নতি ও সংহতির জন্য তিনি অনেক কাজ করেছেন; কায়স্থদের উপবীত গ্রহণের আন্দোলনেও তিনি ছিলেন অগ্রণী।

বাংলা ভাষায় সুপ্রাচীন ও অপ্রাচীন যত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ আছে তা থেকে শব্দ সংকলন করে একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা অভিধান রচনা করবার আশা ছিল নগেন্দ্রনাথের। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৫০০ বাংলা, ৫০০ দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুঁথি এবং সংস্কৃত ও বাংলায় মিশ্রিত প্রায় ৫০০ কুলগ্রন্থের পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এ কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

এই সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল। এর বাইরেও দু-একটি বই থাকা সম্ভব।

এই তালিকা থেকে দেখা যাবে নগেন্দ্রনাথের জ্ঞানানুসন্ধান কত বিচিত্র পথে অভিযান করেছিল। অথচ তিনি স্কুলের শেষ শ্রেণী পর্যন্তও উঠতে পারেন নি। শুধু নিজের চেষ্টায় জ্ঞানচর্চা করেছেন এবং দেশবাসীকে তা বিতরণ করেছেন। নগেন্দ্রনাথ ইংরেজী হিন্দী ও সংস্কৃতে তো পারদর্শী ছিলেনই, তা ছাড়া কয়েকটি বিদেশী ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন। আত্মশিক্ষার এরূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর মেলে না।

নগেন্দ্রনাথ বসুর রচনাপঞ্জী

বাংলা

১ ধর্মবিজয় বা শংকরাচার্য। ১২৯৫।
বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে শংকরাচার্যের জীবনের কাহিনী নিয়ে রচিত নাটক।

২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ইংরেজী নাম : The Castes and Sects of Bengal)। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালে। ইতিহাস, কুলগ্রন্থ, শিলালিপি ও তাম্রশাসনের সাহায্যে লিখিত বিভিন্ন সমাজের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত, পরিচয়, স্থাননির্ণয়, বংশাবলী। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈশ্য— এই কয়টি জাতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪ খণ্ড বা ৬ অংশে বিভক্ত। এ ছাড়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের প্রামাণিক কুলগ্রন্থ মহাবংশও 'জাতীয় ইতিহাসে'র একটি খণ্ড। কায়স্থদের বিবরণ ৫ খণ্ড বা ৬ অংশে সম্পূর্ণ। বৈশ্যকাণ্ডের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশ মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

৩ কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়। ইং ১৯০১।
প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কায়স্থ জাতির বিবরণ। পরে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪ যশোর ইতিহাস-শাখার সভাপতি…সম্বোধন ; ১৯১৬।

অনুবাদ

কর্ণবীর, ১২৯২। ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ।

ইংরেজি

1 The Archaeological Survey of Mayurbhanja ; Vol. I. 1911
2 The Modern Buddhism and its Followers in Orissa, 1911
3 A Short History of the Indian Kayasthas. Written for the All India Kayastha Conference, Lahore ; 1915
4 The Social History of Kamrupa, 3v. 1922-33.

হিন্দী

১ ভারতীয় লিপিতত্ত্ব, ১৯১৪।

সম্পাদিত গ্রন্থ

বাংলা

১ বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত ; ২ খণ্ড ; ১৮৯৯।
২ পীতাম্বর দাস—রসমঞ্জরী, ১৩০৬।
৩ নরহরি চক্রবর্তী—ব্রজপরিক্রমা, ১৩১২।
৪ কবি জয়ানন্দ—শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল, ১৩১২।
৫ রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল—কাশী-পরিক্রমা, ১৩১৩।
৬ রামাই পণ্ডিত—শূন্যপুরাণ, ১৩১৪।
৭ নরহরি চক্রবর্তী—নবদ্বীপ পরিক্রমা (প্রথমাংশ), ১৩১৬।
৮ বিজয়রাম সেন—তীর্থমঙ্গল, ১৩২২।
৯ যদুনাথ সর্বাধিকারী—তীর্থ-ভ্রমণ (ভ্রমণের রোজনামচা), ১৩২২।
১০ বর্ধমানের ইতিকথা—প্রাচীন ও আধুনিক। অন্যান্য লেখক : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; রাখালরাজ রায় ; অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী। ১৯১৫

সংস্কৃত ও বিভিন্ন ভাষা

১ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণম্ ; মূল সংস্কৃত, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদিত। ১-২৩ ভাগ, ১২৯৮-১৩০৯। অসমাপ্ত।
২ কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব—সংগীতরাগকল্পদ্রুম। হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী সংগীতজ্ঞগণের সাহায্যে সম্পাদিত। ৩ খণ্ড, ১৯১৬

বিশ্বকোষ-বাংলা ও হিন্দী

১ বাংলা প্রথম সংস্করণ। দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠা থেকে বাইশ খণ্ড পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথের সম্পাদনা ; ১২৯৮-১৩১৮।

২ বাংলা দ্বিতীয় সংস্করণ ; ১-৪ খণ্ড, ১৩৪২-১৩৪৫। অসমাপ্ত।

৩ হিন্দী বিশ্বকোষ ; ২৫ খণ্ড, ১৩২০-১৩৩৮।

'হরিরাজ' নামক একটি নাটকের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল পাণ্ডুলিপি এক বন্ধু এত বদল করেছিলেন যে নগেন্দ্রনাথ প্রথম সংস্করণে নিজের নাম দেন নি। দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল যশস্বী অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নামে। 'নারীরত্ন', অভিনব সামাজিক উপন্যাস বা বঙ্গ-সমাজের আধুনিক চিত্র (১৩২৪) নগেন্দ্রনাথের রচনা বলে কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু প্রমাণ নেই। তাঁর সমসাময়িক আর একজন নগেন্দ্রনাথ বসুও লিখতেন, 'অদৃশ সহায়' তাঁর লেখা। 'নারীরত্ন' এই দ্বিতীয় নগেন্দ্রনাথের লেখাও হতে পারে।

সাম্প্রতিক রবীন্দ্রচর্চা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় সবচেয়ে যা অসুবিধাকর তা হল, কবি-শিল্পী হিসাবে যতখানি কীর্তিমান, মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তার চেয়ে এক তিলও কম উল্লেখযোগ্য নন। আর মানুষ-হিসেবেও তাঁকে সাধারণ মানুষপদবাচ্য ভাবা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। দুঃখ-হতাশা-অপূর্ণতায় দীর্ণ যে সাধারণ মানুষটি শুধুমাত্র গোপন স্বপ্নসঞ্চয়বশত শিল্পের গোষ্ঠে গিয়ে গোত্রবদ্ধ হয়ে পড়েন, সবাই জানেন, সেই ধরণের শিল্পকর্মার পাশে রবীন্দ্রনাথের নাম আমাদের মনে আসে না। আসলে, যতই তিনি তাঁর অনন্য কবি-পরিচয়ের জন্য উতলা হয়ে উঠুন-না কেন, তাঁর সম্বন্ধে ধারণা আমাদের আসে উল্টো ক্রম ধরে। আমরা আগে তাঁকে মানি অসাধারণ এক পুরুষ বলে, পরিশেষে সেই অসাধারণ পুরুষের অন্যতম কৃত্যের মতো তাঁর শিল্পরচনাকে সংলগ্ন করে দিই।

আমাদের এই ধারণা সদ্যোজাতও নয়। স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী তাঁর আমলে লিখেছিলেন, "আমি যখন কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হই পরিচিত তখনই তাঁকে একজন লোকোত্তর পুরুষ বলে চিনতে পারি।" তার পর উত্তরোত্তর এই বিশ্বাসে আমরা বদ্ধমূল হয়েছি। সমাজতাত্ত্বিক বলতে পারেন, এতে আমাদের জাতীয়-জীবনে কতখানি আশা বা আস্তিকতা ফিরেছে, কিন্তু শিল্পতাত্ত্বিক ও শিল্পার্থপ্রার্থীর কাছে এটি একটি নতুন সমস্যার মতো দাঁড়িয়ে। সেই কবে থেকে আজও পর্যন্ত যে কোনো রবীন্দ্র-রচনা মানেই জনৈক লোকোত্তর বিশ্বমানবের ব্যক্তিপরিচয় লিখে দেওয়া, 'রবীন্দ্ররচনাপরিচয়' যার শিরোনাম সেই লেখাও মূলত রবীন্দ্রজীবনপরিচয়ের বেশি নয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রজীবনী এখনো আমাদের কাছে দৈব-অধিকার তত্ত্বের অস্খলিত প্রকটন, আর রবীন্দ্ররচনা সেই দৈবপ্রতিভা-সৃজিত অকম্প্র বাণীবন্ধ— আর্যোক্তির মতো অনপনেয়— কেবলমাত্র নির্বিকল্প স্তবেই যার যোগ্য পরিচয় লেখা চলে। শতবর্ষ পূর্ণ করে আরো এই যে ক-বছর পেরিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ, যখন সত্যি সত্যিই পুরোনো অবস্থা পুরোনো বিশ্বাস পুরোনো প্রত্যয়ের পৃথিবী কোথাও আর টিঁকে নেই, তখনো নিজের সম্বন্ধে আমাদের সামান্যই বিচলিত করতে পেরে, মনে হয়, অচল কারেন্সি নোটের মতো আমাদের তিনি সেই পুরোনো বিচার-বিবেচনাতেও যেন দাঁড় করিয়ে রাখতে চান; এই যে একগুচ্ছ নতুন-প্রকাশিত রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থাবলী আমাদের হাতে এসেছে যার প্রায় সবগুলিরই প্রণেতা সুপরিচিত বিচক্ষণ আলোচয়িতারা, যার মধ্যে এক-আধখানি নতুন গবেষণাও রয়েছে, আর যার অধিকাংশ পৃষ্ঠাই ক্লান্তিহীনভাবে সুলিখিত, সেই লেখারও সম্বন্ধে আমাদের প্রাথমিক কৌতূহল গিয়ে দাঁড়ায় ঐখানে। নিজেদের বৈষয়িকভাবে সচ্ছলতর মেনে ওঠার আগেই এইসব বিবরণ থেকে আমাদের জানবার আগ্রহ হয়, বিষয়ে বা বিবেচনায় এখানে পূর্বানুবৃত্তি কতদূর? বা, মুহূর্তবর্তিতা কতখানি?

তার সবচেয়ে অনিবারণীয় হেতু আমরা গোড়াতেই বলেছি: বিষয় হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ অসুবিধাকর। বোধহয় সেই কারণে এই সবগুলি বইয়ের প্রস্তাবনাতে গিয়েই একটু ঠেকে যেতে হয়। যেমন, প্রথম বইখানির গোড়াতেই মিলছে: 'এই অসাধারণ মানুষের— নূতন দেবতার— মধ্যে কনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতম হলেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' যেমন, কাজী আবদুল ওদুদ উপক্রমেই বলে নিয়েছেন; 'মহৎ ও বিরাট রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে আমরাও জিজ্ঞাসু হয়েছি পরম বিনয়ে ও শ্রদ্ধায়।' রবীন্দ্রদর্শনের বিশ্লেষক লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের অন্তহীন কাব্যসায়রে বার বার অবগাহন ক'রে মনের গভীরে যে প্রশান্তি নামে, যে অনাবিল আনন্দ ধারায় সমগ্র মানবীয় সত্তা পরিস্নাত হয়, তার তুলনা মানুষের অভিজ্ঞতায় বড় একটা মেলে না।' পৃ ৮৪। আর রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের আলোচয়িতা জানিয়েছেন: 'যে ভাবে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ব্যক্তিত্বের অর্থকে বিস্তৃততর করেছেন, সমস্ত চিন্তাপ্রমাদ কুসংস্কার ও ভুলমাত্রার আরোপ থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন অংশগুলিকে সৌষম্যে মিলিত করেছেন তা একটা অলৌকিক কীর্তির মতোই আশ্চর্য।' পৃ ৮। অথবা, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যাঁর আলোচ্য, তাঁরও সূত্রপাত: 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর অসাধারণ বৈচিত্র্য আমাদের বিস্ময়-বিমূঢ় করে।'

আমরা সমস্ত বইয়ের মধ্যে থেকেই এরকম সশ্রদ্ধ দৃষ্টান্ত তুলতে পারি। মনে রাখা দরকার, এতে বইয়ের পরিচয় বলা হয় না, বইয়ের ভালো বা মন্দ বোঝানোও হয় না। তা সত্ত্বেও, এই কথায় যদি ভুল-বোঝার ফাঁক তৈরি হয়ে থাকে তাহলে এই সুযোগেই বলে নেওয়া ভালো, শ্রদ্ধা-বস্তুটিকে আমরা কোনোমতেই অশ্রদ্ধা করি না, অনাধুনিকও বিবেচনা করি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধতম পাঠক বোধ করি স্বীকার করবেন, তাঁর সাফল্যের মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত ঐ বস্তুটি যে পরিমাণে ও যে ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে আমরা ঈষৎ ক্লান্ত হয়েছি। শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধায় তাঁর কীর্তিও হয়তো অনেকখানিই ঢাকা পড়ে আছে, এমন চিন্তা অন্তত প্রতিক্রিয়াতেও আসে। অবশ্য যে বইগুলির কথা আমরা বলতে বসেছি তার সবগুলির আভ্যন্তরীণ প্রেরণা এভাবে আভাসিত করতে যাওয়াও বিপজ্জনক। কিন্তু প্রায় সবগুলি বইয়েরই শেষ পংক্তিতে পৌঁছোবার আগেই আরো কয়েকটি সামান্য লক্ষণ আমাদের কাছে ফুটে ওঠে। একটু শিথিল বিচারে দেখা যায়, এইসব বইই হয় সেই জীবনীর উপকরণে লেখা শিল্পালোচনা, সবগুলিতেই জীবন-নেপথ্যের বা রচনান্তরালের দার্শনিক-ধর্মীয় প্রণোদনা নির্ণয় করা— যেমন আমরা অনেকদিন ধরে জেনে আসছি; প্রায় কোনো জায়গাতেই তাঁর রচনা ভাষার সমস্যা বা প্রকরণের সমস্যা হিসেবে উপস্থাপিত নয়— যেন তাঁর লেখা একমাত্র বিষয়গৌরবেই মহীয়ান; আর সেই সমস্ত বক্তব্যই এত superlatively বিবৃত যে তার ভিতরকার তথ্যাংশকেও যেন সে ছাপিয়ে থাকে।

ভাষার সমস্যা বা প্রকরণের সমস্যা বলতে আমরা চূড়ান্ত নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনার কথা বলছি না— যা কোনোরকম বিষয়বস্তুকেই আমল দিতে চায় না, যা সব ধারার বিষয়বস্তুকেই বলে রচনার থেকে আলাদা ও সমান্তরাল— পাশাপাশি কিন্তু এক নয়, কখনো এক হবারও নয়। নিছক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার কথাও বলছি না— যা শুধু শব্দসহযোগের আত্মীয়সম্বন্ধের ফলাফল কষতে যত্নবান। এর থেকে অনেক প্রত্যক্ষ জিজ্ঞাসা আমরা জানতে চাই: তাঁর লেখা কী ভাবে কী উপায়ে তৈরি, তাঁর লেখার উৎকর্ষ ঠিক কোন্ জায়গাতে, বাঙলা শব্দের কী পরিমাণ অর্থপ্রসার অর্থসঙ্কোচ তিনি ঘটিয়ে গেছেন, পূর্বকালের কোন্ কোন্ কাব্যকৌশল আর কাব্যবিষয়কে তিনি সমকালে বহমান রাখতে চেয়েছেন, কোন্ কোন্ রচনাগত সুবিধা-অসুবিধা রেখে গেছেন তিনি উত্তরসূরির জন্য— আমাদের এখনকার সমালোচকদের কাছ থেকে এইগুলিই যেন বেশি করে আমাদের চাইবার আছে। এমনকি বিষয়কে—বিষয়গত আলোচনাকেও— হেলা করবার মতো সচ্ছলতা বোধহয় আমাদের নেই। এতদিন গেল আজও পর্যন্ত

রবীন্দ্রনাথের একটি পুরো ভেরিওরাম সংস্করণ আমাদের হাতে নেই, এতদিনেও প্রধান রবীন্দ্রপংক্তিগুলির সব বৈষয়িক নির্দেশ আমরা একত্র করে উঠতে পারিনি, যে সব জায়গায় তাঁর লেখা মুহূর্ত ও শাশ্বতের দ্বন্দ্বে বিচলিত, সেই দ্বন্দ্বের ফাট থেকে রশ্মিরেখার মতো যে চরিত্র উদ্ভিন্ন হয়ে আসে, অসংখ্য অপরূপ নয়নাভিরাম স্টুডিও-ফোটো-র নির্বন্ধ এড়িয়ে সেই রবীন্দ্রজীবনপরিচয় বোধহয় এখনো আমাদের লেখার সময় হয় নি।

এই সমস্তই আমরা প্রত্যাশা করতে চাই, এমনকি যাচ্ঞা করতে চাই। তার বদলে যা পাওয়া যায় তা আমাদের বারংবার মনে হয় সমালোচকের স্বার্থসাধনপ্রযত্ন, অনেক জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথকে ঐ ভাবের ভাষ্যে অনূদিত হয়ে যেতে দেখে আমাদের অস্বস্তি লাগে।

কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও বলে নিতে হয়, এই অস্বস্তি শুধু আমাদের কাছেই সত্য যারা গৃহীত সত্যের নিপুণতর কিংবা নিপুণতম বর্ণনাতেও অবিশ্বাসী, যারা সবসময়ে কেবল প্রসঙ্গাতীতের প্রত্যাশী আর অনুপস্থিতের প্রার্থী, যারা নতুন লেখা রবীন্দ্রপরিচয় পুস্তকে রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র এই মুহূর্তেরও বিশ্রব্ধ বন্ধুর মতো প্রমাণিত চাই। আরো স্পষ্ট করে বলে নেওয়া দরকার, এই অভাববর্ণনা আলোচ্য বইগুলির সঙ্গে একেবারেই নিঃসম্পর্ক। এ শুধু আমাদের ব্যক্তিগত অভাববোধ, আলোচনার আগেই একে লিখে রাখা গেল। কিন্তু আবেগার্ত মন্তব্য লেখার চাইতে যা উপস্থিত তারই মধ্যে সরাসরি বইগুলির মধ্যে একে একে মনোযোগ স্থাপন করা ভালো।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের বইটি থেকে এর আগে আমরা একটি বাক্য উদ্ধার করেছি, ঐ কথাটিতে যত আছে এই বইয়ের নামে বা দৃষ্টিভঙ্গিতে তার চেয়ে কম প্রথাশ্রয় নেই। অন্ত্য-উনবিংশ শতাব্দীতে যখন আমাদের দেশে জীবনী ও কবি-জীবনী লেখা হচ্ছিল, তখন জনৈক কবি-জীবনী-রচয়িতাকে এই কথা বলতে দেখা গিয়েছিল :

> যে সকল অনুকূল এবং প্রতিকূল ঘটনায় মধুসূদনের জীবন সংগঠিত হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যের যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে শিক্ষা এবং সংসর্গগুণে তাঁর প্রকৃতিদত্ত বৃত্তিসমূহ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা যথাসাধ্য বর্ণন করিয়া, আমি তাঁহার জীবনের বিকাশ, পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার প্রয়াস পাইয়াছি।[১]

আর এখানে লেখক তাঁর যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন :

> তাঁর মানসিকতা ও চারিত্র্য সংসারের ও সমাজের পরিবেশে আর বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের রঙে-বেরঙে ও আকর্ষণে-বিকর্ষণে কিভাবে গড়ে উঠেছিল তারই এখানে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।—

—তাতে এই বইখানির পৃথগত্ব বা নতুনত্ব যেটুকু সূচিত হয়, তা শুধু ঐ 'বিশ্লেষণ' শব্দটিতে। এবং 'বিশ্লেষণ' বস্তুটি, সকলেই জানেন, এই মুহূর্তেরও সংযোজন বটে।

অবশ্য বিষয় হিসেবেও চরিত্র দু-টি আলাদা রকমের আলোচনাপদ্ধতির দাবি করে। মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব যতখানি রোমাঞ্চকর, ততখানিই স্বভাবানুমোদিত ও সরল 'বর্ণন'ই তার পক্ষে যথেষ্ট। তার তুলনায় 'রবীন্দ্র' শব্দটি অপরিসীম জটিল, তা আমাদের জন্যে ব্যক্তি-পরিচয়ের থেকে সহস্রগুণ বেশি অর্থ

---

১ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, প্রথম সংস্করণ ১৮৯৩

বহন করে আনে। 'রবীন্দ্র'-নামধেয় চরিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো অনন্যসাধারণ ব্যক্তির বহুযত্নে সংরচিত সেই অভীষ্টদানকারী চরিত্র, যথোচিত বিশ্লেষণ ব্যতীত যা হৃদয়ঙ্গত হওয়া সহজ নয়।

তা যে সত্যিই সহজ নয়, সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বোধকরি বুঝেছিলেন— পঞ্চাশোর্ধ্বে পৌছেই, সদ্যোবিকশিত রবীন্দ্রের বিকাশের পিছনকার প্রণোদনাগুলি তিনি রেখে-ঢেকে রূপকথার ভাষায় এবং অভিমান প্রকাশ না করে যতদূর বলা যায় নিজেই জীবনস্মৃতির পাতায় গুছিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা বিশেষ করে 'জীবনস্মৃতি'রই নাম করলাম তার কারণ কেবল এ নয় যে 'জীবনস্মৃতি'ই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র ঘটনা-তথ্য-নির্ভর সুসংবদ্ধ ও ধারাবাহিক আত্মজীবনী, তার আরো কারণ শ্রীসুকুমার সেনের এই বই, বুঝতে দেরি হয় না, আসলে তথ্যমাত্রসার সেই 'জীবনস্মৃতি'র মর্মপ্রকাশী ভাষ্য ; একান্ন বছরের চোখ দিয়ে পঁচিশ বছরের যে রবীন্দ্রবিকাশ তত্রত্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, উপযুক্ত পার্‌স্‌পেক্‌টিভে এনে অর্থাৎ শতাধিক বছরের ব্যাপ্ত বিবেচনার সামনে তাকে হাজির করে, এই বই তার অন্তর্জগতের সেই কার্যকারণগুলিকে বিশদতর করে তুলেছে।

আলোচনাক্রমেও এখানে মোটামুটিভাবে জীবনস্মৃতিরই ধারাবাহিকতা অনুসৃত হয়েছে, দেখা যায়। শুরু হয়েছে সেই একই জায়গায়— একেবারে গোড়া থেকে—যেমন 'জীবনস্মৃতি'র সূচনা : বৃহৎ পরিবারে মাতৃসদন থেকে ভৃত্যমহলে নির্বাসিত শিশুর দিনযাত্রা থেকে। কিন্তু যেহেতু এবারে আরম্ভেরও আগে থেকে পরিণাম-মুহূর্ত আমাদের জানা, যেহেতু এবারে প্রত্যেকটি ঘটনা শুধু এক-একটি আগে-জানা চরিত্ররেখাকে বিশ্লেষণ করে দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত, তাই 'সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে'— এই আভাসের অতিরিক্ত পরিচয় দেওয়ার তাগিদেই তাকে 'কড়ি ও কোমল'এর রবীন্দ্রনির্দেশিত বিকাশ-মুহূর্তকে অন্তত তিনবার অতিক্রম করতে হয়েছে।[১] প্রথমবার তাঁর সঙ্গে গঙ্গার অন্ত্য পর্যায়ের সম্পর্ক বোঝাতে, যে গঙ্গা তাঁর রচনায় সরাসরি উঠে আসেনি, এসেছে পরোক্ষ চিত্রকল্পের বাস পরে। আর পদ্মা-ভূমির সূত্র তুলে নিতে, অন্তত আন্দী বোষ্টমী নাম্নী চরিত্রটির জন্য, যাকে না দেখলে 'মনে হয়, আমরা চতুরঙ্গ পেতুম না'। পৃ ৫১। উল্লেখযোগ্য, যে পদ্মাবাসকে তাঁর মানবলীলাকুতূহলী গল্প-উপন্যাসের উৎস বলে মেনে নেওয়া প্রথা, সেই উৎস শ্রীসুকুমার সেন নির্ধারণ করেছেন গঙ্গাভ্রমণে : 'যে দৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন <u>সে দৃষ্টি উন্মোচিত হয়েছিল গঙ্গাভ্রমণে,</u> আর সে দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল পদ্মাবাসে।' পৃ ৪৬

দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় বার অতিক্রম করতে হয়েছে মূলত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের বিলাতযাত্রা ও তার অনিবার্য পূর্বাপর বর্ণনা করার জন্য। দ্বিতীয় বারের বিলাত তাঁকে আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ, আমাদের রাষ্ট্রীয় অবস্থা, ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন-আদি বিষয়ে অবহিত করেছিল, আর দিয়েছিল সঙ্কোচমুক্ত সমালোচনা-দৃষ্টি। দ্বিতীয় বার বিলাত থেকে ফিরে পেলেন পদ্মাভূমির নবসঙ্গরসায়ন, তারপর শুরু হলো জাতীয় আন্দোলনের পৌত্তলিকতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসিক-পর্ব। সেখানে 'নবীনের সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথ যৌবনদীপ্তি ফিরে পেলেন, তাঁর মনের ব্যাটারি যেন নতুন চার্জ গ্রহণ করলে।' পৃ ৯২

---

১ কড়ি ও কোমল, জীবনস্মৃতি

আর তৃতীয় বার বিলাতযাত্রার ফলে প্রথমত 'জগৎসভায় কবিমনীষীর গ্যালারিতে তিনি ভারতবর্ষের আসনখানি চিহ্নিত করে রেখে এলেন' পৃ ৯৪। আর দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাঁর পরিণাম-সিদ্ধান্ত, যা কিনা, লেখকের মতে, আত্মহিতে ও জগৎহিতে আধুনিকতম চিন্তা, তা প্রকাশিত হলো। রবীন্দ্রচরিত্রে সাহিত্যিকের পাশাপাশি যে অ-সাহিত্যিক কর্মী-উপাদান রয়েছে, 'জীবনস্মৃতি'তে তার জন্য অপূর্ণ দু-টি আভাসক মিলেছিল— 'স্বাদেশিকতা' আর 'জাহাজের খোল'। এই বই পড়ার পর সেখানকার অপূর্ণতা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া আর সর্বত্রই মোটামুটিভাবে 'জীবনস্মৃতি'রই ধারানুক্রম।

সমস্ত আলোচনাটি বিবৃত হয়েছে পরিজন ও পরিবেশ— এই দুই পর্যায়ে। শৈশবপরিজনদের মধ্যে এসেছেন তাঁর আত্মীয়, শিক্ষক ও পরিচিত পণ্ডিতবর্গ, পরিশেষ-ভাষণে কয়েকজন তাঁর অনুরাগী সাহিত্যিক পরিজনের কথাও আছে। পরিবেশও তেমনি প্রকৃতি-পরিবেশ ও সাহিত্য-পরিবেশ— এই দু-ভাগে ভাগ করা। প্রকৃতি-পরিবেশে গঙ্গা, গঙ্গাবিহীন বাঙলাদেশ ও পদ্মাভূমির প্রভাব নির্ণয় করা হয়েছে। সাহিত্য-পরিবেশে ক্রমান্বয়ে এসেছেন ভারতী-পদ্মবনের আসল বীণাপাণি থেকে শুরু করে তাঁর বিরোধীপক্ষেরা পর্যন্ত, এবং সারা বাঙলাদেশের সস্নেহ প্রশ্রয় থেকে শুরু করে অনুকম্পাহীন নিন্দাবাদ অবধি।

শ্রীসুকুমার সেনের এই বইয়ে নিঃসঙ্গ লাজুক অন্তর্মুখিন এক প্রতিভার আলেখ্য ফুটে উঠেছে, যিনি লোকদায়িত্বকে অস্বীকার করেন নি, আর জগৎ-কবিসভায় ভারতের আসন যিনি সম্মানিত করে এসেছেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণাবয়ব আলেখ্যের চাইতে এখানে বড় স্থান অধিকার করেছে ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি, সূত্রাকারে ও নিয়মবদ্ধভাবে সেগুলি এই বইয়ে স্থাপিত হয়েছে। আর সেই কারণেই এই বই রবীন্দ্র-জীবনী নয়, রবীন্দ্রবিকাশের বিশ্লেষণ।

আমরা গোড়ায় লেখা 'প্রথাশ্রয়' কথাটিকেও ভালো বা মন্দর মতো চূড়ান্ত বিশেষণ বলে বোঝাতে চাই নি, তারও কারণ এই বইয়ের অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণপদ্ধতি। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে জানেন এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তাঁদেরও রবীন্দ্রবোধকে আরো শাণিত করে তুলতে পারে বলে আমাদের ধারণা হয়েছে। আর তাঁর আলোচনার গদ্য, যে গদ্যভাষার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমি অনুরক্ত, এই ক্ষুদ্র পুস্তকেও তা ভয়ানক প্রাণবন্তভাবে উপস্থিত।

কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' পূর্ণাবয়ব রবীন্দ্রজীবনী, এখানে শুধু জীবনের মুখ্য ঘটনাগুলি ও রবীন্দ্র-ভাবনায় তার অবদান, কবির জীবন ও রচনা দু-য়ের পাশাপাশি পরিচয় লিখে কবির অন্তর্জগতের পরিচয় লেখার প্রয়াস আছে— এই খণ্ড কবির চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত। লেখক রবীন্দ্রবিকাশে 'প্রভাব' শব্দটি বর্জন করতে চেয়েছেন 'স্বভাবদত্ত প্রতিভা'র বিনিময়ে, কিন্তু স্বভাব-এর প্রেরণা যেসব তথ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন, চিনতে বাধা হয় না, তা পূর্ব-আলোচিত বইয়ের 'প্রকৃতি-পরিবেশ' ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু এই বইয়ের বক্তব্য কেবলমাত্র ধারাবাহিকতা ভাবলে ভুল হবে। এই বইয়ের আলোচনাবিন্দু প্রকৃত প্রস্তাবে অন্য দুটি সূত্র থেকে উৎসারিত। প্রথম : লেখক এর আগে— বেশ কিছুদিন আগে, 'কবিগুরু

গ্যেটে' নাম দিয়ে দুখণ্ডে সমাপ্ত এক গ্যোতে-জীবনী লিখেছিলেন। সেখানে, ১৩৫১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, তাঁর মন্তব্য এইরকম :

> বহুদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন গ্যেটের জীবনের সমৃদ্ধি আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে যোগ তা এত গভীর যে তাকে আত্মিক যোগ বলা যেতে পারে।

এই বইয়েরও শুরুতেই তিনি বলে নিয়েছেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেও তুল্য চেষ্টা [আগের জীবনীখানিরই মতো] আমরা করবো।' ঐ তুল্যতা, দেখা যায়, এখানে শুধু জীবনীরচনা-পদ্ধতির তুল্যতা হয়ে দাঁড়ায় নি, দুই কবির চরিত্রগত তুলনারও পরিসর করে দিয়েছে। একটু নজর দিলেই আরো চোখে পড়ে— 'রবীন্দ্রপ্রতিভা যথাযথ তুলনীয় মহাকবি গ্যেটের প্রতিভার সঙ্গেই'— ২৮৮ পৃষ্ঠার এই প্রতিপাদ্যেই যেন সমস্ত আলোচনাটি আলগ্ন। প্রথমবার বিলাত যাবার পূর্বাহ্ণে আমেদাবাদে গ্যোতের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় থেকে শুরু করে 'নৈবেদ্য' সমাপ্তি পর্যন্ত সারা বইয়ে অনূ্যন একত্রিশবার গ্যোতেকে হাজির করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মর্ম বোঝাতে, এবং তা শুধু কবিত্ব ও মনীষার ব্যাপক ও যুগ্ম-দায়িত্বের হেতুনির্ণয়ের কারণে নয়। তিনি ইতস্তত শেলি-কীট্স্-টেনিসন-ব্রাউনিঙ্-হাফিজ-ওমর খৈয়াম ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে, কিন্তু আগাগোড়া রবীন্দ্রকৃত্যের পাশে এই একটি বিশ্ববিশ্রুত সমান্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে টেনে রেখে মনে হয় তাঁর আলোচ্য কবির জন্য আরো উজ্জ্বলতর এক পরিণাম নির্ণয় করে দিতে চেয়েছেন।

এবারে এই আলোচনার দ্বিতীয় বক্তব্যবিন্দুর কথা বলা যেতে পারে। এটি মূলত দৃষ্টিভঙ্গির কথা। লেখক বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনা একাধারে মহৎ ও মনোহর। মহত্ত্ব ভাবনার, মনোহারিত্ব প্রকাশের। রবীন্দ্রনাথ মহৎ প্রতিভাসম্পন্ন কবি, এবং মহৎ সাহিত্যের রচয়িতা। প্রকাশের মনোহারিত্ব পড়ে শিল্পনৈপুণ্যের কোঠায়। এবং আরো স্পষ্টত : 'আমাদের প্রধান বিষয় কবির মানস, কবির জীবন ও জগৎ-চেতনার পরিচয়, কবির শিল্পনৈপুণ্য তার আনুষঙ্গিক— তার বেশি নয়।' পৃ ১১০

ভূমিকাতেও, আমরা দেখেছি, লেখক এই কথাটিই প্রস্তাবিত করেছিলেন : 'আশা করি [কবির রচনার] সেই মনোহারিত্বের মায়া এতখানি হবে না যে তাতে আবৃত হবে কবির ব্যক্তিত্ব বা অন্তর্জীবন— যাতে কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয়।' এবং অতঃপর আরো লিখেছেন : 'দেহমনের স্বাস্থ্যেরই সত্যকার মূল্য, প্রসাধনের মূল্য সে তুলনায় অনেক কম। শিল্পনৈপুণ্যকে কিছুটা স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে গিয়ে আমাদের রবীন্দ্রোত্তর অনেক কবি বিড়ম্বিতই হয়েছেন বেশি, সেই ব্যাপারটিও মনে রাখবার মতো।' পৃ ১১০

কিন্তু আমরা এই সুপরিচিত দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনায় এতখানি উদ্ধৃতি লিখতাম না, একে ওই বইয়ের দ্বিতীয় বক্তব্যবিন্দু বলেও প্রাধান্য দিতে উৎসাহিত হতাম না, যদি না এর ভিতরে আরো উল্লেখযোগ্য প্রবণতা লুকানো থাকতো। আমরা আগেই এই দ্বিতীয় সূত্রটি নিষ্পাদিত করে নিতে চাই।

আমরা দেখেছি লেখকের প্রবল প্রস্তাবনা, তিনি বিষয়গৌরবেই রবীন্দ্ররচনার মূল্য নির্ধারণ করতে চান, প্রকাশসামর্থ্যে নয়। তথাপি দেখা গেছে, কবির প্রথম দিককার রচনা ও পরবর্তী কোনো কোনো কবিতা সম্বন্ধে তিনি তাঁর কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন রচনাশক্তির ঊনত্ববশত, অবিকশিত মহত্ত্বের কারণে নয়। অন্তত তিনটি আত্মখণ্ডনকারী স্বীকৃতি বইয়ের তিন বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে দিতে পারি :

১. সৃষ্টির কাজে প্রকাশেরই সত্যকার মর্যাদা, ইতিহাসের মর্যাদা সে তুলনায় অনেক কম,...

সাহিত্যে মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে প্রকাশ···সেই প্রকাশ যেখানে হয় নি, অর্থাৎ প্রকাশে যেখানে চমৎকারিত্ব দেখা দেয়নি, তার ঐতিহাসিক মূল্যের মায়া আমরা কাটাতে চেষ্টাই করবো। পৃ ২৮

২. রস-সাহিত্যে কোনো রচনার মর্যাদা লাভ হয় চিন্তার গুণে যতটা তার চাইতে বেশি রূপসৃষ্টির গুণে। পৃ ৭০

৩. শুধু ভাব নিয়ে কবিতা নয়, তার রূপটিও তার এক অতি বড় সম্পদ। পৃ ১৩৫

এই উদ্ধৃতির সংখ্যা একটু সন্ধান করলে হয়তো আরো বাড়ানো যায়, কিন্তু তার আর দরকার আছে বলে মনে হয় না। আমরা লেখকের চিত্তের শুধু দ্বিধাই দেখাতে চাই, দ্বৈত নির্ণয় করতে চাই না। বোধ করি এই দ্বিধাবশতই লেখক অনেকবার পরিহার্য ঐ প্রকরণেরই প্রসঙ্গ হাতে তুলে নিয়েছেন মানদণ্ড হিসাবে, এবং তারও চেয়ে বেশি পুনরাবৃত্তিসহ রবীন্দ্রজীবনে মনীষার অধিনায়কতার কথা স্মরণ করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে নিশ্চিন্ত হয়েছেন: 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা শিল্পীর রূপকর্ম মুখ্যত নয়, মুখ্যত তাঁর আত্মকথা।' পৃ ১৫৫

বোঝা যায় এই বইয়ে রবীন্দ্ররচনা মুখ্যত কেন রবীন্দ্র-আত্ম-রহস্য প্রকটনে নিয়োজিত হয়েছে। তাঁর আদর্শস্বরূপ গ্যোতে তাঁর নিজের সঙ্গে তাঁর কর্ম ও রচনার সম্পর্ক বোঝাতে ১৮২৪ সালের ১৬ ও ২৬ ডিসেম্বর তারিখে এসেনবেখ ও রেইনহার্টকে যে কেন্দ্রাভিগ পরিধি ও কেন্দ্রনিবদ্ধ কৃত্যের কথা লিখেছিলেন, হয়তো সেই সূত্রের নির্দেশও তাঁর স্মরণে থেকে থাকবে। আর যেহেতু এখানে কেন্দ্রের স্বরূপ পূর্বনির্ধারিত, তাই কালানুক্রমিক যে জীবনবিকাশ এই বইয়ে তিনি অনুসরণ করে এগিয়েছেন, আর একদিক থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছে তা মহত্ত্বের উন্মেষ ও বিকাশের ইতিহাস; এবং পূর্ব-উদ্ধৃত 'ঐতিহাসিক মূল্যের মায়া' সত্যিই তিনি কাটাতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের উপাদানগুলি সযত্নে তিনি বিচার করেছেন, এবং সেই কারণে যে প্রাসঙ্গিক কবিতাগুলি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করার কথা ভেবেছেন, তাদের অন্যতম— যদি প্রধানতম না হয়— কৃতিত্ব তারা স্মরণীয়। কিন্তু স্মরণীয়-কবিতার যে সংজ্ঞা তিনি তাঁর বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন তাঁর দিকে চেয়েই তা আমরা মানতে পারি নি, যেহেতু স্মরণীয়তার মধ্যে প্রাধান্য যে ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতারই, এ কথার প্রতিবাদ তাঁর লেখার কোনোখানে নেই।

উদাহরণত, তাঁর একটি-দুটি নিষ্পাদন দেখানো যেতে পারে। তিনি প্রথম যুগের তিনখানি কাব্যকে অবিস্মরণীয় আখ্যাত করেছেন, তার কারণ এরা 'বহন করেছে তাঁর অনন্যসাধারণ চিত্তের বিকাশের এক মহামূল্য পরিচয়'। 'মানসী'-কাব্যকে যে পরিণত বিবেচনা করেছেন তার কারণ 'মানসী' থেকে কবির 'মনীষীত্বে'র স্পষ্ট পরিচয় মিলেছে। 'সোনার তরী'র মূল্য: সমকালীন বাঙালিচিত্তের মায়াবাদ-প্রবণতাকে সে বহুজায়গায় খণ্ডন করেছে। আর 'নৈবেদ্যে' যে শুধু 'স্বাধীনতার মহাগীতা' রচিত হয়েছে, কিংবা তার আদর্শ যে শুধু চরিতার্থ হয়েছে পরবর্তী গান্ধী সাধনায়—তা-ই নয়, 'এক ওজস্বল আত্মা অমর সৃষ্টিমহিমা লাভ করেছে এই কাব্যে।'

অল্প কথায় বলা যায়, এই বইয়ে লেখক রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনকে ব্যাখ্যা করার জন্যই রচনার পরিচয় লিখেছেন, আর অপরদিকে প্রতিটি উপস্থাপিত রচনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আহরণ করে এনেছেন জীবনীগত উৎস। 'দুই দিন' কবিতার জন্য ইংলণ্ডের স্কট পরিবারের স্মৃতি, 'বিজয়িনী' ও 'উর্বশী' কবিতার জন্য লণ্ডনের লাইসীয়ম নাট্যশালার নগ্নিকাচিত্র— এইরকম উল্লেখযোগ্য দু-টি সন্ধানাহৃত

উদাহরণ। রচনা ও জীবনকে যুগপৎ আলোকিত করার জন্য তিনি ছিন্নপত্রাবলী ও অন্যান্য পত্রের সহযোগ সঙ্কলন করে দিয়েছেন। সর্বত্রও তিনি প্রভূত তথ্য আকর্ষণ করেছেন, এবং তাঁর এই বই পড়লে রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্ররচনার অনেকখানি স্বাদও যে পাওয়া যায় তাতে কোনো ভুল নেই।

লেখকের গ্যোতে-ব্যবহার বিষয়ে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। গ্যোতে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তিনি পুস্তক লিখেছেন, এবং গ্যোতের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ। কিন্তু গ্যোতের সঙ্গে তিনি যে তুলনা সজ্জিত করেছেন তা প্রায় সব জায়গাতেই খুব বাইরেকার সাদৃশ্য। কোনো অন্তরঙ্গ সমান্তর দেখানোর শ্রম যেন তিনি স্বীকার করেন নি। তিনি ইতস্তত যে বহুল পরিমাণ রবীন্দ্র-উদ্ধৃতির সাক্ষ্য তুলেছেন তাও অবশ্য অ-ব্যবহৃত, প্রায় কোনোখানেই তার অন্তরভিপ্রায় তিনি আমাদের বুঝিয়ে দেন নি। রবীন্দ্রনাথের একটি মৃত্যুশোক ও পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গ তিনি বিশদ করে যেখানে লিখেছেন তার পাশে গ্যোতের 'বাসনা ও প্রমত্ততা' (Selige Sehnsucht) নামক বহু-উদ্ধৃত কবিতার শেষ অনুচ্ছেদ থেকে 'মরো আর বেঁচে ওঠো' এই উপলব্ধিটি আমাদের মনে ভেসে উঠেছিল এবং এই উপলব্ধির বিশদতর সম্পর্ক তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়ার প্রত্যাশাও আমাদের ছিল। তিনি উল্লেখ করেন নি। রবীন্দ্র-নাথের আত্মসংরচনপ্রবণতার সঙ্গে গ্যোতের স্বভাবানুগমিতার যে লক্ষ্যণীয় বৈসাদৃশ্য, রবীন্দ্রনাথ ও গ্যোতে সম্পর্কে তা-ই আমাদের প্রথমে ও পরিশেষে মনে আসে। এ বিষয়েও লেখক উল্লেখমাত্র করেন নি। এবং দুই লেখকের সম্পর্কে আমাদের যথার্থ জরুরি যেসব জিজ্ঞাসা ছিল তার কোনোটিকেই লেখক জরুরি বিবেচনা না করার ফলে লেখক তাঁর প্রথম ও প্রধান প্রস্তাবনা-বিষয়ে অন্তত আমাদের বঞ্চিত করেছেন, এ কথা আমরা মনে না করে পারি নি।

একটি ঘটনানির্ভর অপরটি রচনানির্ভর জীবনান্তরালসন্ধানের মোটামুটি পরিচয় লেখা গেল। অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের বই ঠিক অতখানি অন্তর্জীবনী নয়, বরং তাঁর বইকে সহজভাবে 'রবীন্দ্রপরিচয়' বলে পরিচয় দিলেই যথার্থ হবে। রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও কবিত্বকে লেখক দুটি পৃথক পর্যায়ে আলাদা করে আলোচনা করেছেন, তাতে বিষয়ের জটিলতা যথাসম্ভব বাদ দেওয়া গেছে, এবং আলোচনা বা অনুধাবনের পক্ষে বিষয়টি স্বচ্ছন্দতরও হয়েছে। শেষকালে যে মন্তব্য করেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রধর্মী প্রবন্ধ সাহিত্য··· রবীন্দ্র-মন ও রবীন্দ্র-সাহিত্যজগতে প্রবেশের চাবিকাঠি', তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্যকে তৃতীয় একটি দিশারী পর্যায় হিসাবে নির্ভর করা গেছে, যার সাহায্যে যুগপৎ বিচিত্রের দূত ও আত্মপ্রকাশী কবিকে রবীন্দ্রনাথের স্বনির্দেশিতমতো বুঝে নেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনকে চেনাবার জন্য লেখক 'আত্মপরিচয়' বইখানিরও অপরিহার্যতা বিস্তারিত ভাবে নির্ণয় করেছেন।

এই বইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ অবশ্য এর পরিশিষ্ট। 'রবীন্দ্র-বিরোধ : রবীন্দ্র-বরণ'— এই নামাঙ্কিত রচনায় তিনি রবীন্দ্ররচনার সামাজিক মূল্য ধারাবাহিক কালানুক্রমে দেখিয়েছেন, এবং এই অংশটি বিশেষভাবে সুলিখিত। অন্যত্রও রবীন্দ্রালোচনার প্রত্যাশিত উপায়েই তিনি তাঁর পর্যালোচনা করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন যত্নসহকারে, লেখায় জায়গায়-জায়গায় একটু বেশি উচ্ছ্বাসপরায়ণ হয়ে পড়লেও সব জায়গাতেই নিরলসভাবে তথ্যগ্রাহী তাঁর লেখা। আধুনিকতম রবীন্দ্রালোচনার তথ্যগুলিও তিনি সমান নির্ভরতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

দু-একজায়গায় অবশ্য তাঁর রচনা একটু অসতর্ক। রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' বইটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, এই বইয়ের 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-জিজ্ঞাসা' নামকরণ করলে বোধহয় আরো সঙ্গত হত।' পৃ ৬৬। কিন্তু তা বোধহয় সঙ্গত হত না তার কারণ 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-জিজ্ঞাসা'র প্রণেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কোনো রবীন্দ্রবিদ্‌-এরই দাবি নিশ্চয় সমধিক। তিনি লিখেছেন: 'ধর্মদেশনার ক্ষেত্রেও যে তিনি মৌলিক চিন্তার অধিকারী এ খবর অনেকে রাখেন না।' কিন্তু তার পরেই তিনি নিজেই সেই মৌলিক চিন্তার বিরুদ্ধাচরণের যে দীর্ঘ সামাজিক ইতিবৃত্ত আহরণ করে দেখিয়েছেন (পৃ ৩৮-৪৬) তাতে দেখা গেছে ঐ খবর শুধু যে অনেকেরই জানা তা নয়, অনেকেরই অপছন্দও বটে। ১৬১ পৃষ্ঠায় 'বিশ্বভারতী' এই নামটির প্রসঙ্গে তিনি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালানির রবীন্দ্রজীবনী -বই থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করে লিখেছেন: 'শ্রীকৃপালানির (?) এ ব্যাখ্যার সঙ্গে বেদের 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌' বাণীটির যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।' শ্রীযুক্ত কৃপালানিও কিন্তু তাঁর বইয়ের ঠিক ঐ জায়গাতেই লিখেছিলেন: "The poet selected for its motto an ancient Sanskrit verse: Yatra visvam bhavati eka nidam—which means, 'where the whole world meets in one nest' !"[১]

এ-রকম অসাবধান রচনার পরিমাণ অল্প নয়, বলতে গেলে নিছক পৃষ্ঠা জুড়বে। কিন্তু বিশেষ করে আর-একটি জায়গার কথা অন্তত বলতে চাই যেখানে লিখেছেন: 'সৌভাগ্যক্রমে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির যে পারিবারিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন কেটেছিল সে পরিবেশ ছিল সঙ্কীর্ণ ধর্মসংস্কারমুক্ত। হিন্দুধর্মের প্রাচীন আচার-বিচার-বিমুক্ত মহর্ষি পরিবারে উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি ছিল বালকদের পক্ষে নিত্যকর্ম।' ঠাকুর পরিবারের সমস্ত বালকদের পক্ষে ওটি নিত্যকর্ম ছিল কিনা স্পষ্ট করে জানি না, কিন্তু ঠাকুর পরিবার প্রকৃতার্থে—লেখক যেভাবে বলতে চেয়েছেন সেইরকম একেবারে সঙ্কীর্ণ ধর্মসংস্কারমুক্ত বা প্রাচীন আচার-বিচার-বিমুক্ত ছিল, এ কথা মানবার ঈষৎ তথ্যগত বাধা রয়েছে। লেখক সম্ভবত জানেন, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'এর লেখক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে 'রক্ষণশীল প্রকৃতি' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। পৃ ২৫০। রাজনারায়ণ বসুও জানিয়েছেন, সোমেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন-যজ্ঞে তিনি শূদ্রবৎ পরিত্যাজ্য হয়েছেন ['আমি জানিতাম না যে শূদ্রে তথায় বসিতে পারিবে না। জানিলে, আমি তথায় বসিতাম না।'—আত্মচরিত, পৃ ১৯৯]। এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন: 'আমাদের পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহা গ্রহণ করি নাই।' এই কথাগুলি মনে থাকলে লেখকের ঐ উক্তি ঠিক সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া যায় না।

পারস্যরাজ রেজা শাহ পাহলেভীর সনির্বন্ধ আমন্ত্রণে ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ পারস্য-ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেই ভ্রমণের অন্যতম আয়োজক ও সঙ্গী ছিলেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ' মূলত শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়েরই ব্যক্তিগত ভ্রমণসমাচার, তার মধ্যে মাঝে মাঝে কয়েক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে—এইমাত্র। বরং

---

১ টেগোর: এ বায়োগ্রাফি, অক্‌স্‌ফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, পৃ ২৬৭

এই বইয়ের ভূমিকা-অংশে যাত্রা-পূর্বের কয়েকটি খুঁটিনাটি নেপথ্যসংবাদ দেওয়া আছে, সারা বইয়ে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে তার চাইতে উল্লেখযোগ্যে বা কৌতূহলকর অংশ আর নেই বললেই চলে।

রবীন্দ্রনাথের স্বলিখিত পারস্য-ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার আহ্বানও এখানে নেই। লেখক রবীন্দ্রনাথের এক সপ্তাহ পূর্বেই যাত্রা করেছিসেন এবং অসুস্থতাহেতু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের পরেও কিছুকাল ঐখানে দ্রষ্টব্য দেখে বেড়িয়েছেন। প্রতিটি দ্রষ্টব্যের জন্য গাইড-বুক-এর তথ্য এবং পরিশেষে ইরাণ ও ইরাকের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও লেখক সঙ্কলন করে দিয়েছেন। অথচ বিভিন্ন-স্থানের চলিত ও সাধুভাষার পীড়াকর সঙ্কর— যা কিনা আরেকবার চোখ বোলালেই হয়তো বাদ দেওয়া যেত, তার পরিশোধনে কোনো আগ্রহ দেখান নি। কিন্তু অত্যন্ত সুমুদ্রিত ও বহুচিত্রশোভিত এই বই ভ্রমণকাহিনী-পিপাসুদের নিঃসন্দেহে আকর্ষণ করবে।

ডক্টর সুধীরকুমার নন্দীর অন্বীক্ষণে কবি-মনীষী গৃহীত হয়েছেন কবি-দার্শনিক হিসাবে। লেখকের প্রাথমিক যুক্তি: 'কবিরা দার্শনিক নন, এ কথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও রবীন্দ্রমানস যে দার্শনিক-সত্তম্ এ তত্ত্ব অবিসংবাদিত সত্য। কাব্যে, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখেছি পরম দার্শনিকতায় তন্ময়। ভুরি ভুরি (?) তত্ত্বকথা উদ্গীত হয়েছে তাঁর অজস্র রচনায়।' পৃ ১৫৯। পুনরায় বলেছেন, 'তাঁর দর্শন দর্শনশাস্ত্রীদের অনুমোদিত কোন বিশেষ পারাবতনীড়ে অবরুদ্ধ নয়।' এবং সিদ্ধান্ত করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নানান দার্শনিক ভাবধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।'

জীবন-দর্শন, শিক্ষা-দর্শন, শিল্প-দর্শন— এইসব পর্যায়ে আলাদা করে লেখক রবীন্দ্রনাথের দর্শন-চিন্তার আলোচনা করেছেন। কবির মানবতাবাদ, যা কিনা তাঁর জীবন-দর্শনের অন্যতম সূত্র, আর যার প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও অভাব নেই, তা নিয়েও আলাদা করে আলোচনা করেছেন। স্বাভাবিক ভাবে কেন্দ্রে স্থাপিত হয়েছে জীবন-দর্শন, সে সম্বন্ধে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এক চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা', আর সেই বিশ্ববোধ থেকেই সঞ্জাত হয়েছে তাঁর বিশেষ অহংবোধ, 'আগে ভালোবেসেছেন পৃথিবীকে, জীবনকে ভালোবেসেছেন তার পরে' পৃ ৩৮; সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, মানবপ্রীতি আর তাঁর অপরাজেয় আশাবাদ,— এবং জীবনদর্শনের এই সামান্য লক্ষণগুলিকে স্পর্শ করে আছে সেই নিত্য ও সনাতন উপনিষদ: 'রবীন্দ্রনাথ সেই ঔপনিষদিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিলেন।'

যেহেতু রচনা বা শিল্পের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি আত্মপ্রকাশ করেছেন, এই বইয়ের অধিকাংশ পৃষ্ঠাই বোধ করি সেই কারণে শিল্প-দর্শনের আলোচনায় উৎসর্গিত। রবীন্দ্র-শিল্প-দর্শনের একটি তত্ত্বগত পরিচ্ছেদ ছাড়াও বলাকা মহুয়া বনবাণী পূরবী সোনারতরী ও ডাকঘর— এই বইগুলির থেকে লেখক সবিস্তারে রবীন্দ্র-শিল্পনীতির সূত্র আহরণ করেছেন। এই বইয়ের আলোচনাগুলি সেই কারণেই কবিতার বইয়ের প্রথামাফিক আলোচনা নয়, একমাত্র দার্শনিক বা নন্দনতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার উত্তরেই তারা উৎসাহী। যেমন: বলাকা গতিবাদের কাব্য, আর সেই গতিবাদ বের্গসঁ-র চেয়ে উপনিষদে অধিক নির্ভরশীল। প্রয়োজনবাদ ও শিল্পবোধ— নন্দনতত্ত্বের এই দুরূহতা-কণ্টকিত সমস্যার উত্তর হলো 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থ। 'বনবাণী'তে প্রকৃতি-দত্ত বৈরাগ্য সঞ্চারিত হয়েছে শিল্পীচিত্তে, যে বৈরাগ্য ছাড়া শিল্প হয় না (পৃ ১৪৮), এবং ঐ প্রকৃতি আবার কবির প্রাণতত্ত্বের মূলাধার। 'পূরবী'তে নন্দনতত্ত্বের সেই

অপ্রায়োজনিক লীলাভূমি। এবং 'সোনার তরী'তে কর্ম-কর্মী তত্ত্ব, মানসীতত্ত্ব, জীবন-মৃত্যু তত্ত্ব ইত্যাদি বহুবিধ তত্ত্ব। আর 'ডাকঘর'? 'ডাকঘর' এখানে আলোচিত হবার অধিকার পেয়েছে— অখণ্ড জীবনবিশ্বাস ও সাময়িক অনুভব— এই দুয়ের নন্দনতাত্ত্বিক দ্বন্দ্বটিকে প্রশ্রয়িত করে।

লেখক এই বইয়ের যে সব জায়গায় সাধারণভাবে রবীন্দ্র-দর্শন অন্বীক্ষণ করেছেন, সেই অংশগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে সরল, কোনো দিক থেকেই মনোযোগ দাবি করতে পারে না। যেখানে তাঁর আলোচনা শিল্পদর্শনাশ্রয়ী, সেখানে বরং তিনি নতুন ভাবে রবীন্দ্ররহস্যের উপরে আলোকপাত করতে চেয়েছেন। যথা, রবীন্দ্রচিত্তে তিনি কবি ও দার্শনিকের বিরোধ দেখিয়েছেন, বলেছেন: 'দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্বকথা আমাদের শুনিয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধী বার্তা আমাদের পরিবেশন করেছেন। তাই আমরা সাম্প্রতকালে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি এবং দার্শনিকের সমন্বয়তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারলাম না।' পৃ ৫৫। তার প্রথম কারণ যা দিয়েছেন:

> শিল্প হল আত্ম-অনুভূতিকে আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করা। সেখানে ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নটা অবান্তর, অতিরিক্ত। কাজে কাজেই কবি এবং দার্শনিকের মতবিরোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেলে

ইত্যাদি— তা অবশ্য আমরা তেমন বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। তার কারণ, আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করার অর্থ, আমরা যতদূর বুঝি, আত্ম-অনুভূতির সদৃশ তুল্যমূল্য একটি মূর্তি নির্মাণ: শব্দ, শিলা, রেখা বা স্বর যে কোনো মাধ্যমেই হোক; অর্থাৎ রূপায়িত বা রূপার্পিত আত্ম-অনুভূতি, এবং তার অর্থ কোনোক্রমেই আত্ম-বিচ্যুতি নয়। 'আত্ম' এখানে, বলা বাহুল্য, আত্মবোধ বা মৌল জীবনদর্শনের প্রতিশব্দ।

আত্ম-স্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করার ভাবটিকে আরো স্পষ্টার্থক করে তোলবার জন্য আরেকবার লেখক বলেছেন: 'শিল্পে কবির অনুভূতির নৈর্ব্যক্তিকরণ ঘটে।' এখানেও ব্যক্তিগত পরিস্থিতি থেকে কবির অনুভূতিটিকে বের করে এনে নৈর্ব্যক্তিকৃত (depersonalized) বা সাধারণ্যে স্থাপনের যে প্রসঙ্গ আছে তার মধ্যে ব্যক্তি-বৈপরীত্য নেই, বড় জোর সারা দুনিয়ার রসিকসমাজের জন্য সাদর আবাহন লেখা আছে।

এর পরের সাক্ষ্য লেখক মেনেছেন: রবীন্দ্রমানসের বহুবিচিত্র প্রকাশ'এর সূত্রটিকে, কিন্তু রবীন্দ্রমানসে বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে পরস্পর-বিরোধের সমস্ত সম্ভাবনা তিনি যে নিজেই আদৌ নিহত করেছেন, তার প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বেই লিখেছি, বরং পুনরুদ্ধৃত করছি: 'রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এক চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা।'

রচনা ও জীবনদর্শনের বিরোধ প্রমাণ করবার জন্য লেখক এর পরেও ঐ বৈচিত্র্যের হেতুটিকেই পুনরায় আরো আন্তরিকভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন এই বলে: 'কবি যে জীবনদর্শনে বিশ্বাসী, তার ধ্যান, তার ধারণা যে মূল আশ্রয়ী সেখান থেকেই আবশ্যিক ভাবে যে তার কাব্যের পত্রপুষ্পসমারোহে দিক আকীর্ণ হবে এমন কথাটা ন্যায়শাস্ত্রগ্রাহ্য নয়। যদি কবির জীবনবেদ থেকেই তার সৃষ্টির উৎসার ঘটত তবে সৃষ্টিবৈচিত্র্য থাকত না রবীন্দ্রনাথ, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, শেক্স্‌পীয়র এবং কালিদাসের অসংখ্য বর্ণবহুল সৃষ্টিতে।' পৃ ১৬৯।

লেখকের এই উক্তিকেও আপতিকভাবে ন্যায়শাস্ত্রগ্রাহ্য বলে মনে হওয়া কঠিন, যদিও এই উক্তির মধ্যে একখণ্ড নন্দনতাত্ত্বিক বিতর্কের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। কথাটি যদি হয় শুধুই বিচিত্রতা বা বহুলতা তাহলে

তার কেন্দ্রেকপ্রেরণার সত্য খণ্ডিত হয় না। আর কবি যদি তাঁর লেখায় তাঁর বিশ্বাসবিরোধী প্রবণতা বা আদর্শবিরোধী চরিত্রও আঁকেন তাহলেও কবির জীবনবেদ থেকেই যে সেই সৃষ্টিরও উৎসার ঘটে নি সে কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। আসলে নিজের বিশ্বাসের বিপরীত চিত্র বা চরিত্র এঁকে কবিরা নিজের অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তিই বোধ করি প্রমাণ করেন, কিংবা নিজের মূল চরিত্রকেই যাচাই করে নিতে চান। এ কথা— যিনি সবচাইতে বিচিত্র আর স্ব-বিরোধী প্রসঙ্গ লিখেছেন বলে জানি— সেই গ্যোতের লেখাতেও স্পষ্ট। গ্যোতের ভিলহেল্‌ম্‌ মাইসটার নক্ষত্রদীপিত দ্যুলোকে তাকিয়ে নিজেকে বুঝিয়েছিল, তারও ভিতরে একটি অনন্য বর্তিকা রয়েছে যেখানে তার বহুবিচিত্র সকল কর্মপুঞ্জের মূল উৎসাহ জ্বলে আছে। আর গ্যোতে নিজে তাঁর রচনাবলীর অন্তর্গত যোগসূত্র না খুঁজে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর রচনার পর্যালোচনা করার জন্য তাঁর রচনার একটি বিখ্যাত সমালোচনাকে নাকচ করতে চেয়েছিলেন সে কথা গ্যোতের জীবন যাঁরা জানেন তাঁদের অজানা নয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সূত্রে এতদূর যাবার দরকার আছে বলে মনে হয় না এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির অজস্রতা ও বিচিত্রতার মধ্যে রবীন্দ্র-বিপরীত চরিত্র মোটেই সুলভ নয়। শেক্‌সপীয়র-ইত্যাদি বিষয়নির্ভর লেখকের সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের যে মন্তব্য লেখক নিজেই উদ্ধৃত করেছেন, সেখানেও 'শিল্পে শিল্পীচরিত্র আপনাকে উদ্‌ঘাটিত করে'— এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথা নেই।

সুধীরবাবু সম্ভবত প্রথিতযশা একদল শিল্পালোচকের প্রভাবে বিষয়নির্ভর শিল্পের মহিমায় বিশ্বাসী। সেই কারণে মনে হয় তিনি 'রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প হ'ল প্রকাশ' (পৃ ৫৭) এ-কথা স্বীকার করেও, সেই প্রকাশকে আত্ম-প্রকাশের বিরোধী বা অতিরিক্ত লক্ষণ বলে বারংবার বোঝাতে চেয়েছেন, এবং রবীন্দ্রনাথের বহুল বিচিত্র রচনাকে আত্ম-অতিরেকী বহু ও বিচিত্র বিষয়ের রচনা বলে বারংবার প্রমাণ করতে চেয়েছেন।[১] আমাদের মনে আছে, কোলরিজ-এর মত ছিল, শ্রেষ্ঠ কবিতা ব্যক্তিগত পরিস্থিতি নিয়ে লেখা হয়ে ওঠে না, এবং বায়োগ্রাফিয়া লিটারারিয়া-য় তিনি শেক্‌সপীয়রের যে উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন তার কারণ দেখিয়েছিলেন শেক্‌সপীয়রের বিষয় নির্বাচন— যা লেখকের নিজস্ব প্রবণতা বা পরিস্থিতির থেকে বিচ্যুত আর দূরবর্তী। সুধীরবাবুর লেখায় এলিয়ট সাহেবের বহু-আলোচিত সেইসব মতামতগুলির প্রতিধ্বনিও অস্পষ্ট নয় : সেকরেড উড'এর ভূমিকায় তিনি যে বলেছিলেন, 'কবিতায় যে অনুভব আবেগ বা দর্শন প্রকাশ পায়, কবির মানসিকতার থেকে তা আলাদা ধরণের' ; রেমী দ্য গুর্মোঁর ধরণে তাঁর সেই প্রবাদপ্রতিম উক্তি, 'কবিতা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়, ব্যক্তিত্ব থেকে অপসরণ' ; অথবা আলম্বন বিভাবের উপরে তাঁর সেই অখণ্ড বিশ্বাস যাকে আমরা objective correlative বলে জানি— এই ধারণাগুলি সুধীরবাবুর লেখায় ইতস্তত সঞ্চরণ করে ফিরেছে। অবশ্য এই সঙ্গে এও মনে রাখা যায়— এঁরা যে বিষয়নির্ভরতার কথা বলেছেন তা মূলত রোমান্টিক খেয়ালীপনার প্রতিক্রিয়ায় জাত, এই ব্যক্তিত্ব-অসম্পৃক্ত কবিতা প্রাচীন কবিতার নৈর্ব্যক্তিকতাও নয়, এবং এলিয়ট সাহেব যাকে objective correlative বলেছেন তাও সর্বতোভাবেই ব্যক্তিমানসিকতার সঙ্গে সমান্তর-সূত্রে সম্পর্কবদ্ধ।

১ 'প্রকাশ' কথাটি লেখক ক্রোচে কলিঙউডের 'প্রকাশতত্ত্ব' থেকে গ্রহণ করেছেন। উভয়ত্রই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, প্রকাশ বলতে নিছক অনুভব বা পাঠক-চিত্তে কোনো অভিপ্রেত আবেগের উদ্রেক বোঝায় না— কোনো বিষয়ের বর্ণনাও বোঝায় না— প্রকাশ হলো শিল্পীচিত্তের প্রকাশ (the work of art is the expression of the artist who created it.— আর. জি কলিঙউড)।

সুধীরবাবু অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বহু বিষয় চিত্রণের জন্য শুধুমাত্র এই ব্যক্তিত্ব-বিচ্যুতি তত্ত্বের সহযোগিতা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ যে স্ব-বিরোধী ও বিচিত্র বিষয়ের রচনা লিখেছেন তা 'শিল্পীমানসের সর্বগ্রাসী সহমর্মিতাবোধ'এর অসাধ্য সাধন (পৃ ৬৬)। এই সর্বগ্রাসী সহমর্মিতাবোধ শব্দটি, চেনা যায়, মনস্তত্ত্বের পরিভাষা-কোষ থেকে নেওয়া, Einfühlung ঐ শব্দটি—যা বিশেষ করে শিল্পবেত্তারাই কাজে লাগিয়েছেন, ফ্রয়েড ওর অর্থ করেছেন : understanding of what is inherently foreign to our ego in other people, আর ঐ ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ বা বিশ্বপ্রীতির ধারণার সঙ্গেও বেশ মিলে যায় (পৃ ১৭৭ দ্রষ্টব্য)। অতএব সর্বানুরাগবশেই যে রবীন্দ্রনাথ আত্মবিরোধী ভাবনা ও মানুষকেও তাঁর লেখায় প্রশ্রয়িত করেছেন, এই সিদ্ধান্তে বাধা থাকে না।

এই সর্বানুরাগের পাশে 'সর্বসাধারণের জন্য রচনা'র দ্বিতীয় আরেক রবীন্দ্র-আকাঙ্ক্ষা লেখক উপস্থিত করেছেন, এবং তার জন্য উপস্থিত করেছেন 'সাধারণীকরণ' নামের আলঙ্কারিক শব্দটিকে। তার পরে বলেছেন : 'যদি শিল্পের উপজীব্য হয় মানুষের···মহত্তর চারিত্র্যধর্ম [যা কিনা রবীন্দ্রচরিত্রের সমার্থক] তাহলে তার সঙ্গে শিল্পের সাধারণীকরণ-তত্ত্বের সমন্বয় ঘটানো যায় না।' এই বাক্যের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য যাই হোক, এর ভেতরে লেখকের নির্দেশিত এই দ্যোতনা ঢাকা নেই যে যদি রবীন্দ্রনাথ সাধারণীকরণে আস্থা রেখে থাকেন তাহলে নিজের জীবনবেদ তাঁর রচনায় লেখেননি, অথবা এর উল্টো। আর লেখকের মতে, রচনায়— আর যাই হোক— রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনবেদ প্রকাশ করতে চান নি।

তাঁর রচনা তাঁর জীবনবেদ থেকে উৎসারিত হোক বা না হোক, 'সাধারণীকরণ' শব্দটিকে লেখক কিন্তু সঠিক অর্থে গ্রহণ করেন নি। আনন্দ কুমারস্বামী 'সাধারণীকরণ'এর ভাবটিকে Einfühlung এর সমার্থক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন,[১] তার মধ্যে শিল্পের নৈর্ব্যক্তিকরণও সাধিত হয়, সহৃদয়ের তন্ময়ীভবনও সূচিত হয়। কিন্তু সুধীরবাবু যে লিখেছেন, 'সর্বসাধারণের জন্য পরিবেশন করতে গেলে···মহাভাবকে (মহৎ ভাব ?) অনেকখানি সাধারণ করে ফেলতে হবে। এতে মহাভাবের হানি ঘটবে, তার মর্যাদার লাঘব হবে'—তাতে সাধারণীকরণের অর্থ দাঁড়ায় লেখাকে প্রাকৃতজন বা পৃথগ্‌জনের উপযোগী করে তোলা, যার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে শব্দটির কোনো সম্বন্ধই কল্পনা করা যায় না।

তা ছাড়া, সুধীরবাবু বোধ করি জানেন, কাব্য বা শিল্প— সাধারণের নয়— সর্বদাই সহৃদয়ের অপেক্ষায় থাকে, এবং সাধারণীকরণে যদি সাধারণ প্রাকৃত কারোকে সহৃদয়ের পদবী দেওয়াও হয়, তাহলেও সেই ব্যক্তিকে ভিতরে ভিতরে পরিশীলিত আর রসবেত্তা হয়ে উঠতে হয়। আর 'সাধারণীকরণ' ব্যাপারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধও নয়, সে পরবর্তী আর একটি পর্যায়ের সঙ্গে বদ্ধ, সে পরবর্তী আরেকটি পর্যায়ের সূচনা করে সঙ্গে সঙ্গেই যার নাম 'বাসনা' সহৃদয়ের চিত্তে সে প্রসুপ্ত বাসনার উদ্বোধ ঘটায় পরক্ষণেই। এই পরের পর্যায়টির কথা মনে থাকলে মহাভাবকে সাধারণ করে ফেলার কোনো প্রশ্নই সম্ভবত ওঠে না।

যাই হোক, 'মহাকবির জীবনক্রান্তি এবং সৃষ্টিক্রান্তি দুই ভিন্ন লক্ষ্যাভিমুখী' এ কথা প্রমাণ করবার জন্য এর পরেও লেখক আস্ত একখানি নাটক— 'ডাকঘর'—তুলে নিয়েছেন। 'ডাকঘর', তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের 'উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি' এবং 'ডাকঘর' 'কবির জীবন থেকে চ্যুত ও ভ্রষ্ট'। এখানে রবীন্দ্রোচিত আশাবাদ নেই,

১ দি ট্রান্সফরমেশন অফ নেচার ইন আর্ট, ডোভার কাগজ-বাঁধাই সংস্করণ, পৃ ৫২ ও পৃ ১৯৭-৯৮

মৃত্যুতে পরিণাম, আর 'এই মৃত্যুর জয়গানে জীবনের অস্বীকার ধ্বনিত হয়েছে'। এর কারণও আছে, দেখিয়েছেন : 'এটি অসুস্থ কবিমনের সৃষ্টি'। দুরারোগ্য অর্শ ব্যাধিতে কিছুদিন আগেই কবি ভুগছিলেন, আর 'অসুস্থ শিল্পীমন যে সৃষ্টি করলো হয়তো সুস্থ থাকলে তা সম্ভব হ'ত না।' পৃ ২০৭।

কিন্তু 'ডাকঘর'এর পরিণাম যে মৃত্যু এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই খণ্ডন করেছিলেন বলে মনে পড়ে। তিনি যা বলেছিলেন তা হলো : 'ডাকঘরের অমল মরেছে বলে সন্দেহ করে যারা তারা অবিশ্বাসী।' তা বাদে, মৃত্যুর ঘটনা থাকলেই যে তাতে 'জীবনের অস্বীকার ধ্বনিত' হয় তাও আমাদের মনে হয় না। 'ডাকঘর'কে অজিতকুমার চক্রবর্তী যে সুদূরপিয়াসী মানসিকতায় আপন্ন বলে চিহ্নিত করেছিলেন তা খারিজ করার মতোও কোনো কারণ ঘটেনি, এবং তা রবীন্দ্র-দর্শন অনুমোদিতও বটে। আর ব্যাধিগ্রস্ত লেখকের রচনা বলেই যদি একে জীবনবিরোধী বলে দেখানোর সুযোগ নেওয়া হয়, তাহলে আমাদের বক্তব্য, অসুস্থতা থেকে নিরানন্দ রচনা জাত হয় এটি স্বাভাবিক লক্ষণ নয়, বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়— জর্জরিত জীবনই সাধারণত আনন্দকর শিল্পে রূপায়িত হয়ে পড়ে।

এই বইয়ের অন্য উল্লেখযোগ্য অধ্যায় : 'রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প', কিন্তু রূপকল্প সম্পর্কেই লেখকের ধারণা যথেষ্ট স্বচ্ছ বলে এখানে আমাদের মনে হয় নি।

আমরা এই বইখানিকে অনেকখানি স্থান দিলাম, তার কারণ আর কিছু নয়, অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এতে প্রথাবিচ্যুত দু-একটি কথা শোনা গেছে। নন্দনতত্ত্বের জটিলতাগুলি প্রয়োগ করার মতো সচ্ছলতা তাঁর আছে কিনা এই সন্দেহ প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে বাচালতা, কিন্তু তাঁর রচনারীতি আরেকটু পরিচ্ছন্ন হলে তাঁর এই বক্তব্যগুলিই আরো আবেদনবহ হতো, আমাদের মনে হয়েছে। আর তাঁর রবীন্দ্রনাথ-পাঠের আন্তরিকতা সম্বন্ধেও তিনি যে আমাদের কখনো কখনো ঈষৎ দ্বিধান্বিত করেছেন, এ কথা না বলে উপায় নেই।

শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র সরকারের বইটি বিশেষ করে শিক্ষাদর্শন-বিষয়ক আলোচনা এবং ঐতিহাসিক আলোচনা, রবীন্দ্রনাথকে তিনি বিশ্ব-শিক্ষাচিন্তার পটভূমিকায় উপস্থাপন করেছেন। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই আখ্যাত হয়েছেন 'কবি-গুরুদেব' বলে। তারপর লেখক দেখিয়েছেন : 'শিক্ষাগুরু হতে গিয়ে তিনি তাঁর ঋষিকবির ভূমিকা থেকে অবসর গ্রহণ করেন নি। এই দুই ভূমিকাই তাঁর মধ্যে এক হয়ে গেছে।'

রবীন্দ্রজীবনে শিক্ষাচিন্তার স্থান নির্ণয়ের জন্য লেখক আরো স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথের নিজের সাক্ষ্য থেকে তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রধান যে তিনটি ক্ষেত্র : আত্মজীবন রূপায়ণ, সাহিত্য-সংগীত-শিল্পকলা, আর তৃতীয়ত শান্তিনিকেতন-সাধনার মধ্য দিয়ে লোকজীবনকে প্রভাবিত করা—তার উল্লেখ করেছেন, আর শেষকালে বলেছেন : 'তার মধ্যে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমশই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তৃতীয়টিকেই। অপর দুই ক্ষেত্রে যা তাঁর প্রাপ্তি তা তিনি অসংকোচে উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর ঐ শিক্ষাভিসারের পথ প্রশস্ত করবার জন্য।' তার প্রমাণ 'তাঁর সাধারণ দর্শন ও তাঁর শিক্ষাদর্শনের মধ্যে মূলনীতির কোনো পার্থক্য নেই।' শান্তিনিকেতনকে তিনি নাম দিয়েছিলেন একটি প্রত্যক্ষ কবিতা, একটি নৌকা যা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বহন করছে। তার আরো প্রমাণ, তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক রচনাগুলি—বিচ্যুতভাবে নয়— একমাত্র রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের বৃহত্তর ভূমিকায় তার পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

উদাহরণত, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় গুরু শিষ্যকে শেখান কেমন করে নিজেকে ও নিজের অন্তরপুরুষকে জানতে হয় এবং সেই জ্ঞানকে সহায় করে কেমন করে চিরন্তন স্বাধীনতা লাভ করা যায় আত্মসত্য নিয়ে পরীক্ষা করবার। ঐ আত্মসত্যের সন্ধান পাওয়া আর নিজেরই চিরন্তন ঐ প্রকৃতি ও সত্যের মধ্যে প্রবেশ করে তা-ই হয়ে ওঠার ব্যাপারটি, সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনেরই অন্যতম অন্বিষ্ট। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের রচনাধারারও প্রধান অন্তরভিপ্রায়। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার অর্থ যে বিশ্বসত্য বা বিশ্বমানবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ও তারই প্রভাবে ব্যক্তিসত্তার বৃদ্ধি ও বিকাশ, সেই 'বিশ্বসত্য' বা 'বিশ্বমানব' শব্দদুটির ভার বুঝতে গেলেও রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্ররচনার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

লেখক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনকে তাঁর মৌল জীবনসাধনার থেকে উৎসারিত প্রবাহবিস্তার হিসাবে পরিচিত করেছেন। সেজন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু আয়োজন সমস্ত সুচারুরূপে ঘটিয়েছেন। একাধারে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে এবং শিক্ষাশাস্ত্র-সম্পর্কে বহুল অভিজ্ঞতার দরুণ, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার সূত্র ও উপাদানগুলি চেনবার জন্য সবসময়েই বিহিত ও অমোঘ উৎসের সামনে তিনি আমাদের পৌছে দিতে পেরেছেন। বিশেষ করে শিক্ষার্থী যাঁরা তাঁরাও কৃতজ্ঞ হবেন—এমন নিয়মানুগ সুপ্রবদ্ধ প্রত্যক্ষ ও পরিচ্ছন্ন তাঁর রচনা। পরিচ্ছেদ-অন্তের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিগুলি বিশেষভাবে উপকারী। কিন্তু শুধু তা-ই নয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ, যা শিক্ষাকে ব্রত ও ঈশ্বরকে ব্রতপতি বলে গ্রহণ করে, যা শিক্ষার্থীকে পূর্ণ মানবতায় প্রতিশ্রুত করে আর 'আনন্দময় লীলাভিসারে'র পথে নির্ধারিত করে— তার সাধনা, রবীন্দ্র-উত্তর সময়ে সাংস্কৃতিক কৃত্যতালিকায় তার অর্থসঙ্কোচ বর্ণনা করে (পৃ ১০৬-১০৮) লেখক প্রমাণ করেছেন তাঁর গভীরতর দায়িত্ব। এই গভীরতর দায়িত্বের প্রমাণ— তিনি যে রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তার বিশ্ববিসারী পটভূমি টাঙিয়ে দিয়েছেন তারও মধ্যে স্পষ্ট: 'শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বাসটিকে মুঞ্জরিত ক'রে তুলেছিলেন তা পৃথিবীব্যাপী পশ্চাৎপটেই ফলপ্রসব করেছে।' ঐ পটভূমির স্বার্থে দেশী ও বিদেশী শিক্ষা-চিন্তকেরা এখানে তুলনামূলকভাবে আলোচিত হয়েছেন। আর, বিশ্বশিক্ষাচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের একটি সুনির্দিষ্ট স্থান — যা এমনভাবে আর কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে না — নির্ণীত হয়েছে এই বইয়ে।

এই বইয়ের অধ্যায়গুলি যে-রকম পরিচ্ছেদে-পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত, মাঝে মাঝে একই কথার পুনরুক্তি এসে অবশ্য সেইরকম ধারাবাহিকতার ধারণা গড়ে ওঠার বাধা সৃষ্টি করে। তাঁর পরিভাষাগুলি খুব যথার্থ হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে একটু ক্লিষ্ট মনে হয়, যেমন প্রতিনিহিত, পোহন, উপযান, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই ত্রুটি অকিঞ্চিৎকর।

'আমাদের ভারতবর্ষে অতিবৃহৎ সাহিত্যপ্রতিভা দুটি জন্মেছে — কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ।' পূর্ব-আলোচিত শ্রীসুকুমার সেনের বই থেকে এই মন্তব্যটি স্মরণ করা গেল। কেননা বিষ্ণুপদবাবুর প্রস্তাবনায় এই সূত্রটিই বিশদীকৃত, তিনি লিখেছেন: 'কাব্যের ক্ষেত্রে সত্যই কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয়।' এই উক্তি অবশ্য লেখক বলেছেন — শ্রী Sten Konowর রচনার প্রেরণা-জাত।

কিন্তু বিষ্ণুপদবাবুর নাম-প্রবন্ধটি অধিক প্রত্যাশাবশতই আমাদের কিঞ্চিৎ হতাশ করে, পরিচিততম

তথ্যগুলি সংক্ষেপে শুধু তাঁর প্রশংসনীয় রচনাভঙ্গি দিয়ে তিনি এখানে সঙ্কলন করে দিয়েছেন। তার বেশি নয়। অবশিষ্ট রচনার অধিকাংশগুলি বিশ্লিষ্টভাবে কালিদাস-বিষয়ে, বাকী চারটির বিষয় রবীন্দ্রনাথ। কালিদাস-সম্বন্ধীয় রচনাগুলির মধ্যে আমাদের সবচাইতে অধিকার করেছে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও কালিদাসের ব্যাখ্যা'। কালিদাস-আলোচক হিসাবে বাঙলা সমালোচনার এই শ্রুতকীর্তি মনীষীর ভূমিকা বিষ্ণুপদবাবুর বিশ্লেষণে অতি উজ্জ্বলভাবে নিষ্পাদিত হয়েছে, এবং আমাদের বিবেচনায় এই প্রবন্ধই এই বইয়ের সবচাইতে মূল্যবান রচনা। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক আলোচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উপকারী লেখা 'অভিসার কবিতার উৎস-সন্ধানে'। এর আগে তাঁর কৃত 'পরিশোধ' কবিতার উৎসের বিবরণ পড়ে[১] পুরাণানুগৃহীত রবীন্দ্ররচনাগুলির পর্যালোচনায় তাঁর নির্দেশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। এই লেখা পড়ার পরে ঐ বিষয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত একটি বইয়ের জন্য আগ্রহান্বিত হচ্ছি।

আমরা বিশেষ করে এই দুটি নিবন্ধের নাম করলাম। কিন্তু তাঁর অন্যান্য নিবন্ধগুলিতেও প্রভূত পাণ্ডিত্য ও নিপুণ বিশ্লেষণের সমপরিমাণ সাক্ষ্য আছে, যা বিশেষ করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

অধ্যাপক শীতাংশু মৈত্রের আলোচনা বোধকরি এর অপর পিঠ, তিনি রবীন্দ্রমানসে পাশ্চাত্য ভাবধারা-জাত উপাদানগুলি আমাদের দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র ভারতীয়তার সূত্রে বিচার্য বলে গ্রহণ করেন তাঁদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে সাহিত্য-আকাদমী-সঙ্কলনে প্রকাশিত শ্রীতারকনাথ সেনের বহু-আলোচিত রচনাটির বিরুদ্ধে শীতাংশুবাবুর প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বতোমুখ চিত্তকে, তাঁর মতে, ভারতীয় বেদ-উপনিষদের মধ্যে বেঁধে রাখা অসঙ্গত। তা বাদে ইতিহাসগত যুক্তিতেও রবীন্দ্রনাথের জন্য পাশ্চাত্য পটভূমিকাটি অপরিহার্য, তার কারণ: 'পাশ্চত্যকে গ্রহণের ফলে তিনি যুগের মর্মকথাটিকে বাণীরূপ দিতে পেরেছেন, তিনি আধুনিক কালকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে যুগ-চেতনার শ্রেষ্ঠ ধারক হয়েছেন। পাশ্চত্যকে গ্রহণ না করলে তাঁকে মধুসূদনেরও আগের যুগে ফিরে যেতে হতো।' পৃ ৮

'পাশ্চাত্য'-কথাটিকে এখানে আরো বিশেষ করা হয়েছে পাশ্চাত্য রোমান্টিকতা বলে। লেখক দেখিয়েছেন, বাঙলাদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর খাত ধরে ঐ ইতিহাসপ্রবাহ এসে প্রবেশ করেছে রবীন্দ্রমানসে। তার সূচনা প্রাক্-রবীন্দ্র পর্বে— মধুসূদন-বিহারীলালের মধ্যে, আর পরিণাম রবীন্দ্রনাথে। এবং পশ্চিমের রোমান্টিক যুগ ও তারই পরিণতি-পুষ্ট অনুবৃত্তি ভিক্টোরীয় যুগের সাগ্রহ স্বীকরণ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে। পৃ ১৬

নরনারীর সম্পর্ক ও নারীহৃদয়ধারণা, বিশ্বমানবতা ও মানবিকতাবাদ, ইহমুখিতা ও নিসর্গদৃষ্টি, দুঃখবোধ ও সৌন্দর্যবীক্ষার সূত্রে এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রতীচ্যধর্ম নিষ্পাদিত হয়েছে। উর্বশী-কবিতাটিকে শীতাংশুবাবু বেছে নিয়েছেন কথামুখ হিসাবে। ঐ দীর্ঘ উপক্রম-আলোচনাটিতে— যেখানে বইয়ের মূল নির্ভরতা— বিশদভাবে দেখানো হয়েছে তার সমস্ত ঐতিহ্যগত পরিমণ্ডল সত্ত্বেও তার স্তরে-স্তরান্তরে প্রতীচ্য রোমান্টিক ভাবধারার গভীর অনুসরণ, শুধুমাত্র ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে ঐ ব্যক্তিত্বদীপ্ত নারী, তাঁর মতে, বেরিয়ে আসতে পারতো না। উর্বশীর মধ্যে শীতাংশুবাবু প্রাচ্য শক্তিবাদেরও ক্ষণিক উপস্থিতি স্মরণ করেছেন— শুধু বিপুলতরভাবে তাকে পাশ্চত্য রোমান্টিকতায় ফিরিয়ে আনবার মানসে।

---

১ কাব্য-কৌতুক'এর অন্তর্ভুক্ত।

উর্বশীর পরেই বোধকরি উপন্যাসের অগ্রাধিকার, তার কারণ এখানকার ইহচেতনা বা যৌনজীবন কোনোটাই ভারতীয় মতানুগত নয়। ভারতীয় ঐতিহ্য, তাঁর মতে, পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, আর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রাধান্য হলো নারীর, যে নারী আবার একমাত্র প্রেমকে বাঁচাবার, প্রিয়া হয়ে বেঁচে থাকায় লালসার দীপ্যমান, যা কিনা প্রতীচ্যের রোমান্টিক দর্শনজাত। শীতাংশুবাবু প্রশ্ন করেছেন, রবীন্দ্র-উপন্যাসে কই সেই সম্পূর্ণাঙ্গী প্রাচ্যা? শীতাংশুবাবু তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে খুঁজে পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে নয়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেই তাঁর বিশ্ববীক্ষার প্রতীচ্যময়তা সবচেয়ে পরিস্ফুট, কিন্তু অন্যত্রও শীতাংশুবাবু তাকে পরিস্ফুট করেছেন। যেমন তাঁর জীবনদেবতা-তত্ত্ব— যা মূলত ভারতীয়তারই প্রেরণা বলে বহুমানিত— শীতাংশুবাবু তার জন্য স্মরণ করেছেন য়ুং-এর কালেকটিভ আনকনশাস-এর ঋণ, আর তার জন্য আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে কবির আজন্ম উৎসাহ। এ ছাড়া তাঁর জীবনদর্শনের বৈরাগ্যবিমুখিতা ও মানবকেন্দ্রিকতা তো রয়েছেই, সেগুলি আমাদের অজানা নয়, শীতাংশুবাবুকে তার জন্য শুধু উদাহরণ বাড়াতে হয়েছে।

শীতাংশুবাবুর আলোচনা কোনোখানেই কল্পনাহীন সমান্তর-সন্ধান নয়, এবং সবজায়গাতেই প্রভূত তথ্যের দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু তাঁর আলোচনায় সবচাইতে যা অস্বস্তিকর তা হলো পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্তের আনুগত্য, আর সেই সিদ্ধান্তের জন্য প্রথিতযশা কিছু বিলিতি সমালোচনার নিঃশর্ততর আনুগত্য। রোমান্টিকতার আলোচনায় ঐ বিদেশী সূত্র-সিদ্ধান্ত— এমনকি চেনা সেই পারিভাষিক শব্দবন্ধগুলি পর্যন্ত বারংবার ফিরে ফিরে এসে লেখকের সদভিপ্রায়কে পাঠকের কাছে একটু ব্যাহত করবে বলে আমাদের মনে হয়। কিন্তু তা বাদ দিলে, তাঁর লেখা প্রচুর জ্ঞাতব্যে ভরা, এবং রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুদের কাছে সেই জ্ঞাতব্যগুলি কোনোক্রমেই পরিহার্য নয়।

নেপাল মজুমদারের বইখানিতে রবীন্দ্রালোচনার ভিন্ন একটি পরিপ্রেক্ষিত গৃহীত হয়েছে, এক হিসেবে সেটি উপেক্ষিত পরিপ্রেক্ষিতও বটে। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার পাশে যে কর্মীসত্তার সতত উপস্থিতি, আলাদা করে তার সমূহ পর্যালোচনা তেমন হয়নি, নেপালবাবু সেই দিনকৃত্যরত রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লিষ্টভাবে তাঁর আলোচনার বিষয় বলে গ্রহণ করেছেন। তৎকালীন ভারতের এবং তৎকালীন বিশ্বের যাবতীয় জ্বলন্ত সমস্যাবলী তাঁকে যে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল, 'সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন ও সাধনা এবং তাঁহার রচনাবলীর পর্যালোচনা করাই হইতেছে এই গ্রন্থ প্রণয়নের আসল উদ্দেশ্য।' এবং আরো বিশেষভাবে, তদানীন্তন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের রচনা ও কর্মপ্রচেষ্টার তাৎপর্য লেখক এখানে নির্ণয় করার প্রয়াস করেছেন; সেইমতো, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার ক্রমবিকাশের ধারাটি ক্রমানুসারে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কর্মপ্রচেষ্টার পাশে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীকেও নেপালবাবু তাঁর প্রতিপাদ্যের মধ্যে তুলে নিয়েছেন, কার্যতও রবীন্দ্রনাথের কবিকৃত্যকে এই আলোচনায় অস্বীকার করেন নি। কিন্তু সব সময়েই পাঠককে তিনি মনে করিয়ে রেখেছেন তাঁর পরিপ্রেক্ষিতটি আর প্রস্থানবিন্দুটি আলাদা। সেইসব রবীন্দ্ররচনার উল্লেখ করেছেন যারা রবীন্দ্রনাথের ঐ সামাজিক দিকটির জন্য প্রয়োজনীয়, এবং সেই রবীন্দ্ররচনাবলীকে শিল্প হিসাবে নয়, তাঁর

ঐ দৃষ্টিভঙ্গিটির দ্বারাই সবখানি প্রমাণিত করেছেন। যেমন, 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে'কে তিনি দেখিয়েছেন, মূলত রাজনৈতিক উপন্যাস (প্রথম খণ্ড : পৃ ৩১১ ও পৃ ৩৭১)। 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা'য় লক্ষ্য করেছেন অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের ইঙ্গিত (প্রথম খণ্ড : পৃ ৩০২ ও দ্বিতীয় খণ্ড : পৃ ১৯৫)। 'রক্তকরবী' নাটকে যক্ষপুরীর কারাগার যে ইউরোপ-আমেরিকার পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তা তাঁর চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে (দ্বিতীয় খণ্ড : পৃ ২৬৪ ও পৃ ২৬৭)। আবার 'নৈবেদ্য'র কবিতায় একদিকে তিনি দেখেছেন 'সাম্রাজ্যবাদী লালসা'কে বিনিপাত-জানানো পংক্তিসমুচ্চয়, অপরদিকে ঐ 'নৈবেদ্য'র যুগ থেকেই, লক্ষ্য করেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধারা প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে,...তাহা হইতেছে 'হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ'।'

যেখানে রচনাগুলি রাজনৈতিকভাবে অব্যক্তভাবী, সেখানেও খুব উপযোগী কতকগুলি প্রশ্ন লেখক রেখেছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার ১৯০৮ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে, বা সে সময়কার গান্ধীজি-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না :

তবে কি প্রায়শ্চিত্ত-নাটক কবিমনে দক্ষিণ আফ্রিকার ঐ রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফল? (প্রথম খণ্ড : পৃ ৩০৩) গীতাঞ্জলি-র পরে জীবনস্মৃতি, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর প্রভৃতি রচনাগুলির মধ্যে অচলায়তন-কেই 'কিছুটা আলোচনার আওতার মধ্যে আসে' বলে বিবেচনা করেছেন। তার কারণ, অচলায়তনে

> রবীন্দ্রনাথ কি [আমাদের জাতীয় আন্দোলনের] সশস্ত্র সমাজ-বিপ্লবকে সমর্থন করিলেন? (প্রথম খণ্ড : পৃ ৩১৯)

'বর্ষশেষ' নামক বহুখ্যাত কবিতাটির সম্বন্ধে লিখেছেন

> কেহ কেহ ইহাতে শেলীর 'Ode to the West Wind'এর পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু কেহই তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকায় কবির বিক্ষুব্ধ মানসিক অবস্থাটির কথা চিন্তা করেন নাই। (প্রথম খণ্ড : পৃ ১৩৬)

নেপালবাবুর এই মন্তব্যগুলির কোনো কোনোটি-অন্তত বিচ্ছিন্নভাবে নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর, কিন্তু তাঁর কর্তব্য যে আলাদা আর কোনোখানেই শিল্পগ্রাহিতার অবসর যে তাঁর নেই— তাঁর লেখা সবজায়গাতেই এই আন্তরিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর সেই কারণেই সমগ্র বইটির গতিপ্রবাহের মধ্যে এই মন্তব্যগুলি, মনে হয়, স্বাভাবিকভাবেই মানিয়ে গেছে। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের মূল কবি-চরিত্রকেও তিনি দৃষ্টির বাইরে রাখতে চান নি। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি সামাজিক কার্যের পিছনে কবিপ্রবৃত্তি ও সমাজচেতনার যুগ্ম উপস্থিতি তিনি নির্ণয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিরও ভূমিকা সন্ধান করেছেন যেখানে সমস্ত রবীন্দ্রকাব্যের ভূমিকা স্বীকৃত, সেইখানে— 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় :

> ইহাতে শুধু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যেরই ভূমিকা লেখা হয় নাই, রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের রাজনীতির ভূমিকাও এই কবিতার মধ্যে লিখিত রহিয়া গিয়াছে। (প্রথম খণ্ড : পৃ ২৯)

আর তাঁর রাজনীতির মূল উৎস নির্ধারণ করেছেন কবি-অনুভূত আধ্যাত্মিক মানবতাবাদে। অচিরকালের মধ্যেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে পৃথক করে এনে গঠনমূলক সমাজসেবায় মনোনিয়োগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার মধ্যে লেখক তাঁর কবিচরিত্রের প্রভাব দেখিয়েছেন। আর অচিরকালমধ্যে

তিনি যে উগ্র জাতীয়তাবাদের আদর্শ পরিত্যাগ করে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাকে আধ্যাত্মিক বিশ্বজাগতিকতাবাদ নামে অভিহিত করে লেখক সেই কবিঅভিপ্রায়েরই প্রাধান্য দেখিয়েছেন। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিছক দিনকৃত্যগুলির জন্যও আত্মা ও শাশ্বতের সমর্থন যাজ্ঞা করেছিলেন। লেখক যখন সামাজিক কর্মে রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, রাজনীতিজ্ঞতার অভাব কিংবা রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন, তখনো এই সত্যকেই তিনি মর্যাদা দিয়েছেন বলে মনে হয়!

নেপালবাবু তাঁর দু-খণ্ডের সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এসে পৌঁছিয়েছেন। এই সালটি দু-টি কারণে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি-চিন্তার উপর ড. শচীন সেনের বইটি এই সালে প্রকাশিত হয়, তাতে রাজনীতিচিন্তক হিসেবে তাঁর সর্ববাদিসম্মত পুঁথিগত প্রতিষ্ঠার পরিচয় সম্ভবত মেলে। আর দ্বিতীয়, এই সালেরই শেষে লাহোর কংগ্রেসে শ্রীজবাহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় শুধুমাত্র স্বদেশমনস্ক রবীন্দ্রনাথ নন, ঐ সময়ের ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিকাটিও বিস্তারিতভাবে লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ জীবনবিকাশটিও যাতে ধারাবাহিকভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে। তাঁর সমাজাদর্শের সব দিকগুলি— তাঁর গণসংযোগ, কৃষি, সমবায়, পল্লী উন্নয়ন, স্বদেশী সমাজ ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার আদর্শ, তাঁর শিক্ষাপ্রকল্প আর্থনীতিক ভাবনা ও সমাজের নানাবিষয়ে তাঁর প্রগতিক চিন্তাধারা— বিশেষভাবে আর বিশদভাবে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতিচিন্তকদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে তাঁর আলোচনা করে তাঁর চিন্তা ও মতগুলিকে লেখক যথাযোগ্য মর্যাদাতেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

লেখক আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ভারতের সমস্যাকে বিশ্বের সহানুভূতিশীল চোখের সামনে উপস্থিত করার অনেকখানি কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথেরও। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ভোলার নয়। এবং তাঁর চিন্তার তাবৎ মৌলিকতাগুলি তিনি সযত্নে বেছে তুলেছেন।

এই একটি জায়গায় বিশেষ করে লেখকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তার কারণ সাধারণত ভারত-রাজনীতির আলোচনায় সরকারীভাবে রবীন্দ্রনাথের কোনো স্থান নেই; তাঁর দু-একটি কৃত্য— যেমন, তাঁর নাইট উপাধি ত্যাগ বা জাতীয় গীতিরচনা আমরা তাঁর গুণমুগ্ধেরা আপ্লুত কণ্ঠে বলে থাকি বটে, কিন্তু সমসাময়িক সমাজ ও জাতীয় চিন্তায় তাঁর অজস্র মৌলিক অবদানের খবর আমরাও অধিকাংশজনেই হয় অল্পদিনেই ভুলেই গেছি, নতুবা তাঁর কবিতার দ্বারা আচ্ছাদিত করে ফেলেছি। সর্বভারতীয় আলোচনাতেও তার তেমন কোনো স্বীকৃতি চোখে পড়ে না বলে আমাদেরও সে কথা মনে রাখার গরজ নেই। নেপালবাবু তাঁর এই বইতে সেইসব রবীন্দ্রচিন্তার মূল্যবান দলিল আহরণ করে রাখলেন। তাঁর বই আরেকটু সুলিখিত বা প্রসাদগুণান্বিত হলে আমাদের ভালো লাগতো। তাঁর রচনায় যে পরিমাণ তথ্যসামগ্রী রয়েছে, সেই অনুপাতে গৃহস্থালীঃ নেই, কিন্তু এগুলি বাদ দিয়েও তাঁর এই আলোচনা অত্যন্ত মূল্যবান; এবং সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও অবশ্যপাঠ্য রবীন্দ্রজীবনী বলে রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক জীবনীর পাশেই এই বইয়েরও দাবি থাকবে বলে আমাদের মনে হয়েছে। আমরা রবীন্দ্রনাথের সকল শ্রেণীর পাঠককেই এই বইখানি পড়বার অনুরোধ করি।

ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস তাঁর বইয়ের গোড়াতেই অত্যন্ত সময়োপযোগী এই প্রশ্ন তুলেছেন: 'রবীন্দ্র কবি প্রতিভা শতাংশের কত অংশে পরিবেশ নির্ভর?' বিশদ করে বলতে হলে: 'একটি আশ্চর্য কবিবাণীর পরিশীলনে প্রত্যক্ষের যাবতীয় রমণীয়তার সঙ্গে অপ্রত্যক্ষের চকিত স্পর্শ একত্র তাঁর কাব্যে যেভাবে লাভ করা যায় তার কী পরিমাণ ঠাকুরবাড়ির সংসার এবং তৎকালীন বাঙলাদেশের রচনা?' ক্ষুদিরাম বাবু বরং পুরাতন বাঙলার কাব্যসংস্কারের পটভূমিকায় 'সৌন্দর্যস্রষ্টারূপে জাতীয় ঐতিহ্যের অনুবর্তী বলে গণ্য করতে' চেয়েছেন তাঁকে। কিন্তু তারপরে আরো প্রত্যাশিত এই সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছেন: 'প্রত্যক্ষ কবিবচনকেই কাব্য-কীর্তির মৌল সম্পদ বলে দেখা উচিত।'

তার কারণ, ক্ষুদিরামবাবু অসংশয়িতভাবে জানিয়েছেন, 'কাব্যগত রমণীয়তা স্বয়ম্প্রকাশ, বাহ্য পরিচয় ছাড়াই সহৃদয় পাঠকের চিত্তে তার ইন্দ্রধনুর বর্ণবিস্তার।' সেই অনুসারে, তাঁর এই আলোচনায় কবিতা বিশ্লেষণের স্বার্থে তিনি বাইরের জীবনী পরিবেশ ঘটনা কিংবা আরোপিত বা বহুমানিত কোনো তত্ত্বের প্রভাব-প্রেরণা সন্ধান করেন নি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছবি ও গানের সংশ্লেষ বলে তাঁর কবিতার যে-পরিচয় দিয়েছিলেন, চিত্রগীতময়ী সেই রবীন্দ্রবাণীর রূপপ্রকরণের উপর তিনি তাঁর আলোচনার মূল নির্ভর রেখেছেন, এবং 'মুখ্যত প্রকাশের বা কবিভাষার উপর নির্ভর করে কাব্যচমৎকারের স্বরূপ নির্ণয়ের' প্রয়াস করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যধারার ধারাবাহিকতাকে তাই বলে তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নি। শুরু করেছেন 'কড়ি ও কোমল'এ, যেখান থেকে রবীন্দ্রনির্দেশিত সার্থকপদত্বের সূচনা। আর 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'জন্মদিন'এ পযন্ত তাঁর আলোচনাবিস্তার যে-পর্যায়-ক্রমে তিনি বিন্যস্ত করেছেন সেখানে একটি ক্রমবিকাশের সূত্রও যেন অলক্ষিতে কাজ করে যায়, যেটি প্রায় জীবনবিকাশের সহযোগী। অথচ আলোচনার পদ্ধতিতে বোঝা যায়, এখানে কবিতাগুলি কোথাও জীবনবিকাশের উদাহরণ হিসাবে গৃহীত হয় নি, এবং সমস্ত আলোচনা ভয়ানক ভাবে কবিতামাত্রনির্ভর। শুধু একবারমাত্র পদসার্থকতার প্রসঙ্গটিকে অগ্রাহ্য করে একটি গোটা কবিতাগ্রন্থ এই বইয়ে প্রবেশাধিকার পেয়েছে, সেটি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এবং সেটি গৃহীত হয়েছে আরো মহত্তর কারণে, পূর্ব-উদ্ধৃত জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর সেতুবন্ধনের অভিপ্রায়ে। তার কারণ তাঁর মতে, এখানে 'এমন একটি প্রাচীন রীতির রচনায় তিনি প্রভাবিত হচ্ছেন যা তাঁর কবিধর্মের সঙ্গে অর্থাৎ শব্দার্থ নির্মাণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ।'

'চিত্র-সংগীত' কথাটিকে ক্ষুদিরামবাবু শব্দার্থ-সাহিত্যের বা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র কথিত বক্রতা-র প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করেছেন, শুধু তাই নয়, 'রূপের দিক থেকে কাব্য-বিবেচন' করতে গিয়ে তিনি সেই পুরাতন রূপদর্শী আলঙ্কারিদের বিস্মৃত পথরেখাটিকে যেন এই আলোচনায় পুনরায় উদ্ভাসিত করে তুলতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। ক্ষুদিরামবাবু সংস্কৃত সাহিত্যের বিশ্রুত পণ্ডিত। এই আলোচনায় আলোচ্য-কবিতা ও পাঠক উভয়েই তাঁর পাণ্ডিত্যের সহায়তায় নিঃসন্দেহে লাভবান হয়েছে।

এতৎসত্ত্বেও বলতে হয়, তাঁর আলোচনায় খুব স্পষ্ট দু-টি দিক ফুটে উঠেছে। তাঁর আলোচনা যেখানে ভালো সেখানে ঐ পুরাতন বিবেচনাপদ্ধতিতেও তিনি এই মুহূর্তের জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করতে পেরেছেন, শব্দশরীরের অন্তঃস্থ যে কবিতা— তারও মাঝখানে পাঠককে নিয়ে যেতে পেরেছেন। কিন্তু অন্যত্র— আর বলা যায় অনেক স্থানেই— তাঁর আলোচনা শুধু ছন্দোবিশ্লেষণ-অলঙ্কারনির্ণয়-এবং অঙ্গীরস সন্ধান— আর একই ধরণের কয়েকটি বিশেষণ-প্রযুক্ত অল্প-কথার মন্তব্য, যা কিছুতেই কবিতাটির মধ্যে পাঠককে নিয়ে যেতে

পারে বলে আমাদের মনে হয় না। তাঁর কোনো কোনো অর্থনির্ণয়ের সঙ্গেও আমরা একমত হতে পারি নি, সেটি অবশ্য তেমন জরুরি প্রসঙ্গও নয়, কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে তিনি যদি বিশ্লেষণের জন্য আরো অল্প কবিতা বেছে নিতেন— আর কোথাও কোথাও অন্তত পূর্বসূরিদের দৃষ্টান্তের উপরে স্থান দিতেন ব্যক্তিগত বিবেককে, তাহলে আলোচ্য প্রত্যেকটি কবিতায় তাঁর পূর্ণ মনোযোগ পড়তো, এবং তাহলে তাঁর অভিপ্রায় আরও প্রস্ফুটতর হয়ে উঠতো তো বটেই, আমরাও তাঁর এই আলোচনাকে আরো মূল্যবান— আরো অপরিহার্য বিবেচনা করতে পারতাম।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের এর আগের লেখা রবীন্দ্রনাথের নাটক ও কবিতা-বিষয়ের সুদীর্ঘ বইদুটির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন, এই তৃতীয় বইটিকে সহজেই তাঁরা ঐ আলোচনাপর্যায়ের পরবর্তী যোজনা হিসেবে মিলিয়ে নিতে পারবেন। এই বইখানিও সমান সুদীর্ঘ, একই রকম বিশদ ও বর্ণনাধর্মী, একই রবীন্দ্রবোধের ভিন্ন-নিদর্শন-আশ্রয়ী প্রকাশ। উপন্যাসের আলোচনা এখানে সংক্ষিপ্ততর, এবং বিশেষত্বহীন। প্রধানত উপন্যাসগুলির কাহিনীসংক্ষেপ কালানুক্রমে অধ্যায়ে অধ্যায়ে স্থাপিত হয়েছে; পটভূমিক বা অন্তরঙ্গ তাৎপর্য সন্ধান নেই এমন নয়, কিন্তু তুলনায় অনেক গৌণ আর অনুল্লেখ্য স্থান নিয়ে আছে।

লেখকের মতে উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথ কৃতকার্য হতে পারেন নি। তার কারণ তিনি বলেছেন: 'যে-ধাতুতে রবীন্দ্রমানস গঠিত তাকে রোমান্টিক-মিস্টিক বলা যায়।' এবং 'ঔপন্যাসিকের যে দেশ ও কালের সাধারণ জীবনযাত্রার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন, তা রবীন্দ্রনাথের কাছে সহজলভ্য ছিল না।' পৃ ৩২৮। এই সিদ্ধান্ত স্বয়ম্প্রকাশ, এর উপরে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আর এরই পিঠোপিঠি তাঁর অপর উক্তি: 'উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ সবিশেষ সার্থকতা লাভ করেছেন' পৃ ৩৭। এই বইয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের যে আলোচনা আছে তার চেয়ে দীর্ঘ আলোচনা আমাদের চোখে পড়ে নি।

কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বহুদিন আগে লিখেছিলেন: 'ছোটগল্প বলিতে আমরা যাহা বুঝি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই তাহা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন।' এবং ছোটগল্প বলতে আমরা যা বুঝি, তার জন্য 'ছোটগল্প' নামটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই প্রথম ব্যবহার। কিন্তু উপেন্দ্রবাবু শুধু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পেই অনন্যমনাভাবে নিবদ্ধ। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'গল্পরচনার পশ্চাদ্-ভূমি ও আবেষ্টন' বলে রবীন্দ্রজীবনের একটি অধ্যায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে উপনীত হবার আগেকার বাঙলাসাহিত্যের যে প্রস্তুতি, সেই ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটটিকে জরুরি বিবেচনা করেন নি। তিনি আলোচনার যে পরিসর নিয়েছেন তারই জন্য ঐ আদি পর্বটি তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা ছিল।

উপেন্দ্রবাবু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিরও কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন। 'গল্পের ভাববস্তু ও রসবিশ্লেষণ'-অধ্যায়ের এটিই মুখ্য কৃত্য। যেখানে 'গল্পের ভাষা ও রচনারীতি' বিশ্লেষণ করেছেন, সেখানে লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের রচনারীতি বিশ্লেষণ করলে সর্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভাষায় একাধিক বিশেষণের ও উপমারূপকাদির অব্যর্থ প্রয়োগ।' তদনুযায়ী ভাষার বিশেষণ ও উপমা-রূপকগুলি তিনি সন্ধান করে তুলে দিয়েছেন। তাঁর আলোচনার অন্যস্থানগুলিও প্রায় এই রকমই সরল, এবং এর চেয়ে

অধিক তাৎপর্যবহও নয়। তাঁর আলোচনার সবচেয়ে প্রধান গুণই অবশ্য তাঁর আলোচনার এই সরলতা। এবং এই জন্য তাঁর বক্তব্যগুলি তিনি শুধু প্রাঞ্জলই করেননি, তাদের স্মরণযোগ্যতা বাড়াবার জন্য তাদের সূত্রাকারেও উপস্থিত করেছেন। পৃ ৪৯, পৃ ২২০, পৃ ৩০৬।

যে সমস্যাকে তিনি তাঁর আলোচনার কূটস্থানে রাখতে চেয়েছেন, সেটি বাস্তবের সমস্যা। ঐ বাস্তব-অনভিজ্ঞতার দরুণ তিনি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে গ্রহণ করতে পারেন নি। আবার ছোটগল্পগুলিকে সার্থক সিদ্ধান্ত করার জন্য তাদের 'অবিসংবাদিতরূপে খাঁটি বাস্তবচিত্র' (পৃ ২৫) বলে প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। এই দিক চেয়েই বোধ করি তাঁকে লিখতে হয়েছে: 'তাঁর কাব্যসৃষ্টির ধারা ও ছোটগল্পের ধারা পৃথক।' পৃ ৩১। তার কারণ: 'ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবনিষ্ঠ কাহিনী-রচয়িতা চৌদ্দ-আনি, ভাব-সাধক কবি দু-আনি।' পৃ ১৯। এবং 'রবীন্দ্র-প্রতিভা মূলত গীতধর্মী হলেও গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্পের বেলাতে তাঁর গীতধর্ম মোটেই প্রাধান্য পায়নি।' পৃ ৩১

এই সিদ্ধান্তকে সবলতর করার জন্যই সম্ভবত এর পর উপেন্দ্রবাবু তাঁর প্রতিপক্ষদের উপস্থিত করেছেন ও খণ্ডন করেছেন। লিখেছেন:

> অনেকে তাঁর গল্পগুলিকে লিরিকধর্মী বলে একটা সহানুভূতিপূর্ণ তাচ্ছিল্যের উদাসীন মন্তব্য করেন। অর্থাৎ এ গল্পগুলি প্রকৃত গল্প নয়, তাঁর কবিতারই অপর রূপ। পৃ ২০

এবং তার জবাব দিয়েছেন

> কবি গল্পরচনার ক্ষেত্রে সেই জীবন্ত বাস্তববোধকেই গ্রহণ করেছিলেন। তারপর কবির প্রতিভা সেই বাস্তবের শুষ্ক কঙ্কালমধ্যে অপূর্ব জীবন-চেতনা ও অপরূপ লাবণ্য সঞ্চার করেছে। পৃ ২১

এই অসংশয়িত যুক্তি পড়ার পরেও আমাদের কিন্তু জানার ইচ্ছা হয়, এই অনির্দিষ্ট প্রতিপক্ষ কারা? আর এই মন্তব্য কোন সময়ের? এক সময়ে নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিরুদ্ধে এমন ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তা বোধহয় নিছক ইতিহাসের তথ্য। ছোটগল্পের আলোচনায় ঐ কবিতা ও বাস্তবের সমস্যা এখন আর আদৌ জরুরি বলে মনে হয় না, সম্ভবত এতদিনে তার নিরসন হয়েছে, আর অন্যান্য অজস্র অন্তরঙ্গ প্রশ্ন এসে বহুদিন হলো তাকে স্থানচ্যুত করে গেছে।

তা ছাড়া, উপেন্দ্রবাবু যেভাবে বাস্তববোধ ও কাব্যপ্রবণতাকে দুই মেরুশায়ী পার্থক্যে তফাত করেছেন কোনো কবির জীবনেই বাস্তব ও কবিতা সেইরকম সাংসারিক বিভাগে আলাদা নয়। আরো আমাদের জানতে ইচ্ছা করে, 'লিরিক-ধর্মী' কথাটি কোন বিবেচনায় তাচ্ছিল্য এমনকি সহানুভূতিপূর্ণ তাচ্ছিল্যেরও কথা। আমাদের তো মনে হয়, এটি নিতান্ত প্রশস্তি— কি তার চেয়েও বড়, আন্তরিক গুণগ্রাহিতা। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি নিঃসন্দেহে লিরিকাল, যেহেতু আমাদের অনুভব ও অভিজ্ঞতার গভীরতম ও উচ্চতম মুহূর্তগুলি লিরিকাল, এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিবিড়তম অংশগুলি লিরিকাল। সেই লিরিকাল আধ্যাত্মিক যে বাস্তব তা অলীকও নয়, তা পার্থিব বাস্তবের বিপরীতার্থকও নয়! তাঁর গল্পগুলিকে লিরিক-ধর্মী বললে রবীন্দ্রনাথ বেদনা বোধ করতেন বলে লেখক যে জানিয়েছেন, একটু অন্তর্দৃষ্টিতেই বোঝা যায় সেই বেদনার আসল কারণ অন্যত্র। রবীন্দ্রনাথের পাঠক ও সমালোচকেরা তখনো লিরিক বলতে বুঝতেন পদ্যাতিশয়ী বাক্যবন্ধ, এবং কবিতা-কথাটির মর্মোদ্ধার তখনো হয়নি। রবীন্দ্রনাথের বেদনা সম্ভবতঃ ছিল এইখানে।

পরিশেষে বলতে হয়, উপেন্দ্রবাবুর এই আলোচনা প্রয়োজনাতীত দীর্ঘ। তিনি একটি বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণসূচক উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি যোগ করে গেছেন। অনেক জায়গায় রচনার সঙ্গে চিঠিপত্র-গুলি নিপুণভাবে সম্পর্কিত করেও দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোনো জায়গাতেই তিনি বাহুল্য বর্জন করার কথা ভাবেন নি। আর রবীন্দ্ররচনাকে যেভাবে জারিত করে তিনি পরিবেশন করেছেন তাতে তাঁর আলোচনা অনুচিতভাবে স্বয়ম্পূর্ণ হয়ে উঠতে চেয়েছে বলেও আমাদের আপত্তি। তার কারণ এই আলোচনা পড়ার পর মূল রচনাগুলি পাঠকের কাছ থেকে এত দূর আর অদরকারী হয়ে পড়ার ভয় থাকে, যাকে কিছুতেই সমালোচনার সার্থকতা বলে বিবেচনা করা যায় না।

অধ্যাপক প্রণয়কুমার কুণ্ডুর বইখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস-করা গবেষণাগ্রন্থ, ইদানীংকালে যে-সব উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রালোচনা হয়েছে, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে এর স্থান থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে। প্রধান কারণ নিশ্চয়ই তাঁর আলোচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের গীতি-ও-নৃত্যনাট্যগুলির সামাজিক আবেদন যতই বাড়ুক না কেন, সে সম্বন্ধে আলোচনার অত্যন্ত অভাব ছিল। আর অধ্যাপক প্রণয়-কুমারের আলোচনা নিছক কাব্যবস্তুর ব্যাখ্যাও নয়, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণই তার মুখ্য অংশ, এবং সেদিক থেকেও প্রণয়কুমার তাঁর অধিকার অসংশয়ে প্রমাণ করেছেন।

এই বইয়ের পর্যালোচনকেন্দ্রে অবশ্য একটি তত্ত্বের অধিষ্ঠান রয়েছে। লেখকের মতে, বিশিষ্ট এক ছন্দোবোধ থেকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনা ও শিল্পপ্রকরণগুলি— তাঁর কাব্য-নাটক-সংগীত-ও-চিত্র— জন্মলাভ করেছে। 'এগুলি বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্রপথে বিশেষ বিশেষ ছন্দকে আশ্রয় করে বিবর্তিত।' কিন্তু এই আলাদা আলাদা প্রকরণপ্রয়াসগুলি অবিচ্ছিন্ন ছন্দোময়তায় গিয়ে পরিণতি পেয়েছে তাঁর নৃত্যনাট্যে— 'যেখানে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা ও সিদ্ধির সামগ্রিক তাৎপর্য সহসা উদ্ভাসিত।'

'কাব্য, গীত ও অভিনয়— তিনের এই যে সর্বাত্মক অভিসার'— এর সূচনা ছিল গীতিনাট্যের মধ্যেই। সেইজন্য তাঁর শিল্পচর্যার আদিতে গীতিনাট্য। কিন্তু ঐ ছন্দশ্চেতনা সেখানে সর্বাত্মক হয়ে ওঠে নি, প্রথম পা রেখেছে মাত্র। লেখক গীতিনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' থেকে নৃত্যনাট্যের প্রাথমিক খসড়া 'শিশুতীর্থ' এবং 'শিশুতীর্থ'-'শাপমোচন' থেকে নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' পর্যন্ত একটি সুস্পষ্ট বিবর্তনের ধারা চিহ্নিত করে, এবং ধারাবাহিকভাবে সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে সেই বিবর্তনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে, পরিশেষে সিদ্ধান্ত করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের নানামুখী প্রতিভার সার্থক সমন্বয় ও রূপায়ন দেখা গেল নৃত্যনাট্যের মধ্যে।… নৃত্যনাট্যই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনার সিদ্ধি।' পৃ ৩২৫

গীতি ও নৃত্যনাট্য দুটিই অনিবার্যভাবে সুরারোপিত বলে রবীন্দ্রসংগীতপ্রসঙ্গও এই আলোচনার বেশ বড় একটি অংশ গ্রহণ করেছে। লেখকের মতে, রবীন্দ্রজীবনে সংগীতের ভূমিকা অবশ্য আরো বড়, আরো গভীর। তিনি বলেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টিই সংগীত চেতনায় আলোকিত।… শিল্পী বা কবিজীবনের শুরু থেকেই সংগীতানুরাগই তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে' পৃ ৩২৫। প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি এখানে গীতি ও নৃত্যনাট্য-প্রত্যেকটির গায়কী বা গায়নপদ্ধতি এবং সুর সমাবেশের বিশিষ্টতাগুলি সবিস্তারে আলোচনা করে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাটকে গানের ক্রমবিবর্ধিত ব্যবহারের প্রসঙ্গও বলেছেন। দেখিয়েছেন:

গীতিনাট্যের পর নাট্যকাব্যে যেমন গান নেই, তেমনি সাংকেতিক নাটকে ধীরে ধীরে গানের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে নৃত্যনাট্যে তা অবশেষে প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ নাটকের বক্তব্য গানের ভিতর ফুটে উঠেছে তো বটেই, তা ছাড়াও সংলাপের বক্তব্য পুনর্বার গানে রূপান্তরিত। পৃ ১৬৮

নৃত্যনাট্যের প্রসঙ্গে বিশেষ করে আলোচনা করেছেন যেগুলিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের ছন্দছুট গদ্যগান বলে জানি। আর বলা যায়, পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তার একটি ক্রমবিকাশের ইতিহাসও এখানে তিনি রেখায়িত করেছেন, যার শুরু 'মায়ার খেলা'র যুগ থেকে। কারণ, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র গানে রবীন্দ্ররচনা অনুপস্থিত, 'মায়ার খেলাতে'ই স্বরস্রষ্টা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আত্মপ্রকাশ। এইরকমভাবে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যরীতির উপাদানগুলি ও ক্রমবিকাশের কথাও তিনি আলোচনা করেছেন, সেই সঙ্গে বিশদভাবে সঙ্কলন করে দিয়েছেন শান্তিনিকেতনের নৃত্যচর্চার ইতিহাস।

প্রণয়কুমারের এই আলোচনায় সবচাইতে চোখে পড়ে পরম্পরা-সম্পর্কে তাঁর সবসময়ের সচেতনতা, প্রয়োগগত আলোচনায় যে সচেতনতা প্রায়শই শিথিল হয়ে পড়তে দেখা যায়। গীতি ও নৃত্য -নাট্যের আলোচনা করতে গিয়ে সমগ্র-রবীন্দ্রনাথকেও তিনি কোনোখানে কুণ্ঠিত করেন নি। পরন্তু ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধে একদিকে বাঙলাদেশের উনিশ শতাব্দী থেকে বাঙলা নাটক-অভিনয় ও মঞ্চ-বিবর্তনের সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছেন, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের গীতি ও নৃত্যনাট্যের পিছনে বিলিতি অপেরা ও ব্যালে-র প্রেরণাবিধায় সেই বিদেশী যোগসূত্রগুলিকেও সযত্নে সঙ্কলন করেছেন। খুব পরিচ্ছন্নভাবে তাঁর ব্যবহারিক জ্ঞান তাঁর আলোচনায় ব্যবহার করেছেন, তাতে ঐ প্রকরণ-বিষয়ে কতকগুলি অপরিহার্য ও অনালোকিত সূত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। সব মিলিয়ে, বাঙলাদেশের নাট্যকলার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমাদের জ্ঞান আরো পূর্ণতা-প্রাপ্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। রবীন্দ্রজীবন সম্বন্ধেও একটি পূর্ণ ধারণা দেবার জন্যে তিনি সযত্ন থেকেছেন।

শম্ভু সাহা-কৃত অনবদ্য আলোকচিত্র-উদাহরণগুলির উল্লেখ না করলে এই বইয়ের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে। ঐ আলোকচিত্রগুলি এই বইয়ের উৎকর্ষের অন্যতম উপকরণ।

আমাদের সর্বশেষ পুস্তক 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু'। এই গবেষণাগ্রন্থের লেখক শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-সম্পর্কিত চিন্তার একটি ধারাবাহিক ও বিস্তারিত ইতিহাস সঙ্কলন করে তুলতে যত্নবান হয়েছেন। তিনি সব-জায়গাতেই সেই চিন্তার নেপথ্যে পার্থিব হেতুগুলি আর সেই মুহূর্তকার যা উপলব্ধি, এবং তার পাশে সনাতন দার্শনিক ঐতিহ্যের যতখানি প্রভাব, সযত্নে সন্ধান করেছেন, আপাতভাবে-পরস্পরবিরোধী অনুভবও মন্তব্যগুলির জন্য আহরণ করে এনেছেন সঙ্গতিসূত্র— তাঁর মৌল জীবনদর্শন থেকে, সূচনা থেকে পরিণাম পর্যন্ত সতর্কভাবে অগ্রসর হয়ে কবির মৃত্যুচিন্তার একটি অখণ্ড ও সামগ্রিকরূপ আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন।

গ্রন্থ-পরিচয় অংশে শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনালোচিতপূর্ব বলে এই বিষয়টিকে অভিনন্দিত করেছেন। লেখক নিজে অবশ্য বিশেষ করে এই বিষয়েই লেখা অন্তত চারটি নিবন্ধের উল্লেখ করেছেন (যার মধ্যে মোহিতলাল মজুমদারের স্মরণীয় রচনাটিরও উল্লেখ আছে), এবং আরো

অন্তত ছ-জন রবীন্দ্রালোচকের নাম করেছেন যাঁরা তাঁদের আলোচনায় প্রসঙ্গত এই বিষয়টির উপরও আলোকপাত করতে চেয়েছেন। তৎসত্ত্বেও এ কথা বলতে হয়, এই বিষয়ে এত দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে কেউ করেন নি, এবং সেই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে শ্রীদেবনাথের প্রাপ্য।

পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ। শ্রীসুকুমার সেন। পৃ ১০৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩'০০ টাকা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। প্রথম খণ্ড। কাজী আবদুল ওদুদ। পৃ ৫৫১। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭। ১২'০০ টাকা

রবীন্দ্রমন ও রবীন্দ্রসাহিত্য। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। পৃ ৩৭৬। কনটেমপোরারি পাবলিশার্স, কলিকাতা ৯। ১০'০০ টাকা

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃ ১৩+২০৬। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা ৭। ৫'৭৫ পয়সা

রবীন্দ্রদর্শন অন্বীক্ষণ। ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী। পৃ ১০+২৩৬। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা ৯। ৮'০০ টাকা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা। শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার। পৃ ১৪৫। মৈত্রী। প্রাপ্তিস্থান: জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ৯ ও কলিকাতা ২৯। ৬'০০ টাকা

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। পৃ ২০৭। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ৯ ও ২৯। ৬'০০ টাকা

রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্ত্য। শ্রীশীতাংশু মৈত্র। পৃ ৩২+১৬৮। বুকল্যাণ্ড, কলিকাতা ৬। ৬'০০ টাকা

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ। শ্রীনেপাল মজুমদার। প্রথম খণ্ড, পৃ ১১+৪৫৩। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা ৯। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৫২৫। মডার্ন বুক এজেন্সী, কলিকাতা ১২। যথাক্রমে ১০'০০ টাকা ও ১০'০০ টাকা

চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী। শ্রীক্ষুদিরাম দাস। পৃ ৩২৪। গ্রন্থ-নিলয়, কলিকাতা ৯। ১২'৫০ টাকা

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পৃ ঘ+৬১৩+১৫। এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা ১২। ১৮'০০ টাকা

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য। শ্রীপ্রণয়কুমার কুণ্ডু। পৃ ১৬+৪০০। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা ১২। ১২'৫০ পয়সা

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ। পৃ ২২৮+১৪। রবীন্দ্রভারতী, কলিকাতা ৭। ৬'০০ টাকা

চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ। বীণা মুখোপাধ্যায়। নাভানা, কলিকাতা ১৩। দশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সঠিক সংখ্যা কত তা শেষ পর্যন্ত অজ্ঞানা থাকবেই, তবে এটুকু সকলেই জেনেছেন যে অন্যান্য দিকে তাঁর সৃষ্টির যেমন বিপুল বিস্তার চিঠিপত্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁর চিঠির সংকলন কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতেই ছিন্নপত্র উচ্চস্তরের সাহিত্য বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। পরবর্তী চিঠিপত্রের খণ্ডগুলি সেই স্তরের সাহিত্য না হলেও নানা কারণে কবির সৃষ্টির ও জীবনের চর্চায় তাদের অপরিসীম মূল্য অনস্বীকার্য।

সংসারে অধিকাংশ লোকের চিঠিই ঘটনাকেন্দ্রিক। কখনো কখনো কবিত্বের ঢেউ জেগে উঠলে সাধারণ মানুষের চিঠিতে গাছপালা পাহাড় সমুদ্র প্রভৃতির আবেগচঞ্চল বর্ণনা দেখা দেয়। কিন্তু সারা জীবন ধরে চিঠি-বস্তুটাকে যাঁরা নিজের মনের বিচিত্রতা আস্বাদন করার উপায় বলে ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই দুর্লভ শিল্পীদের অন্যতম। তাঁর অধিকাংশ চিঠিই যাঁকে লেখা তিনি উপলক্ষ্য মাত্র— লক্ষ্য নিজের সম্বিৎ চর্বণের আনন্দ— যাকে আলঙ্কারিকেরা রসসৃষ্টি প্রক্রিয়ার শেষ ফল বলে উল্লেখ করেছেন— 'স্বসংবিদানন্দ চর্বণীয়ো ব্যাপারঃ'। প্রকৃতপক্ষে অনেক কবিতার জন্মপ্রেরণা বহুপত্রের জন্মের পিছনে সমান সক্রিয়।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে জীবনের শেষ বিশ বছরে রবীন্দ্রনাথ এমন বহু চিঠি লিখেছেন যেগুলির মুদ্রিত হবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি ষোলো-আনা অবহিত ছিলেন। তাঁর জীবৎকালেই বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর চিঠি ছাপার জন্য ব্যাকুলতা ছিল। এই ঘটনা যে পত্রাবলীতে তাঁর অন্তরলোকের নিঃসংকোচ উদ্‌ঘাটনে বাধা জন্মায় নি এমন কথা জোর করে বলা শক্ত। এবং যেমন প্রথম-মহাযুদ্ধের পর থেকেই তাঁর কবিতা মননসমৃদ্ধ হয়েছে তেমনি জীবনের শেষ অর্ধের চিঠিগুলির মধ্যে ব্যক্তি-হৃদয়ের উত্তাপের চেয়ে ভাবনাগত নিরাসক্তির নৈর্ব্যক্তিকতাই প্রবলতর। প্রিয়নাথ সেন, লোকেন পালিত প্রভৃতিকে লেখা চিঠিগুলির সঙ্গে হেমন্তবালা দেবী, কাদম্বিনী দেবী প্রভৃতিকে লেখা চিঠিগুলির পার্থক্য উপরের মন্তব্য সমর্থন করবে।

বলা বাহুল্য এইসব বিচিত্রতা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পত্ররচয়িতা। এতাবৎকাল অনেকেই কলেজ-পাঠ্যবস্তু হিসাবে ছিন্নপত্রের আলোচনা করেছেন, কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্রপত্র-সাহিত্যের আলোচনার প্রথম গ্রন্থ যা চোখে পড়ল তা হল বীণা মুখোপাধ্যায়ের 'চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ'।

যে উদ্যম ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়ে লেখিকা এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় সাজিয়েছেন তার প্রশংসা করতে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলতে হয় পরিকল্পনাজনিত দুর্বলতা ও শৈথিল্য বিষয়বস্তুর উপর লেখিকার সম্যক গৃহিণীপনার পরিচয় বহন করে না। অধ্যায়-বিভাগ প্রায় সর্বস্তরেই পরস্পর-অতিক্রমী। এ জাতীয় অধ্যায়-বিভাগ চিঠিপত্রের মতো পার্সোন্যাল রচনায় ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের 'ব্যক্তিগত চিঠিপত্র' এবং সাহিত্য-পর্যায়ভুক্ত আবেগপ্রবণ পত্রাবলী দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর বিষয়ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। একই চিঠি এই দুটি শ্রেণীতেই পড়তে পারে। 'স্বদেশ প্রেম' 'সমাজ সংস্কার' 'জীবনদর্শন'

এগুলির মোটামুটি বিভাগও যে সম্ভব নয় তা প্রায় একই মর্মার্থমূলক উদ্ধৃতির বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োগের ফলে স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের বিপুল সংখ্যাধিক্য চিঠিগুলির ঠিকমত শ্রেণীবিন্যাসের পক্ষে প্রবল বাধা। কোনো কোনো চিঠি প্রবন্ধাকারে প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। সেগুলো কাউকে উদ্দেশ্য করে লেখা হলেও তার মধ্যে চিঠির রস আদৌ নেই। রাজনীতি সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয় নিয়েই এই জাতীয় চিঠির রচনা।

আলোচ্য গ্রন্থে এই জাতীয় চিঠির সঠিক মূল্য নির্ণয় করার চেষ্টা লেখিকা করেছেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বিষয়বস্তুর আলোচনায় সীমিত হয়েছে, পত্ররচনার কলাকৌশলের দিক থেকে যথোচিত মূল্য আরোপ করা যায় নি। তবে 'চিঠিপত্রে রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্রমপরিণতি' অধ্যায়টি উল্লেখযোগ্য, কারণ যেমন তাঁর সাহিত্যরচনার অন্যান্য শাখায় তেমনি তাঁর পত্ররচনাতেও তিনি যে নিজেকে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত করেছিলেন লেখিকা তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় একটি মন্তব্য লেখিকা করেছেন যেটি নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে— বিশেষ করে যখন দেখি লেখিকা নিজেই নিজের বক্তব্য সমর্থন করছেন না। তিনি বলছেন : "কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবেই বাংলা ভাষায় পত্রসাহিত্য-রচনার সৃষ্টি হয়েছে এ কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে, কেননা ষোড়শ শতাব্দী থেকেই প্রাচীন বাংলাভাষায় রচিত চিঠিপত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংরাজী না-পড়া লোকের লেখা পত্র-সাহিত্যের নিদর্শন মিলেছে।" লেখিকা পত্র আর পত্রসাহিত্যকে প্রায় সমার্থক অর্থে ব্যবহার করেছেন কিন্তু একই পৃষ্ঠায় তিনি নিজেই বলছেন, "সে সময়ে চিঠিপত্রে ও দলিল দস্তাবেজে যে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল তাকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। পরন্তু তখনকার দিনে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষাতেই চিঠিপত্র রচনা করতেন।" পৃ ১

কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই চেষ্টার যা তাৎপর্য তার প্রতি পাঠকের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণে লেখিকা সক্ষম হয়েছেন। হাজার হাজার চিঠির মধ্য থেকে নানা মত নানা মেজাজের যে বিচিত্র মানুষটিকে ধরা যায় তার আভাস তিনি পাঠকদের ধরিয়ে দিয়েছেন। আর-একটু সংক্ষিপ্ত হলে আর-একটু পরিকল্পনাগত ভারসাম্য রক্ষিত হলে বক্তব্য অনেক বেশি স্পষ্ট হত।

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু

পিতৃস্মৃতি। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ২৯। ষোলো টাকা।

পিতৃস্মৃতি আমাদের দেশের ঐতিহ্যের একটি বিশিষ্ট সংস্কার। এই লেখাগুলির জন্য প্রথমেই অভিনন্দন জানাতে হয় রথীন্দ্রনাথকে, সহজ সরস মনোজ্ঞ ভাষায় নিজের আত্মজীবনীর সঙ্গে মিলিয়ে যিনি কবিকে ফুটিয়ে তুলেছেন অদ্ভুতভাবে বহু তথ্য ও বিবরণ দিয়ে। বসুধারায় (১৩৬৬-৬৮) যখন রথীন্দ্রনাথের লেখাগুলি বের হচ্ছিল তখন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে অনেক সময়ই যেতাম, মুগ্ধ হয়ে পড়তাম ঐ লেখাগুলি, শুনতাম তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্য। রথীবাবুকে জোর করে লেখাতে হচ্ছে এ ধরণের

মন্তব্যও মনে পড়ছে। আর ধন্যবাদ জানাতে হয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়কে, যিনি রথীবাবুকে, কবি ও তাঁদের পরিবারের অনেককে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, এবং তাঁদের ভাবধারার সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে পরিচিত। *On the Edges of Time* থেকে অংশগুলির শ্রীক্ষিতীশ রায়-কৃত অনুবাদ সাবলীল ও সুখপাঠ্য। লেনার্ড এলমহর্স্টের ভূমিকাটি স্বল্প কথায় লেখা হলেও বইটির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। আমাদেরও দুঃখ রয়ে গেল যে মহাপ্রতিভাবান পিতার পুত্র তাঁর বিচিত্র ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবার অবসর পেলেন না, এক কথায় তিনি 'হয়ে' উঠলেন না। পিতৃনামেষু মধ্যমই রইলেন, পিতার খ্যাতিতেই আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই তিনি বলে গেছেন— জন্মেছি শিল্পীর বংশে, শিক্ষা পেয়েছি বিজ্ঞানের, কাজ করেছি মুচির আর ছুতোরের। সেটা আত্মশ্লাঘা নয়, আত্মবিলুপ্তির চেষ্টাও নয়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই তাঁর আত্ম-উন্মীলন, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ— এমন বাড়ি যা ইতিহাসের বোঝা কাঁধে করে এগিয়েছে— যে বাড়ির শতাব্দী জুড়ে বাংলার মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর ছিল অদ্ভুত প্রভাব, যার অবদান অসামান্য। 'বাড়ির মানুষের মধ্যে ছিল উদ্দীপনা, পরিবারে ছিল মাধুর্য, পরিবেশে ছিল দাক্ষিণ্য'। রবিকাকার সন্তান জন্মাবার আগে থেকেই 'পারিবারিক খাতায়' প্রশ্ন উঠল যে আসছে, সে পুত্র না কন্যা— সে গম্ভীর আরণ্যক ঋষি হবে, না, সারাক্ষণ দাঁত বের করে হাসবে। কিন্তু মায়ের কোলে রথীন্দ্রনাথ যথেষ্ট গোলযোগের সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রমাণ পাই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে কবিপত্নীর 'প্রোফাইল স্টাডি' রথীন্দ্রনাথের মাতৃচিত্রে এত স্বল্প কথায় এমন ভাস্বর হয়ে ফুটেছে যে যার তুলনা নেই। কবিগৃহিণীর কথা ঠিক কাব্যে উপেক্ষিতা নয় বটে, অন্তরঙ্গ কয়েক-খানি মুগ্ধ চিঠি আছে, ছোট বউকে বা ভাই ছুটিকে লেখা, 'স্মরণ'এর কয়েকটি অনবদ্য কবিতা আছে, আর আছে কতকগুলি কাহিনী যেমন নবীন চিত্তরঞ্জনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাঁক— কাকিমা, আমি এসেছি, লুচি মাংস কই ; কিম্বা শিলাইদহে পদ্মা ধলেশ্বরীর তীরে তাঁর ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি কথা, যেখানে ঘৃত আসছে ভারে ভারে, চাকর দাসীরা ঘৃতশ্রাদ্ধ করছে, যেখানে জগদীশচন্দ্র আসছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল আসছেন, লোকেন পালিত আসছেন, নিবেদিতা আসছেন ; অমলা দেবীর কণ্ঠে গান হচ্ছে— কবি লিখছেন গল্পের পর গল্প— রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতিতে এই শিলাইদহ কাহিনীই চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। শুধু ধূধূ করা পদ্মার চরের গল্প নয়, মাটির গল্পও— যে মাটিতে আমরা জন্মেছি— যে শিক্ষালাভের জন্য তিনি যান আমেরিকায় যেখানে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কৃষিবিদ্যার ছাত্র ছিলেন এবং এইখানেই আর্বানায় কবিও কিছুদিন তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছেন।

রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে আমরা শুধু কবিকেই পাই না, মাতৃবন্দনাই শুনি না, কস্‌মপলিটান ক্লাব বা খামখেয়ালী সভা বা বিচিত্রার বিবরণই পড়ি না, দেখি বড় জ্যাঠামশাই দ্বিজেন্দ্রনাথের হাস্যরসিক চিত্র কয়েকটি— 'বলিবে নমো রবয়ে, বড় দাদা তব এ', মেজো জ্যাঠামশাই সত্যেন্দ্রনাথের বালিগঞ্জের পরিবেশ, যে আসরে আসতেন তারকনাথ পালিত, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি, যেখানকার মধ্যমণি তারকনাথ পালিতকে হতভম্ব করে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দদের সম্মানে এক ডিনারপার্টিতে রবীন্দ্রনাথ গান গেয়েছিলেন।

রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি অনেক সময়ই অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে'কে মনে করিয়ে দেয়। নিবেদিতার সঙ্গে কবি ও জগদীশচন্দ্র বসুর বুদ্ধগয়া ভ্রমণের কথাও আমরা নতুন করে শুনি

রথীন্দ্রনাথের কাছে। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার পূর্বেই আমাদের শুনিয়েছেন সে কথা। সবচেয়ে ভালো লাগে কবির বিলাতযাত্রার নানা খুঁটিনাটি খবর, গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়া ও তার পুনঃপ্রাপ্তি।

সত্যিই ঠাকুরবাড়ির কথা একটা স্যাগা বিশেষ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী, প্রতিমা দেবী, রথীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকে কত কথা লিখেছেন। শুধু জীবনস্মৃতি নয়, কত চিঠি, কত ডায়েরী, কত আত্মপরিচয়। দ্বারকানাথের পত্রাবলী, মহর্ষির পত্রাবলী (ক্ষিতীন্দ্র ঠাকুরের সংগ্রহ), অনেক দলিল দস্তাবেজ কোবালা ট্রাস্টডীড ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য তো এক অপূর্ব সম্পদ, শুধু রবীন্দ্রনাথের অবচেতন ও অধিচেতন মনের খবরই দেয় না, ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসের সঙ্গে দেশের ও সমাজের চিন্তার ধারারও সমন্বয় করে দেয়। তিন শতাব্দী (অষ্টাদশ উনবিংশ ও বিংশ) ছুঁয়ে এর ইতিহাস, এর পুরোগামিনী যাত্রা, এর পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা— কিন্তু তবু সেই রথচক্রে মন্দ্রিত হয়েছে তিনটি নাম, বিশেষ করে প্রিন্স দ্বারকানাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। এই সেই বাড়ি যার কথা লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ—

ভাতে যেথা সত্যহেম মাতে যেথা বীর
গুণজ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর রবি
সেই দেবনিকেতন আলো করে কবি

আমরা পাই এখানে জাতীয়-ইতিহাসের তিনটি সূত্র—

১. প্রাচীন ভারতের ধ্যান ও মন, তপ ও তপস্যার আদর্শ
২. পশ্চিমের ধাক্কা-খাওয়া চেতনার সংশয়ে ও সন্দেহে সব-কিছু যাচাই করে নেবার প্রয়াস, সংকল্প ও সাধন
৩. ভবিষ্যতের স্বপ্নে-মশগুল এক সমন্বয় ও সিদ্ধির আভাস— এর সঙ্গে ছিল দেশাত্মবোধের একটা মধুর প্রকাশ, বিজ্ঞান টেক্‌নলজিকে স্বীকার ও সব মিলিয়ে জীবনের প্রতিটি পর্বে সত্যশিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

ঠাকুরবাড়ির ধ্যানমগ্ন অন্তর্জীবনের সঙ্গে গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন রস মিশে এক অপরূপের সৃষ্টি করেছিল এবং তারই মধ্যে সেই সুরে মিলিয়ে যদি আমরা রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতিকে ধরতে পারি তবেই তার সূক্ষ্ম তারটিতে ঝংকার দিতে পারব।

বইটির সম্পাদন ও প্রসাধন সুন্দর, কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে আজকের মূল্যবৃদ্ধির দিনেও দাম বেশ কিছু বেশি বলেই মনে হয়। দাম কিছুটা কম হলে রবীন্দ্রানুরাগী ব্যক্তিদের ঘরের লাইব্রেরিতে বইটি স্থান পেত। এখন তাদের স্কুল কলেজ বা পাঠাগার থেকে বইটি সংগ্রহ করা ছাড়া উপায় নেই। বিশেষ এই কারণে যে এ বইটি না পড়লে পিতাপুত্রের মিলিত একটি যুগ্ম-জীবনের কয়েকটি স্বর্ণোজ্জ্বল ও বর্ণোজ্জ্বল পৃষ্ঠা অজানা থেকে যাবে— যেখানে আত্মকথা ও পিতৃস্মৃতি এক হয়ে গেছে।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুরবাড়ীর কথা। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৯। বারো টাকা।

দুই মনীষী। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ২৯। ছয় টাকা।

দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে অবনীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বাংলাদেশের শিক্ষা-দীক্ষায়, নানামুখী কর্মচেষ্টায় এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় এক তাৎপর্যময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। স্বভাবতই এই ঠাকুরবাড়ি একটি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পাবার অধিকারী। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে ঠাকুর-বাড়ির দানের কথা সকলেই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে থাকেন। চিত্রবিদ্যাতে যে গৌরবময় স্থান আমরা অধিকার করেছি তাও এই ঠাকুরবাড়ির সূত্রেই। জাতীয়তার উদ্বোধনে ঠাকুরবাড়ির ঋণও স্বীকৃত।

ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস আসলে বাংলাদেশেরই ইতিহাস। ঠাকুরবাড়ি যে আমাদের কৌতূহলই উদ্রেক করে তা নয় তার 'রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই বংশের কীর্তিমান মানুষের কত স্মৃতিবিজড়িত' কথা বাঙালীর গৌরবময় অগ্রগতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইতিহাস-রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। বলা বাহুল্য এই বিশ্ববিদ্যালয় ঠাকুরবাড়ির সেই ঐতিহ্য-রক্ষায় আগ্রহী। ইতিমধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় সে কাজে কিছুটা অগ্রসরও হয়েছে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যে বলতে পারি ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ঠাকুরবাড়ির কর্মচেষ্টাকে বাংলাদেশে আরো ব্যাপকভাবে প্রচার করার দায়িত্বও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই বিশ্ববিদ্যালয় এমন কতগুলি তথ্য এবং উপাদান সংগ্রহ করেছেন যার দ্বারা কিছু নূতন সংবাদ দেওয়া সম্ভব হয়েছে; কিছু সমস্যার সমাধান পাওয়া গেছে এবং পূর্বের অনেক অনুমান এখন প্রমাণরূপে গৃহীত হবার যোগ্য। 'ঠাকুরবাড়ীর কথা'য় এই সকল তথ্য ব্যবহার করে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

লেখক দ্বারকানাথ এবং দেবেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী সবিস্তারে বলে দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের অন্যান্যদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রপরবর্তী ঠাকুর-পরিবারের অন্যান্য বিষয় শেষের অধ্যায় দুটিতে বলা হয়েছে। দ্বারকানাথের চিন্তাধারায় আধুনিকতার দিকটি এখন সকলেই স্বীকার করেছেন। শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন' গ্রন্থে দ্বারকানাথের প্রসঙ্গ সবিস্তারে বলেছেন। যে ব্যবসায়ে দ্বারকানাথ এতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা যে কত প্রতিকূল ঘটনাকে অতিক্রম করে সম্ভব হয়েছিল শ্রীযুক্ত ঠাকুর উক্ত গ্রন্থে সে কথা বিশদ করেছেন। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সে প্রসঙ্গ তো উল্লেখ করেছেনই উপরন্তু দ্বারকানাথের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের দায়িত্বের বিবরণ দিয়েছেন। নানা দিক দিয়ে দ্বারকানাথও অসামান্য পুরুষ ছিলেন। এই অসামান্যতার কথা এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। দ্বারকানাথের পুত্রদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের জীবনকথা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে পিতার বৈশিষ্ট্য যেমন এক দিক থেকে উপেক্ষণীয় নয় তেমনি রামমোহনের শাসনও গুরুতর। সে সময়ে যে ধর্মজিজ্ঞাসা দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে জেগেছিল তা কি করে নানা আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল সেইটি লক্ষ্য করবার বিষয়। এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যে সংকট দেখা দিয়েছিল সে সংকট উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর। এক দিকে খ্রীস্টান পাদ্রিদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, অন্য দিকে প্রাচীন শাস্ত্রপন্থীদের রক্ষণশীলতা— উভয়ই দেবেন্দ্রনাথের কাছে পরিত্যাজ্য ছিল। বেদের বহু দেবতাস্তুতি

দেবেন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা দিতে পারে নি। উপনিষদের অদ্বৈতবাদও নয়। অথচ বেদান্তকে তিনি অস্বীকারও করেন নি। উপনিষদেই যে দ্বৈতবাদের ইঙ্গিত আছে তাকেই অবলম্বন করে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর মনীষার দ্বারা ধর্মমতে অভিনবত্ব দান করলেন। তিনি উপনিষদ থেকে সেই সকল বচন সংগ্রহ করলেন যেগুলি তাঁর মনীষা ও অনুভূতির সমর্থন পেয়েছিল। তিনি সেই সংকলনগ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন ব্রাহ্মী উপনিষদ। এভাবে দেখতে পাই দেবেন্দ্রনাথ ধর্মের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করে তার ব্যাখ্যাতে নূতনত্ব দান করলেন। এ ধর্ম মননেরও বটে আবার উপলব্ধির বস্তু তো নিশ্চয়ই। প্রকৃতপক্ষে ইয়ংবেঙ্গল যে সরণী আশ্রয় করেছিল তাও যেমন যথার্থ নয় তেমনি ধর্মসভা যে মতে বিশ্বাসী ছিল তাও অযথার্থ— দেবেন্দ্রনাথের কাছে ধর্মের ক্ষেত্রে এই ছিল প্রবল যুক্তি। দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় যে পথ গৃহীত হয়েছিল তা মধ্যবর্তী পথ যাকে ভারতপন্থা বলতে পারি। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বেদ-বেদান্তের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং দেবেন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসার যে সহজ সরল ভাষায় বিচার করেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'দুই মনীষী'তে বিবেকানন্দের প্রসঙ্গেও অনুরূপ সূক্ষ্ম আলোচনা উপস্থিত করা হয়েছে। বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদকে আশ্রয় করেছিলেন অথচ জীবকে তিনি অস্বীকার করেন নি। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রবীন্দ্রবাণী ও বিবেকবাণীর মধ্যে অন্তর্লীন সাদৃশ্যের ধারাটি অনুধাবন করেছেন। আসলে দেবেন্দ্রনাথের চিন্তায় ধর্মজিজ্ঞাসার যে পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথে তার একরকম পরিণামরমণীয়তা দেখি। কিন্তু সমস্যার আরও কতগুলি দিক ছিল যা পরমহংস-দেবের সাধনায় লভ্য। পরমহংসদেব 'মতুয়া বুদ্ধি' পরিত্যাগ করে 'যে যৈছে ভজে তারে আমি ভজিতৈছে' —এই বুদ্ধিকেই সমর্থন জানিয়েছেন। বিবেকানন্দের সাধনায় ছিল সহিষ্ণুতা, সর্ববিধ মত স্বীকার করার ঔদার্য, পরধর্মের স্বীকৃতি এবং অগণিত মানবের দুঃখদারিদ্র্যকে যে ধর্ম ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখে তাই। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই দিকটির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন 'দুই মনীষী' গ্রন্থে। 'ঠাকুরবাড়ীর কথা'য় রবীন্দ্রনাথের জীবনভাষ্য অধিকাংশ স্থান নিয়েছে। পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের ক্রমবিকাশের কথা আমরা অন্যত্র পেয়েছি। 'রবীন্দ্রজীবনী'র মত এনসাইক্লোপিডিয়া এ প্রসঙ্গে স্বতই মনে আসে। স্বল্প পরিসরে হিরণ্ময়বাবু রবীন্দ্রনাথের যে জীবনকথা নিবেদন করেছেন তাতে তাঁর কাব্যালোচনা কিংবা গ্রন্থবিচার নেই। মুখ্যত যে রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন বিকশিত হয়েছিল তাই লেখকের আলোচ্য বস্তু। বলা বাহুল্য 'ঠাকুরবাড়ির কথা'য় রবীন্দ্রজীবনের আলোচনা অন্যতম বিষয়। অল্প কথায় হলেও এ জীবনকথা লেখকের আন্তরিকতার সঙ্গে তথ্যনিষ্ঠা যুক্ত হয়ে মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

'দুই মনীষী'তে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-আলোচনা স্থান পেয়েছে। লেখক কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করে রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা অনুসন্ধিৎসু পাঠকচিত্তের কাছে গভীর আবেদন নিয়ে আসে। দুই মনীষী—রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের কথা আগে বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-ভাবনা কোন্ সরণী ধরে ঈশ্বরভাবনায় রূপান্তরিত হল এবং এই দুই ভাবনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনার স্থান কোথায় তা নির্দেশ করতে চেয়েছেন লেখক। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রকৃতি-ভাবনা ও ঈশ্বর-ভাবনার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অধ্যায় হল প্রেমের অধ্যায়। 'এই দুই অধ্যায়ের মাঝখানে কিছুকালের জন্য ব্যবধান সৃষ্টি করে একটি ছোট অধ্যায় কবির কাব্যজীবনে রচিত হয়েছিল।

সে অধ্যায়টিকে প্রেমের অধ্যায় বলা চলে'। এই অধ্যায়টির সূত্রপাত মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে কবির বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে এবং সমাপ্তি মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুতে। এর গোড়ায় মিলনের উদ্দাম উচ্ছ্বাস অন্তে 'হঠাৎ মৃত্যুর আঘাতের মর্মস্পর্শিতা'। অবশ্য এই প্রেমের প্রস্তুতিপর্বও আছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রকাব্যের বিচারে এরকম ভাবনা ইতিপূর্বে অনুল্লিখিত। লেখক বলেছেন প্রেমের অধ্যায়টি প্রকৃতি ও ঈশ্বর চিন্তার মাঝখানের পর্দা। উদাহরণযোগে তিনি তাঁর বক্তব্য বিশদ করেছেন। তৃতীয় প্রবন্ধে ('ওহে অন্তরতম') লেখক জীবনদেবতা-তত্ত্ব পর্যালোচনা করেছেন। 'ঠাকুরবাড়ীর কথা'য় দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তিনি ঔপনিষদিক তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন পুনরায় সে তথ্য পরিবেশন করে লেখক রিলিজন অব ম্যান, শান্তিনিকেতন গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রবচন উদ্ধৃত করে জীবনদেবতা-রহস্য উদ্‌ঘাটনে অগ্রসর হয়েছেন। উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ কবির দার্শনিকমন স্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথের কবিমন তা স্বীকার করতে পারে নি। অন্তরের উপলব্ধিতে জানি পরমসত্তা ব্যক্তিরূপে আমাদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করেন। সেই ব্যক্তিরূপী পরমসত্তাই জীবনদেবতা। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাউলের, বৈষ্ণবের সাধনা। লেখক জীবনদেবতার আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তায়ও সম্ভাবিত এরকম মনে করেন। বলা বাহুল্য জীবনদেবতা ভাবনা সম্বন্ধে কোনো সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। বোধকরি সম্ভবও নয়। যা উপলব্ধির তাকে ব্যাখ্যার দ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়। কবির ব্যাখ্যাও এই কারণে সকলের দ্বারা গৃহীত হয় নি। লেখকের বক্তব্যও সকলে গ্রহণ করবেন এমন আশা করা যায় না। তবে লেখকের বক্তব্যে সারালো যুক্তি আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিরণ্ময়বাবুর আলোচনা দৃষ্টে অন্তত এই কথাই বার বার মনে হয় জীবনদেবতা-রহস্য আমাদের চিত্তে কত বিচিত্র ভাবনাকে জাগ্রত করে।

রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাপকতা এবং সর্বাতিশয়িতা লক্ষ্য করে হিরণ্ময়বাবু পরের প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো ঐশ্বর্য এনে দিয়েছে যেমন সত্য কথা তেমনি কোনো কোনো দিকে বিপর্যয়ের সূচনাও করেছে। লক্ষ্মীর সাধনায় নিমগ্ন জাতি সরস্বতীর কথা বিস্মৃত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বকে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন। হিরণ্ময়বাবু রবীন্দ্রনাথের সমাজ-জিজ্ঞাসার মৌলিক রূপটি প্রকাশ করেছেন তাঁর আলোচনাতে। রবীন্দ্রনাথের কর্মচেষ্টার আর-এক দিক শ্রীনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের কর্মোদ্যমের যে চিত্র আমরা এই গ্রন্থে পাই তাতে লেখকের সহানুভূতি ও দরদের পরিচয় সুস্পষ্ট।

'ঠাকুরবাড়ীর কথা' ও 'দুই মনীষী' গ্রন্থ দুটি উনিশ শতকের জাগরণের ইতিহাস। সমাজের অগ্রগতির মূল্যবান দলিল এই দুই গ্রন্থ। লেখক জ্ঞাত তথ্যকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন এবং এ জাতীয় গ্রন্থরচনায় যে ইতিহাসনিষ্ঠার প্রয়োজন তাও লেখকের রচনায় লভ্য। বাংলাতে প্রথমোক্ত গ্রন্থের অভাব ছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি সম্বন্ধে শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতি— আচার-ব্যবহার, রুচি-সৌজন্য, জীবনাদর্শ, সঙ্গীত সাহিত্য ও শিল্পকলা— নবীন প্রেরণায় বিচিত্রভাবে পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়াছে। ঠাকুরবাড়ির প্রতিভা, বঙ্গদেশকে সমুজ্জ্বল এবং ভারতবর্ষের দিগন্তকে উদ্ভাসিত করিয়াছে।" 'ঠাকুরবাড়ীর কথা'র সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ('দুই মনীষী') অনুসরণ করলে বাংলার রেনেসাঁসের একটি উজ্জ্বল চিত্র পাই। এই পথেই এই দুই গ্রন্থের সাফল্য।

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত

স্বরলিপি

আজি দক্ষিণপবনে
দোলা লাগিল বনে বনে ॥
দিক্‌ললনার নৃত্যচঞ্চল মঞ্জীরধ্বনি অন্তরে ওঠে রনরনি
বিরহবিহ্বল হৃদ্‌স্পন্দনে ॥
মাধবীলতায় ভাষাহারা ব্যাকুলতা
পল্লবে পল্লবে প্রলপিত কলরবে।
প্রজাপতির পাখায় দিকে দিকে লিপি নিয়ে য়ায়
উৎসব-আমন্ত্রণে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

দা২ না II { র্সা -া । সর্গা র্গা I র্গা -ঋঁা । র্গঋঁা -র্সনা I (নর্সা -সনা । দা২ না) } I
আ জি দ ০ ক্ষি ণ প ০ ব ০০ নে ০ আ জি

I নর্সা -া । র্সা র্সা I নর্সা -না । না -ধা I ধা -পা । পা -মা I মা -া । মগা -পা I
নে ০ দো লা লা ০ গি ০ ল ০ ব ০ নে ০ ব০ ০

I মা -া । মা মা I গা -মা । -ধা -না I -র্সা -ঋঁা । র্সা -না I র্সা -র্সনা । দা২ না II
নে ০ দো লা লা ০ ০ ০ ০ ০ গি ০ ল ০ "আ জি"

-া -া I -া -া । -া -া II { র্সা -র্গা । র্গা র্গা I র্গা -া । -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ দি ক্ ল ল না ০ ০ র্

I র্গর্পা -র্মর্পা । র্গা -া I র্গর্পা -র্মর্পা । র্গা র্গা I র্গর্পা -র্মর্পা । র্গা র্গা I
নৃ০ ০ ত্য ০ চ০ ন্ চ ল ম০ ন্ জী র্

I র্গা -ঋঁা । ঋঁা -র্সা I র্সা -র্গা । র্গা র্গা I র্গঋঁা ঋঁা । ঋর্সা র্সা I
ধ্ব ০ নি ০ অ ন ত রে ও ঠে র০ ন

I র্সর্ঋা -া^র্স । র্সা -া I -া -া । -া -া } I র্সা র্সর্গা । র্গা র্গা I
র॰ ॰ নি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ বি র॰ হ বি

I -র্ঋা র্ঋা । ^র্সর্ঋা -র্সা I ^র্সর্ঋা -র্সা । র্সা -ণা I ণা -দা । দা -পা I
হ্ ব ল ॰ হৃ দ্ স্প ন্ দ ॰ নে ॰

I -পা -মা । মা মা I গা -মা । -ধা -না I -র্সা -র্ঋা । র্সা -না I
॰ ॰ দো লা লা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ গি ॰

I র্সা -^র্সনা । দা২ না I র্সা -র্গা । র্গা -র্ঋা I র্ঋা -র্সা । র্সা -ণা I
ল ॰ দো লা লা ॰ গি ॰ ল ॰ ব ॰

I ণা -দা । দা -পা I পা -মা । মা মা I গা -মা । -ধা -না I
নে ॰ ব ॰ নে ॰ দো লা লা ॰ ॰ ॰

I -র্সা -র্ঋা । র্সা -না I র্সা -^র্সনা । দা২ না II
॰ ॰ গি ॰ ল ॰ "আ জি"

-া -া I -া -া । -া -^র্সনা II ^নধা ধা । না র্সা I র্সা -র্ঋা । -া -র্সনা I
॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ মা ধ বী ল তা ॰ ॰ ॰ ॰

I -া -া । -া -া I { না র্সা । র্সর্ঋা র্সা I না -া । র্সা ^র্সর্ঋর্সা I
॰ ॰ ॰ য় ভা ষা হা॰ রা ব্যা ॰ কু ল॰

I না -া । -া -া I -মা -া । -গা -া I মা ধা । না র্সা I
তা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ মা ধ বী ল

I র্সা -র্ঋা । -া -র্সনা I -র্সা -া । -া -া I (র্সর্গা -া । র্গা র্গর্ঋা I
তা ॰ ॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ য় প॰ ল্ ল বে॰

I ঋর্পা -া । র্গা র্গা I র্গঋা ঋর্পা । র্গা র্গা I র্গঋা ঋর্গা । র্গঋা -া I
প ০ ল্ ল বে প্র ল ০ পি ত ক ০ ল ০ র ০

I র্সা -া । -া -র্সনা I নধা ধা । না র্সা I র্সা -ঋা । -া -র্সনা I
বে ০ ০ ০ মা ধ বী ল তা ০ ০ ০ ০

I -র্সা -া । -া -া)} I { র্সা র্সর্গা । র্গা -া I র্গা -া । র্গা -ঋা I
০ ০ ০ য়্ প্র জা ০ প ০ তি র্ পা ০

I ঋর্পা -া । -া -ঋর্পঋা I -র্গা -া । -া -া I ঋা ঋর্পা । র্গা র্গা I
খা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ দি কে ০ দি কে

I র্গঋা র্গা । র্গঋা ঋা I র্সা -া । -া -া I -া -া । -া -া } I
লি পি নি ০ য়ে যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I র্সর্গা -া । ঋা র্সা I না -া । র্সা -ঋা I র্সা -ণা । ণা -দা I
উ ৎ স ব আ ০ ম ন্ ত্র ০ ণে ০

I -দা -পা । পমা মা I গা -মা । -ধা -না I -র্সা -ঋা । র্সা -না I
০ ০ দো ০ লা লা ০ ০ ০ ০ ০ গি ০

I র্সা -র্সনা । দা২ না I র্সা -র্গা । র্গা -ঋা I ঋা -র্সা । র্সা -ণা I
ল ০ দো লা লা ০ গি ০ ল ০ ব ০

I ণা -দা । দা -পা I পা -মা । মা মা I গা -মা । -ধা -না I
নে ০ ব ০ নে ০ দো লা লা ০ ০ ০

I -র্সা -ঋা । র্সা -না I র্সা -র্সনা । দা২ না II II
০ ০ গি ০ ল ০ "আ জি"

সম্পাদকের নিবেদন

আত্মবিসর্জনের আত্মসমর্পণের ও আত্মনিবেদনের এমন দৃষ্টান্ত বড়-একটা দেখা যায় না।— একজন বিদেশিনী হয়েও ভগিনী নিবেদিতা ভারত-আত্মার কাছে যেভাবে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে নিবেদন করেছিলেন, অনেক ভারতবাসীর পক্ষেও সম্ভবত অতটা সম্ভব নয়। ভারতের প্রতি মমতাবশত অথবা ভারতবাণীর দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে অনেক বিদেশী এ দেশে এসেছেন, ভারতবর্ষকে ভালোও হয়তো তাঁরা বেসেছেন। কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে তাঁরা কিছুটা সচেতন ছিলেন বলেই হয়তো তাঁরা নিজেদের একটু পৃথক্‌ভাবে রেখেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা কেবল ভারতবর্ষকেই ভালোবাসেন নি, তিনি ভারতবাসীকেও পরম-আত্মীয় বলে জ্ঞান করেছেন। এ দেশে এসে তিনি দেশের ও দশের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন। সর্বসাধারণের প্রতি তাঁর স্নেহ মাতৃস্নেহেরই তুল্য ছিল। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন লোকমাতা। এ দেশের মাটির সঙ্গে মহত্ত্ব মিশ্রিত আছে বলেই বিদেশীকে এ দেশ আপন করে নিতে পারে— অনেক সময় আমরা এ রকম ভেবে থাকি। এ কথা সত্য বটে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, এ দেশের মাটিতে আত্মনিবেদন ক'রে এই দেশের সঙ্গে নিজেকে যিনি এক ক'রে নিতে পেরেছেন তিনিও মহৎ।

ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে আমরা নূতন করে তাঁর প্রতি আমাদের সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। এই সংখ্যায় মুদ্রিত নিবেদিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি অগ্রহায়ণ ১৩১৮ সংখ্যা প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়; অষ্টাদশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এটি সংকলিত আছে।

একক চেষ্টায় কত বৃহৎ কাজ করা সম্ভব তার দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন নগেন্দ্রনাথ বসু। ইনি একাই যেন একটি ইন্সটিটিউশন ছিলেন। কোষ-গ্রন্থ রচনা করা বড় কাজ ও কঠিন কাজ, এবং হয়তো একার কাজ নয়। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ একক চেষ্টায় অনুরূপ করে প্রমাণ করেছেন যে, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা থাকলে কোনো কাজই কারো পক্ষে অসাধ্য নয়। তাঁরও জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমরা তাঁকে স্মরণ করলাম।

স্বীকৃতি

ভগিনী নিবেদিতার চিত্র কলিকাতাস্থ অদ্বৈত আশ্রমের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

নগেন্দ্রনাথ বসুর চিত্র শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

ত্রয়োবিংশ বর্ষ । শ্রাবণ ১৩৭৩ - আষাঢ় ১৩৭৪ · ১৮৮৮-৯ শক

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
২. প্রকাশের সময়-ব্যবধান : ত্রৈমাসিক
৩. মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় (ভারতীয়)
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯
৪. প্রকাশক : শ্রীসুশীল রায় (ভারতীয়)
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
৫. সম্পাদক : শ্রীসুশীল রায় (ভারতীয়)
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
৬. স্বত্বাধিকারী : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পোঃ শান্তিনিকেতন। বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গ

আমি, শ্রীসুশীল রায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

১ মার্চ ১৯৬৭ স্বাঃ সুশীল রায়